ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
'The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free:
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিল পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ | বৈশাখ, ১৩২৪। | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নব বর্ষ।

মঙ্গলময় ভগবানকে প্রণাম করিয়া আমরা নূতন বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি। ভারত-মহিলা পরিচালনে আমাদের দোষ ত্রুটীর অভাব নাই, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন-যেন বর্ত্তমান বৎসরে আমরা অধিকতর যত্নের সহিত ইহার সেবা করিতে পারি।

ইউরোপীয় মহসমর।

এই সর্ব্বনাশকারী ভীষণ যুদ্ধ ভীষণ ভাবেই চলিতেছে। জর্ম্মানগণ তাহাদের ডুবো জাহাজের সাহায্যে শুধু বিপক্ষ নয় নিরপেক্ষ দেশগুলির জাহাজও ডুবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য পুনঃ পুনঃ জর্ম্মানীকে সাবধান করিয়া দিয়াও ইহার প্রতিকার করিতে পারে নাই, এজন্য জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যও যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। বলিতে গেলে সমস্ত সভ্যজগত, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মানী তাহাতেও যেন ভয় পায় নাই। সুতরাং এই কালসমরের নিবৃত্তি যে কবে হইবে কিছুই অনুমান করিতে পারা যাইতেছে না। দেশে দেশে ঘরে ঘরে মৃত্যু, দুঃখ বেদনা ও হাহাকার বিস্তার করিতেছে। কত মাতাপিতা পুত্রহীন, পত্নী পতিহীন, সন্তান পিতৃহীন হইয়া পৃথিবীর দুঃখভার বৃদ্ধি করিতেছে। এত বেদনার কথা ভাবিয়া নারীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু যাহারা এ যুদ্ধের নেতা তাহাদের মর্ম্মস্থান কি এত কঠিনের

যাবে না? বাঙ্গালী এত দিন বুদ্ধভীরু বলিয়া পরিচিত ছিল, এখন মাতৃভূমির প্রতি, রাজার প্রতি, কর্ত্তব্যের খাতিরে বাঙ্গালীও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে, আর আমাদের কানের কাছেও যুদ্ধগত পুত্রশোকে আকুল, বাঙ্গালী মাতার, পতিবিয়োগবিধুরা বাঙ্গালী পত্নীর ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিতেছে। হে ভগবান, অচিরে ধরায় শান্তি-বারি বর্ষণ কর।

ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী।

আমাদের মহাসমিতির বিগত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়া গেল আমি সেই বিষয়গুলি প্রস্তাব আকারে গ্রথিত করিয়া ভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের সমক্ষে ধরিতে অগ্রসর হইয়াছি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন সভ্য কর্ত্তৃক যে সমস্ত দাবী দাওয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও প্রজা সাধারণ উভয় পক্ষ কর্ত্তৃকই সমালোচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দাবীর সময় এখনও আসে নাই এবং আমাদের দাবীর পরিমাণ অত কম হওয়াও উচিত নহে। কেহ বলেন, অত অতিরিক্ত দাবীও ঠিক হয় নাই। যে অবস্থায় এই সমস্ত দাবী দাওয়ার কথা শাসনকর্ত্তাদের নিকট ধরা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দাবীপত্রে (Memorandum) এমনভাবে কিছু দাবী করা হয় নাই যাহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন অসম্ভব। অথবা যাঁহারা এই দাবী করিতেছেন, তাঁহারা এমন আশা করিতেছেন না যে, যেদিন এই যুদ্ধের একটা শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে সেদিন স্বাক্ষরিত হইবে ঠিক তাহার পরদিনই তাঁহাদের দাবী বা প্রস্তাবানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে। অন্যদিকে আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা ত আমাদের দাবীর অতিরিক্ততা কোথাও দেখিতেছি না। আমাদের ন্যায় জাতি যে অতিরিক্ত কিছু আশা করিতে পারে এমন ত আমার মনে হয় না। যাহাদের কোন জিনিষ প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহারাই অমিতব্যয়ী হইয়া থাকে। অতিরিক্ত কিছু তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। সে যাহা হউক, আমরা যাহা চাই, আমাদের বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ভগবান আমাদিগের সে আশাগুলি পূরণ করিবেনই। তাহা এই—

১। ভারতবর্ষের পরাধীন রাজ্য (Dependency) নাম বিলুপ্ত হউক এবং সে সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় সমান স্বত্ব ও দায়িত্ব সংবলিত স্বতন্ত্র শক্তি লাভ করিয়া স্বশাসিত রাজ্য (Self-Governing State) নামে অভিহিত হউক।

২। সমরাবসানে পুনর্ব্যবস্থার (Readjustment) জন্য যাহা কিছু করা হইবে সেই সম্মিলিত সমিতিতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য উপনিবেশ সমূহের ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থার সুন্দররূপ আলোচনার জন্য উপযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। ভারতবর্ষ দিল্লী ও সিমলাশৈল হইতেই শাসিত হইবে কিন্তু হোয়াইট্ হল বা ডাউনিং ষ্ট্রীট্ হইতে নহে। ভারত-সচিবের সভা বা কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হউক অথবা উহার গঠন-প্রণালীর এমন পরিবর্ত্তন সাধিত হউক যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাইতে পারে। দুইজন সহকারী ভারত-সচিবের মধ্যে একজন ভারতবাসী হইবেন এবং অন্যান্য উপনিবেশ সচিব ও ভারত-সচিবের বেতন সমান হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর ভারত-সচিবের অন্যান্য উপনিবেশ সচিবদিগের উপনিবেশ সমূহের উপর যতটা কর্ত্তৃত্ব আছে তাহার অধিক কিছুই থাকিবে না। ভারতবর্ষ অর্থ, আইন ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete autonomy) লাভ করিবে।

৪। প্রস্তাবিত সংস্কার ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্থান অতি উচ্চে। উহা সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মস্তক স্বরূপ। যদি আমরা ইহার উন্নতির বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হইতে না পারি তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সংস্কারও অসম্ভব হইবে। এই কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারী-

গণকে গবর্ণমেণ্ট হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। কোন কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা বা মেম্বর হইতে পারিবেন না। কোন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর বহুদর্শিতা এবং জ্ঞানের সদ্ব্যবহার সেই বিভাগের কার্য্যেই করা হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা মন্ত্রী সভার (Cabinet) সভ্য নিযুক্ত করা হইবে না।

৫। ভারতীয় কার্য্যকরী সভা বড়লাটের নায়কত্বে গঠিত হইবে। উহার সভ্য সংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ ভারতবাসী হইবেন এবং তাঁহারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় বে-সরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সমস্ত সভ্যেরা পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবেন।

৬। কানাডার উচ্চতর প্রতিনিধি সভার (Upper House of Representatives) ২০ জনই জন সভ্য আছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্ততঃ ১৫০ জন সভ্য থাকিবেন। ইহারা সকলেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। কিন্তু কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের যুগে (Transitory Period) এক পঞ্চমাংশ সভ্য মন্ত্রী সভাকর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। তাহাদের এক চতুর্থাংশ সভ্য সরকারী কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন।

৭। বাৎসরিক বজেট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইবে। সাময়িক আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ ইহার অন্তর্গত হইবে না। সমস্ত বজেটটী ঐ ব্যবস্থাপক সভার ভোটের উপর নির্ভর করিবে।

৮। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীন (autonomous) হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ তাহার নিজের আয় ব্যয় নিজেই করিবে। তবে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রত্যেককেই সাহায্য করিতে হইবে।

৯। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় একজন প্রাদেশিক গবর্ণরের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। এবং ইহারও একটি মন্ত্রী সভা থাকিবে। এই মন্ত্রী সভার অর্দ্ধেক সভ্য ভারতবাসী হইবেন। তাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় বে-সরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

১০। বৃহত্তর (Major) প্রদেশের ব্যবস্থাপক সমিতিতে একশত জন সভ্য ও ক্ষুদ্রতর (Minor) প্রদেশের সমিতিতে পঁচাত্তর জন সভ্য থাকিবেন। ইঁহাদের সকলেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং প্রত্যেক জেলা হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি গৃহীত হইবেন। কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন যুগে (Transitory Period) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। কার্য্যকরী ও ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় রাজ্যের বিচার ও শাসন বিভাগও পৃথকীকৃত হইবে। ফৌজদারী বা দেওয়ানী যে কোন বিচার কার্য্যের সম্পূর্ণভার উচ্চ আদালতের (High Courts) উপর ন্যস্ত থাকিবে। উচ্চ আদালত বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীগণের বেতন, উচ্চ পদে উন্নয়ন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন। উচ্চ আদালত কেবলমাত্র ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের (Supreme Government) অধীন থাকিবেন।

১২। অস্ত্র আইন উঠাইয়া দেওয়া হউক অথবা এরূপ পরিবর্ত্তিত করা হউক যে ভারতবাসীরা ইয়ুরোপীয় বা ইউরেশীয়দিগের সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে পারে। মুদ্রাযন্ত্র আইন ষ্ট্যাটিউট্ বুক হইতে অপসারিত করা হউক এবং সমস্ত কঠোর বিধান উঠাইয়া লওয়া হউক।

১৩। ভারতবর্ষে একটি জাতীয়-বাহিনী (National militia) গঠিত হউক। এই বাহিনীতে সকলকেই যোগদান করিতে দেওয়া হউক। তাহাদিগকে দেশের শান্তি রক্ষণ ও শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী সর্ত্তে ইহাতে যোগ দিতে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সামরিক বিভাগে পদস্থ কর্ম্মে ভারতবাসীর অধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

১৪। দেশে সর্ব্বত্র লোকাল সেল্ফ্ গবর্ণমেণ্ট দেওয়া হউক। প্রেসিডেন্সী টাউন গুলির কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রীক্ট বা তালুক বোর্ড সমূহ এবং লোকাল মিউনিসিপাল বোর্ড গুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হউক। তাহারা তাহাদের সভ্য ও সভাপতি মনোনীত করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হউক। আইনত গবর্ণমেণ্ট তাহা-

দের উপর যতটুকু আধিপত্য করিতে পারেন তদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া উচিত।

১৫। সাধারণের জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যকী শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় শিল্প-সমূহের উৎসাহদান ও উন্নতি কল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

রুসিয়ায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা।

রুষিয়া দেশে রাজতন্ত্র-শাসনের অবসান হইল। রুষ-সম্রাট তার নিকোলাস শাসনকার্য্যে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, এজন্য প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি-সভা ডুমা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্য-শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রুষ-সম্রাটের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মত ডুমার দেশ শাসনের ক্ষমতা ছিল না। এই সভা সম্রাটকে পরামর্শ দিত মাত্র। কিন্তু রুষরাজের রাজার স্বেচ্ছাচার শাসন দূর করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছিল। এই স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় বহু রুষ নরনারী আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অনেকে এজন্য রাজদ্রোহ অপরাধে সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া সমগ্র রুষজাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। একজন মহিলা এইসকল বিপ্লববাদী-দিগের প্রতিনিধি। তাঁহাকে সকলে "বিপ্লবের পিতামহী" বলিয়া পরিচিত করে। বৃদ্ধ বয়সে তিনিও এখন সাইবেরিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত রুষজাতির পূজা লাভ করিতেছেন। বহুলোকের আত্ম-ত্যাগ ও দীর্ঘ সাধনায় এতদিনে রুষজাতি ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ করিল। বর্ত্তমান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম :—

আজ রুষ সাম্রাজ্যে এই যে কাণ্ড হইয়া গেল—যাহার ফলে রুষ সাম্রাজ্যের প্রাচীন শাসনের একটা ধারা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার সূচনা প্রকাশ পাইয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহা রুষ রাজধানী পেট্রোগ্রাডে আর একটু পরিবর্দ্ধিত আকারে আত্ম প্রকাশ করে। অন্য কেহ কি করিয়াছিলেন তাহাতে প্রয়োজন নাই, বোধ হয়, রুষরাজপক্ষও তাহার প্রতি তেমন ভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই। প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল, রুষিয়া প্রবল শত্রুর সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিতেছে। এমন ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য রুষ প্রস্তুত হয় নাই। সৈন্য, অস্ত্র এবং রসদ না হইলে যুদ্ধ হয় না। এইগুলি শুধু সংগ্রহ করিলেই হয় না, স্থান বিশেষে সময় মত ও পরিমাণ মত যোগান করাও চাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় খাদ্য। যে যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইবে; যে যুদ্ধ না করিবে, তাহাকেও দিতে হইবে। রুষের এই রাষ্ট্রবিপ্লবের বর্ত্তমান কারণ এই অন্নাভাব। রুষ রাজধানী পেট্রোগ্রাড সহরে যথাপ্রয়োজন খাদ্য সরবরাহ হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায়,—তাই সেখানে প্রজারা গোলযোগ করিতেছে। তখন ইহা সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, ইহাই যে এত কাণ্ডের মূল, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বাহিরে সকল কথা প্রকাশ না হইলেও ভিতরে ভিতরে তখনই বিপ্লব বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। রুষরাজকর্ত্তৃক তখন ইহার দমন হইলে হয়ত এতটা গড়াইত না। রয়টার জানাইয়াছিলেন, ইহাতে বিদ্রোহের নামগন্ধ নাই। কিন্তু আবার ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, সম্রাটের আদেশে ডুমা অর্থাৎ রুষপার্লামেণ্ট বন্ধ করা হইয়াছে। এখন এই দুই কথা মিলাইয়া বুঝা যাইতেছে,—তখনই বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল এবং রুষ সম্রাট তাহা দমন করিতে প্রয়াসী হইয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাহার কারণ, ডুমার সদস্যেরা প্রজাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তখনই সম্রাটের শক্তিসঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলে, এইরূপ উভয় দিকের চাপেই শেষে এই কাণ্ড সংঘটিত হয়।

রাসপুটিন কাহিনী।

আরও একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। নতুবা এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। আপনি একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উঠিবেন। রুষিয়ার

এই বিদ্রোহবহ্নিও একদিনে জ্বলে নাই। ভিতরে ইহা অনেক দিন ধুঁয়াইতেছিল. রাস্পুটিনের প্রাণান্তই প্রথম অগ্নি সঞ্চারের মূল কারণ। রাস্পুটিনের কাণ্ড একটি রহস্যের ব্যাপার। গূঢ় রহস্যের কথা রুষিয়ার প্রজা-প্রতিনিধিগণ অনেক দিন হইতেই জানিতেন, এবং ইহা যে শেষে রুষিয়ার এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ের কারণ হইতে পারে, তাহাও বুঝিতেন। কিন্তু বোধ হয় কেহ ইহার প্রতিকার ব্যবস্থায় মনোযোগী হন নাই; বরং উল্টা বাতাস দিয়া আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রেতাত্মা রাস্পুটিন একজন লোকের নাম। এই লোকটি অনেকটা এদেশের চাণক্যের ধরণের। রাস্পুটিন রুষ রাজ-দরবারের পাদরি ছিলেন; রুষ সাম্রাজ্যে ইঁহার ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। ঘোর বিষয়ী গুরুর হাতের পুতুল হইয়া এদেশের কোন কোন জমিদার যেমন উৎসন্ন হইয়াছেন, ইঁহার পরামর্শে কাজ করিয়া আজ রুষ-সম্রাটেরও সেই দশা। রাস্পুটিন লোককে মুগ্ধ করিবার অনেক কৌশল জানিতেন। রুষের লোক ইঁহাকে তাঁহার বুজরুকি বলিত। লোকের কথায় কি হয়, স্বয়ং রুষসম্রাট ইহাতে ভুলিয়া তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। জার নিকোলাসের একমাত্র পুত্র পীড়িত হইলে, জার নিজে রাস্পুটিনের ময়লা জামা হাতে করিয়া তাঁহার পীড়িত পুত্রের গায় দিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই সাধুর জামা স্পর্শে পুত্রের পীড়া ভাল হইয়া যাইবে। এইরূপ নানা ভাবে রাস্পুটিনের প্রভাব এত বাড়িয়াছিল যে, তিনি যখন তখন যাহাকে তাহাকে রুষ-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাইতে পারিতেন; আবার ইচ্ছা করিলে এই পদ হইতে নামাইয়া দিতে পারিতেন। রাস্পুটিন সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। ফলে, তাঁহারই জন্য রুষ সাম্রাজ্যে প্রজাশক্তির পরিস্ফুরণ হইতে পারিত না। তাই প্রজাপক্ষের কতিপয় প্রতিনিধি ষড়যন্ত্র করিয়া রাস্পুটিনকে হত্যা করে। তাহার পর হইতেই রুষ সম্রাটের প্রাধান্য কমিতে আরম্ভ হয়। রাস্পুটিন সন্ন্যাসীর সাজে থাকিয়াও সোজাসুজি বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন, ইহাতেই প্রথমে লোকে তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। তাহার পর যখন দেখে, তিনি রুষ সম্রাটের উপরও প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন, প্রজা-প্রতিনিধিগণের সকল কার্য্যেই বাধা দিতেছেন, তখনই সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। এই হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই যদি জার নিকোলাসের চক্ষু ফুটিত, তাহা হইলেও আজ তাঁহার এই দশা ঘটিত না। এই হত্যাকাণ্ডে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, আজ জারের সিংহাসনত্যাগে তাহাই বিশালবাহু বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ।

এ ঘটনাগুলি কি ভাবে পরস্পর পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে বিপ্লবে পরিণত হয়, এইবার তাহা বলিতেছি। ১১ই মার্চ্চ রুষ সম্রাট ডুমাবন্ধের আদেশ প্রদান করেন। এই দিন হইতেই পেট্রোগ্রাডে ঘোর আপত্তির আবির্ভাব হয়। ১১ই ১২ই ১৩ই মার্চ্চ তিন দিন তিন রাত্রি দলে দলে সহস্র সহস্র ক্ষুধিত নরনারী রাজধানীর রাজপথ সমূহে ছুটাছুটি করিতে থাকে। সহস্র সহস্র ক্ষুধাকাতর বালক বালিকা রুটির কারখানা সমূহের বাহিরে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া হল্লা আরম্ভ করিয়া দেয়। সম্রাটের সেনাদল ইহাদের উপর গুলি চালাইয়াছিল। কিন্তু ইহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অটল অচল ভাবে যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার পর মেসিন কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ হয়। তাহাতেও ইহারা বিচলিত হয় নাই। প্রথম দিন এই ভাবে কাটিয়া যায়। ব্যাপারটা যে একটা ভুমুল বিপ্লবে পরিণত হইবে, এদিন তাহা বুঝা যায় নাই। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই তারিখে ব্যাপার সঙ্গিন হইয়া দাঁড়ায়। রাজসৈন্যদল বুভুক্ষু নরনারীর কষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহারাও সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া প্রজাদের পক্ষ গ্রহণ করে। দলে দলে সৈন্যগণ আসিয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিশিতে লাগিল। সকলেই বলিল, আর সম্রাটকে চাই না; আমরা ডুমারই পক্ষপাতী। এতক্ষণ কেবল স্থল-সৈন্য বিদ্রোহে যোগ

দিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর জল-সৈন্যেরাও নৌ-বারিক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিতে লাগিল। রাজপক্ষ আরও একবার বিদ্রোহ দমনের জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বলপ্রয়োগই এক মাত্র উপায়। সৈন্যদিগকে বিদ্রোহীদের উপর গোলা চালাইবার আদেশ দেওয়া হইল। কতকগুলি রাজসৈন্য উপর ওয়ালার হুকুম মত গোলাগুলি ছুড়িতে লাগিল বটে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। হয় সেগুলি ফাঁকা আওয়াজ, না হয়, ইচ্ছা করিয়াই সৈন্যদল লক্ষ্য ব্যর্থ করিতেছিল। একটা আধটা যেখানে লাগিয়াছিল, সেখানে কিন্তু লোক মরিয়াছিল বিস্তর। তাহার কারণ, লোকের ভিড় খুব বেশী হইয়াছিল। এই সময় কসাক সৈন্যদিগকে ডাকা হয়। একটা বাগানে বিদ্রোহীরা আড্ডা করিয়াছিল। কসাকদিগকে দেখিয়াই তাহারা জানু পাতিয়া বসিয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া কসাকেরা আর তাহাদিগকে গুলি করে নাই। ক্রমে ক্রমে প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার সৈন্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বিদ্রোহীদের দলভুক্ত হইল। তাহারা সেণ্টপিটার এবং সেণ্টপল কেল্লায় প্রবেশ করিয়া সেখানেই তাহাদের প্রধান আড্ডা বসাইল। এখন আর তাহাদের কাছে যায় কে? তাহারাই যেন দেশের মালিক হইয়া উঠিল। পুলিশদল এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে রাজপক্ষ ধরিয়াছিল; বিদ্রোহী সৈন্যদল প্রজাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে পুলিশদল এই সময় প্রজাপক্ষে মিলিত হয়। প্রজাশক্তির প্রাবাল্য কিরূপ, এই সময় বিশেষ ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ডুমার কোন কোন সদস্য এখন পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে রাজার দিকে ছিলেন। কিন্তু ডুমার গিয়া তাঁহারা যেমন দেখিলেন যে সম্রাট ডুমা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, অমনি তাঁহারাও বিদ্রোহী প্রজাদের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া সেই দিনই ডুমার এক অধিবেশন করিলেন এবং ডুমার সভাপতি সকল অবস্থা সম্রাটকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন। তিনি বলিলেন,—"সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, যে যাঁহাকে পাইতেছে, গুলি করিয়া মারিতেছে। অতএব যাহার উপর প্রজাদিগের বিশ্বাস আছে, এমন একজনকে নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনে নিযুক্ত করা হউক।" তিনি আরও বলিলেন,—"ইহাতে বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিলম্বে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভগবান করুন, যেন আমাদের রাজহত্যার দায়িত্ব গ্রহণ না করিতে হয়।"

সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগ।

যখন পেট্রোগ্রাডে এই সকল কাণ্ড ঘটে, তখন সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস পস্কফের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা পেট্রোগ্রাডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রায় তিন শত মাইল দূরে। পেট্রোগ্রাড্ হইতে পস্কফ পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। এই রেলই বরাবর নীচে নামিয়া ওয়ারশা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ডুমার প্রেসিডেণ্টের টেলিগ্রাম পাইয়া তার সকল ব্যাপারই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি ইহাতে তেমন গা করেন নাই। বরং উল্টাদিক দিয়াই যাইতেছিলেন। তিনি টেলিগ্রাম করিয়া জানান যে, কর্ত্তব্য ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আলেকসিফকে ডিক্টেটর করিয়া পেট্রোগ্রাডে পাঠাইতেছেন। ইহাতে ডুমার প্রতিনিধিরা আরও থাকিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা স্থির করেন,—সম্রাটকে তাঁহাদের কথা মত কাজ করিতে বাধ্য করিতেই হইবে। তখনই পস্কফে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। জেনারেল রাস্কি ইঁহাদের মুখপাত্র ছিলেন। ইঁহারা যখন পস্কফে পৌঁছেন, তখন রাত্রি দু'পর। সম্রাট ইঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনারা আমাকে কি করিতে বলিতেছেন?" জেনারেল রাস্কি স্পষ্ট করিয়াই বলেন,—"সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে।" যাঁহারা এতদিন মনে-মানে, প্রাধান্য-প্রতিপত্তিতে দেশের মধ্যে সর্ব্বময় সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইলেও যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিত মাত্রে উঠিতেন বসিতেন, আজ তাঁহারাই মুখের উপর তাঁহাকে এমন কথা বলিতেছেন শুনিয়া যে তাঁহার হৃদয়ে একটা মহা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উপায় কি? মানুষ যে অবস্থার দাস। আর মনের আবেগ সামলা-

ইবার জন্ত কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহেন। তিনি তখন বোধ হয় পৃথিবীটা শূন্ত দেখিতেছিলেন। কোথাও তাঁহার কেহ আত্মীয় আছে কিনা, তাহাই খুঁজিতেছিলেন। সকলকে বাদ দিয়া তাঁহার তখন পুত্রের কথাই মনে পড়ে। তিনি ধীরে ধীরে অতি সাবধান ভাবে বলেন,—"আমি ত পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং আমি আমার ভ্রাতার জন্ত সিংহাসন ত্যাগ করিতেছি।" জেনারেল রাস্‌কি প্রভৃতি প্রজা-প্রতিনিধিগণ ঘোষণা-পত্র লিখিয়াই লইয়া গিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহাতে সম্রাট নিকোলাসের নাম সহি করাইয়া লয়েন।

জারের ঘোষণা-পত্র।

জার নিকোলাসের স্বাক্ষরিত ঘোষণা-পত্রের মর্ম্ম এই,—"তিন বৎসর কাল রুষিয়া বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে, ইহার উপর আবার সম্প্রতি অন্তর্বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত। ভগবানের ইহাই ইচ্ছা, কিন্তু ইহাতে যুদ্ধের গতি প্রতিহত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয়ও ঘটিতে পারে। সৈন্ত ও প্রজাবর্গের সুখের জন্তই যে-কোন প্রকারে জয় লাভের উদ্দেশ্তে যুদ্ধ চালানো প্রয়োজন। নিষ্ঠুর শত্রুগণ এইবার শেষ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের পরাজয়ের দিন আসিতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায়, যাহাতে আরও শীঘ্র শীঘ্র জয়লাভ হয়, তাহার জন্ত আমি মনে করিতেছি, প্রজাগণের দৃঢ় ঐকমত্য এবং শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খলা সাধনই আমার কর্ত্তব্য। তাই ডুমার সহিত একমত হইয়া দেশের সম্মান রক্ষার জন্ত রাজ মুকুট এবং রাজশক্তি ত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমাদের প্রিয় পুত্রকে আমরা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব আমার অনুজ ভ্রাতা মাইকেলকেই সিংহাসনের অধিকার প্রদান করিতেছি এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির নামে শপথ গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা মাইকেল প্রজা-প্রতিনিধিগণের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন করিবেন। জন্মভূমির প্রত্যেক সন্তানকেই বলিতেছি, তাঁহারা যেন এই দুঃসময়ে সম্রাটের আদেশ পালন করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দেশের হিতসাধন করেন। ভগবান রুষিয়াকে রক্ষা করুন।"

গ্রাণ্ড ডিউকের অসম্মতি।

জার নিকোলাস তাঁহার ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেলকে সিংহাসনের অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি সিংহাসন গ্রহণে সম্মত হন নাই। কেন হন নাই, তাহা তিনিই ভাল জানেন। তবে, অবস্থার আলোচনায় বুঝা যায়, তিনি দেশের লোকের মনের ভাব বুঝিয়াই সিংহাসন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের লোক আর রক্ষিতন্ত্র শাসন চাহে না; ইহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্ত ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন,—তিনিও রুষ-সিংহাসন ত্যাগ করিতেছেন। ডুমা এবং প্রজা পক্ষের মন্ত্রিসভার উপরই রাজ্যশাসন-কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হয়। তবে, তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যদি প্রজারা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজা করে, তাহা হইলে তিনি রাজি হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হয় নাই।

শেষ কথা।

রুষ-রাজ্যে এখন নূতন শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ডুমা রুষের প্রজা-প্রতিনিধির সভা। এই সভার সদস্তেরাই নূতন শাসন-তরণীর কর্ণধার হইয়াছেন। ডুমার প্রেসিডেণ্টই এখন রুষ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। অবশ্ত অস্থায়িভাবেই এই গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। হাল চাল বুঝিয়া পরে পাকা ব্যবস্থা হইবে। কি হইবে, সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। কেহ বলিতেছেন,—ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্তায় প্রজামতানুযায়ী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; কেহ বলিতেছেন,—তাহা নহে, এবার ফ্রান্স, মার্কিণ, চীন প্রভৃতির ন্তায় রুষ-রাজ্যেও সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে, সম্রাটের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেণ্ট হইবে। যাহাই হউক, আপাততঃ পেট্রোগ্রাডে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টেরই শাসন চলিতেছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহেও এই ভাবের শাসন প্রচলিত হইয়াছে। সম্রাট নিকোলাস এখন একজন সাধারণ প্রজার সামিল। তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর; ২৩ বৎসর রাজ্যভোগ শেষ না হইতেই তাঁহার

এই অবস্থা ঘটন। এখন তিনি কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে ককেসাসের ক্রিমিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ ঐ সর্ত্তী নিভেডিচা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন বিদ্রোহী প্রজারা ইঁহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করে নাই। ভার-মহিষী পুত্র কন্যাগণের সহিত পেট্রোগ্রাডের দক্ষিণে টারস্কোসেলো প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। বিদ্রোহীরা তাহার প্রাসাদ ঘেরাও করিয়াছিল। কিন্তু মাতৃত্বে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলেন,—"তোমরা গুলি চুড়িও না; আমার পাঁচটি সন্তান রুষ যুবরাজ এবং রুষ রাজকন্যাগণের আমিই একমাত্র শুশ্রূষাকারিণী।" অনেক স্থানেই বিদ্রোহীরা সরকারী আপিস আদালত হইতে সম্রাটের মুকুট ও রাজদণ্ড বাহির করিয়া আনিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল। সর্ব্বত্র রাজ-পতাকা নামাইয়া বিদ্রোহের রক্তবর্ণ নিশান উড়াইয়াছিল। এখন আর এ সব হাঙ্গামা কিছু নাই ক্রমেই প্রতাপচন্দ্র শাসনপ্রণালী দৃঢ় মূল হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-রমণীর কর্ত্তব্য।

হিতবাদী পত্রিকায় একজন বঙ্গমহিলা নিম্নলিখিত সুন্দর কথাগুলি লিখিয়াছেন :—

আজকাল দেশের সর্ব্বত্র সকল লোকের প্রাণেই যেন কেমন একটা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশে আর্থিক অনাটন উপস্থিত। দেশের লোককে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই অধিমূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে, অথচ সংসারে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের হাত যে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে সেরূপ মনে হয় না; বরং আজকাল—এই অনাটনের সময় শিক্ষিত যুবকগণ আপনাপন পরিবারের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গের দুমুঠো অন্নের সংস্থান করিবার নিমিত্ত সামান্য বেতনেই কোন না কোন কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন; কেহবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসার রক্ষার নিমিত্ত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া একটা সামান্য চাকুরীর জন্য দশ জনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন, এইতো দেশের আর্থিক অবস্থা!! আজকাল যাঁহারা অধিক বেতন পান তাঁহাদিগকেই অতি কষ্টে সংসার চালাইতে হইতেছে; অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণের পরিবারবর্গের যে কি দুর্দ্দশা তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে!! অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করাতো দূরের কথা, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ কিরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবেন তাহাই ভাবিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়াছেন। বিদেশজাত দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশজাত দ্রব্যাদির মূল্যও অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঁশ খড় ও দড়ি যাহা গৃহ অথবা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ তাহার মূল্যের কথা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার উপর পুত্র কন্যাকে শিক্ষাদান করা এবং কন্যা পাত্রস্থ করা দুইটী প্রধান দায় আমাদের দেশের পুরুষগণকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত না করিলে পুত্র মূর্খ হইয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যতে তাহার উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইবে। কন্যাকেও আজকালকার দিনে সুশিক্ষিতা না করিলে পাত্রস্থ করা দুষ্কর এবং বয়স্থা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান না করিলেও সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সুতরাং আজকাল আমাদের দেশের পুরুষগণের কোন দিকেই নিস্তার নাই। সংসারে এই সমস্ত অশান্তির বোঝা লইয়াই তাঁহাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইতেছে।

এক্ষেত্রে এই ভীষণ দুর্দ্দিনের সময় বঙ্গ-নারীর কি কোনই কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না? আছে বই কি? বঙ্গ-রমণী কি এতই হৃদয়হীনা যে তাঁহাদের ভর্ত্তৃগণ এই দুঃসময়ে প্রাণপণে সংসারের সহিত যুদ্ধ করিবেন, আর তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইবেন! কখনই না! আমরা বঙ্গ-রমণী। আমাদের জন্য পিতা পুত্র ভ্রাতা বা স্বামী দিনরাত্র কঠোর পরিশ্রম অম্লান বদনে সহ্য করিতেছেন আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে তাঁহারা কষ্টকে কষ্ট বোধ করিতেছেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে কোন প্রকারই আর্থিক আনুকূল্য করিতে পারিতেছি না। কারণ, আমাদের সে বিষয়ে সামর্থ নাই অথবা সামর্থ থাকিলেও অভ্যাসের দোষে সব হারাইয়াছি। দেশের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এখন অভ্যাসের দোষ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভগ্নীগণ, আমরা

এত দিন ঘুমঘোরে আসিতেছিলাম, এখন জাগিয়া উঠিতে হইবে, আমরা যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী কার্য্যে সে নামের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। ভগ্নীগণ, তোমরা সকলেই জান আমাদের মধ্যে যে পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের সংখ্যা একটী সে পরিবারে যদি আমাদের ন্যায় উপার্জ্জনাক্ষমা ৪।৫টী রমণী থাকে তবে পরিবারের কিরূপ দুর্দ্দশা! বর্ত্তমানে আমাদিগকে পুরুষগণের আর্থিক আনুকূল্য না করিলেই নয়। সর্ব্বতোভাবে না করিতে পারি অন্ততঃ আংশিক ভাবে করিলেই যথেষ্ট। পুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করিতেও পরামর্শ দেন না। আমাদের দ্বারা যে টুকু সম্ভব তাহাই করা আবশ্যক।

ইউরোপের রমণীগণ আমাদের ন্যায় পুরুষের পরগ্রহ নহেন, তাঁহারা নিজেও উপার্জ্জন করিয়া স্বামীর সংসারে সাহায্য করেন এবং সংসারটাও বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে চলিয়া যায়। ইউরোপ তো সাগরের পরপারে, আমাদের ভারতবর্ষের কথাই বলি না কেন; এখানে নেপালী তুটিয়া মাদ্রাজী পশ্চিম দেশীয় রমণীগণও স্বামীর সাহায্য করিয়া কিছু না কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু বঙ্গ-রমণী এ বিষয়ে নীরব।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক শিক্ষিতা তাঁহারাও কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। আমাদিগের চাকুরী করিবার আবশ্যক নাই; চাকুরী করিবার উপযুক্ত শিক্ষাও পাই নাই বা পাইয়া থাকিলেও সমাজশাসন মানিয়া চলিতে আমরা বাধ্য। ঘরে বসিয়া স্বামীর সাহায্য করাই আমাদিগের গৌরব; কি উপায়ে তাহা সংসাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদের দেখা আবশ্যক আমরা সংসারের কর্ত্রী।

পুরুষগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, সুতরাং সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের দেখিবার অবসর থাকে না। সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার আমাদের উপর এবং ইহার শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলার জন্য আমরাই সর্ব্ব প্রকারে দায়ী; এ বিষয়ে পুরুষগণকে কোনরূপ দোষারূপ করা অন্যায়। গৃহিণী সংসার কার্য্যে সুনিপুণা হইলে সংসারে কোনরূপ অসাইম হয় না। আজ কাল আমাদিগকে সামান্য পান, চুণ, তেল, নুন হইতে বহুমূল্য সমস্ত দ্রব্যই হিসাব মত ব্যয় করিতে হইবে। যাহাতে কোন বিষয়ে সংসারে অপব্যয় না হয় অথবা কোন দ্রব্যের অপচয় না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহাতে নিন্দার কিছুই নাই। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যেটা উদ্বৃত্ত হয়, সেটা নষ্ট না করিয়া যত্নপূর্ব্বক একটী গরীবকে দান করিলে সেচারা এ দুর্দ্দিনে খাইয়া বাঁচে। রমণীগণের বিশেষ কোন বিষয়ে অজ্ঞান না হইলে স্বামীর গোচরীভূত করা অন্যায়। আজ কাল কোনরূপে দিন চলিয়া গেলেই যথেষ্ট। শুধু বিলাস বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য অথবা অলঙ্কার বা বিলাসোপকরণাদি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বায়না ধরিয়া স্বামীকে উৎপীড়ন করা অন্যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যক্ষমা তাঁহারা যদি দাস দাসী বা পাচক পাচিকার উপর নির্ভর না করিয়া গৃহের যাবতীয় কার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করেন, তাহাতে পুরুষগণের যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য হয়। আজকাল খোরাক পোষাক যোগাইয়া একজন পাচক বা চাকরাণীর পিছনে সংসারে কম খরচ হয় না। স্বহস্তে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিলে গৃহের শ্রীবৃদ্ধিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। আমরা অনেকেই দাস দাসীর উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা হারাইতেছি।

দিন দিন আমাদের শরীর শীর্ণ হইতেছে, সামান্য একটু কাজ করিলেই হাঁপাইতে হয়। ইহার ফলও অতীব শোচনীয়, আমাদের এরূপ অবহেলায় ও বিলাসিতায় আমাদের সন্তান সন্ততিগণও হীনতেজ ও কার্য্যাক্ষম হয়। এই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালী জাতির এই শোচনীয় দুরবস্থা। আজ কাল সংসারের যেরূপ ব্যয় বাহুল্য ঘটিয়াছে তাহাতে ছোট ছেলেপিলেদের গৃহশিক্ষার ভার আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিতা তাঁহাদিগকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে সংসারের ব্যয়ভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। শিশুগণের শিক্ষার জন্যও আমাদের বৈকালের

সংসারে অনেক সাহায্য হয়। অবসর মত আমরা ঘরে ছেলেপিলেদিগকে শিক্ষা দান করিলে শিক্ষাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী সকলেই বেশ আমোদ উপভোগ করিতে পারেন। ছেলেপিলেদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সাধ্যমত তাহাদের বস্ত্রাদি রমণী-গণেরই প্রত্যহ ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহারা কাপড় অতিরিক্ত ময়লা করে; এক্ষেত্রে শিশু-গণের বস্ত্রাদি রজকগৃহে পাঠাইয়া অথবা অধিক পয়সা ব্যয় করা আজ কাল কোন রূপেই সমীচীন নহে।

বর্ত্তমানে আমাদিগকে বাজে নাটক নভেল পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে অর্থসমাগমের পথ হয় সেরূপ চিন্তা করিতে হইবে। নাটক নভেলে অযথা সময় ক্ষেপ না করিয়া গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এখন আর বিলাসিতার সময় নাই, এখন দেশের লোকে কিরূপে লজ্জা নিবারণ করিবে তাহাই ভাবিয়া সকলে অস্থির হইয়াছেন। আমাদিগের এখন কাজের ভয় করিলে চলিবে না। সংসারের কার্য্য করিয়া অবসর হইলে অবসর মত কাঁথা সেলাইতে কিংবা চরকায় সূতা কাটিতে হইবে। তাহাতে দ্বিধা বোধ করিলে আমরা সংসারে যথার্থ সাহায্য করিতে কিরূপে সমর্থ হইব?

কাঁথা সিলা সময় ভাগিনেয়ও গৃহে বসিয়া দেশের ও নিজ নিজ সংসারের বেশ উপকার করা যাইতে পারে। আজ কাল আমাদের অনেকেই "চরকা" বা "টাকরী" ব্যবহার জানেন না। "টাকরী" সাহায্যে তুলা হইতে বেশ সূক্ষ্ম সূতা বাহির করা যায় এবং এই সূতা দ্বারা ব্রাহ্মণগণের উপবীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে উদ্গিরিত সূতা এত সূক্ষ্ম হয় যে তদ্দ্বারা প্রস্তুত উপবীত এলাচের খোসার মধ্যে রাখা যাইতে পারে। এখনও আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ সূক্ষ্ম সূতা ও উপবীত প্রস্তুত করিতে না পারেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। আজ কাল বঙ্গ-রমণীর প্রস্তুত এরূপ সূতার অভাবে ব্রাহ্মণ-গণকে বোধ হয় বিদেশজাত সূত্র ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা কোনরূপে নাম মাত্র উপবীত গ্রন্থি দিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইতেছে। এটাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। ধরিতে গেলে এদোষ আমাদেরই। আমরা যদি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া প্রকৃত গৃহিণী হইতাম তবে বোধ হয় সব ধর্ম্মই রক্ষা পাইত। গৃহশিল্পেও আমরা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিতাম।

আমরা গৃহে বসিয়া কি কি গৃহশিল্পের উন্নতি করিতে পারি এ স্থলে তাহারও সামান্য কিছু আভাস দিতেছি। এই দেখুন না কেন আজ কালকার দিনে খাম ও লেটার পেপার স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। আমরা ইচ্ছা করিলে গৃহে বসিয়াই খাম ও চিঠীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া বেশ পয়সা করিতে পারি। প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া খাটিলেই যথেষ্ট। একটু হস্তকৌশল ব্যতীত খাম ও চিঠীর কাগজ প্রস্তুতিতে বাহাদুরী বেশী কিছু নাই। কাগীও আমরা চেষ্টা করিলে ঘরে বসিয়াই হরিতকী, আমলকী, বয়ড়া, মাকুন্দ ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি। আমাদের দেশে এ সকল ফলের অভাব নাই। সামান্য পয়সা খরচ করিলেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তারপর আজ কাল হ্যাণ্ড ম্যাসিনের দ্বারা আমরা গৃহে বসিয়াই ছেলেপিলেদের সার্ট ফ্রক, পেনি, সেমিজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারি। আজ কালকার বাবুরা কাপড়, জামা, ইকিং প্রভৃতি সামান্য একটু ছিঁড়িলেই সেগুলি পরিত্যাগ করেন। আমরা যদি সূক্ষ্ম সেলাইএর দ্বারা সে গুলি তাঁহাদিগকে মেরামত করিয়া দেই, তবে সংসারের যথেষ্ট সাহায্য হয়। পুরুষগণের সময়াভাব বলিয়াই তাঁহারা এতটা করিতে পারেন না, কাজেই সেগুলি পরিত্যাগ করেন। কাহারও অসুখ হইলে আমরা অধিক মূল্যের সাগু, এরারুট বা বার্লি ক্রয় করিয়া রোগীর পথ্য দিয়া থাকি কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকিলে গৃহে বসিয়াই এগুলি অপেক্ষা অতি উপকারী রোগীর খাদ্য আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। সকলেই জানেন বাঙ্গালা দেশে "শটীর" অভাব নাই; কিন্তু ঐ শটীর মূল

হইতে রমণীগণ নিজের চেষ্টায় যে অতি উপাদেয় শিশু বা রোগীর খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। এই শটী মুড প্রস্তুত করা একটা কঠিন কার্য্য নহে। শটীর মূলগুলি পুরুষগণই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবেন, আমরা সেগুলি ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া ও জলে ভিজাইয়া পালো প্রস্তুত করিব, এইমাত্র। অথচ এই শটী মুড এত উপকারী যে অনেক সময়ে দুধের অভাবে ছেলেপিলেদিগকে এই খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। নানাপ্রকার লেস, মেয়েদের খোঁপায় দিবার মাথার জাল, কন্ফটার প্রভৃতি অনেক জিনিষই আমরা নিজ চেষ্টায় বহুল পরিমাণে বাহির করিয়া লাভবান হইতে পারি। এইরূপ গৃহে বসিয়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য প্রস্তুত ক যায়, কেবল উৎসাহ উদ্যম ও একাগ্রতার আবশ্যক। শিল্পকার্য্যে রমণীগণ পুরুষের সহায়তা না করিলে শুধু পুরুষের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে গৃহশিল্পের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। আমরা বঙ্গললনা, আমরা সমাজের ও দেশের আদর্শস্থানীয়া। আমরা যদি আমাদিগের শক্তিমত সামান্যমাত্রও পরিশ্রম করি তাহা হইলে সংসারে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আমরা যদি এ সময়ে দেশের পুরুষগণকে উৎসাহ দান না করি, তবে তাঁহারা এই অশান্তির সময় শান্তি পাইবেন কিরূপে? আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা গৃহে বসিয়াও তাঁহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার না করিতে পারি, তবে তাঁহারা আমাদের জন্য কেন এতটা পরিশ্রম করেন?

আর একটা ভীষণ দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, সেটা দেশের ও রাজার মঙ্গলের জন্য। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমাদিগের দেশ হইতে অনেক সৈন্য বৃটিশ-রাজের সাহায্যের জন্য পাঠাইতে হইবে। বাঙ্গালী চিরকালই কাপুরুষ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গনারী ততোধিক। বর্ত্তমান সময়ে দেশের ও সমাজের উপর এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনের উত্তম সুযোগ আমাদিগের উপস্থিত। এ কার্য্যে সহায়তা সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকেই করিতে হইবে। আমরা যদি নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে এই মহদুদ্দেশ্যে উৎসাহিত না করি এবং রাজপুত কিংবা ক্ষত্রিয় নারীর ন্যায় আপনাপন স্বামী বা ভ্রাতাকে নিজ হস্তে সাজাইয়া না দেই, তবে তাঁহাদের হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইবে কিরূপে? "জন্মভূমি বঙ্গ-জননী যে বীরপ্রসবিনী" মায়ের এই গৌরব আশা করি মাতৃরূপিনী ভগ্নীগণ বেশ রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমানে বঙ্গ-রমণীর কর্ত্তব্য যথেষ্টই আছে; কিন্তু আমরা যদি অন্ততঃ আমাদিগের কর্ত্তব্যগুলির সামান্য কয়েকটী মাত্র সম্পন্ন করিতে পারি, তবেই এ সময়ে সংসারে প্রকৃত আর্থিক সাহায্য করিতে সমর্থ হইব, নচেৎ নহে। ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন।

বাঙ্গালী সৈন্য।

বাঙ্গালীগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও এতদিন সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিছু দিন হইল লর্ড কারমাইকেলের অনুরোধে ভারতগবর্ণমেণ্ট ২২৮ জন বাঙ্গালী যুবককে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ইহাদের ইংরেজ সেনানায়ক বলিয়াছেন, যুদ্ধ বিদ্যায় ইহারা ভারতীয় কোন জাতি হইতে পশ্চাৎপদ নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে উৎসাহিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠনে অনুমতি দিয়াছেন। এই রেজিমেণ্টে ১৮৮০ জন বাঙ্গালী সৈন্য থাকিবে। শান্তির সময় সৈন্য বিভাগে লোক সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ কত সৈনিক এমন আছে যাহাদিগকে জীবনে কোন দিন যুদ্ধ করিতে হয় না। কিন্তু যুদ্ধের সময় যাহারা সৈনিক দলে প্রবেশ করে তাহারা মৃত্যুকে আনিয়া শুনিয়াই আলিঙ্গন করে। সুতরাং এখন দলে দলে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সৈনিক দলভুক্ত হইতে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, দেশের আহ্বানে, রাজার আহ্বানে প্রাণ দিতে বাঙ্গালী কিছুমাত্র ভীত নহে। যেরূপ দ্রুত গতিতে শিক্ষিত যুবকগণ সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণ হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, এই সকল বাঙ্গালী যুবক ভগবানে মতি

সম্পাদক মুকুলদেবের দেশের সেবা করা করুক। প্রত্যেক কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মুকুলদেবের চিরদিনের অনুরোধ করিয়া একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মায়ের ডাক।

(গান)

আজ
মায়ের নামে ডাক এসেছে,
আয় রে আয়, চল্‌রে যাই।

অপযশের শয্যা ছেড়ে
শত বর্ষের গ্লানি কেড়ে
উঠ্‌তে হবে, ছুট্‌তে হবে;
ভাবনা ভয়ের সময় নাই—
আয় রে আয়, চল্‌রে যাই।

আজ
স্বপন ছেড়ে জাগতে হবে,
মায়ের কাজে লাগতে হবে,
মরণ ভিক্ষা মাগতে হবে—
জীবন ভিক্ষা সেই ত ভাই;
আয় রে আয়, চল্‌রে যাই।

শুধু
চোখের জলে, কথার পানে
অর্ঘ্য নহে বাঞ্ছিত প্রাণে;—
এবার পূজা জীবন দানে—
জগৎচক্ষু দেখুক তাই।

আজ
মায়ের নামে ডাক এসেছে
আয় রে আয়, চল্‌রে যাই।

শ্রীকামিনী রায়।

আমার সন্তান পালন।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আঠার বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। সম্ভ্রান্ত-কুলে আমার স্বামী জন্মিয়াছিলেন। আমার মা অতি প্রাচীন বনিয়াদি ঘরের মেয়ে ছিলেন। বংশগৌরবের অহঙ্কার করিবার জন্য আমি একথার উল্লেখ করিতেছি না, কিন্তু এই বংশগৌরবের একটা প্রভাব স্থায়ীভাবে আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকেই অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়াছিলেন,—দরিদ্রতার পীড়নে অনেকেই পীড়িত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন কলঙ্কজনক দুষ্কর্ম্মে কাহারও নাম কলঙ্কিত হয় নাই। আমি মাতৃকোলে দুগ্ধপান কাল হইতেই আমার বংশ সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিতাম, এবং সেই শিশু বয়স হইতেই ঐ সকল কথা দৃঢ়ভাবে আমার মনে বসিয়া গিয়াছিল। তাহার ফল এখন এই হইয়াছে যে, মনে হয়, আমার কোন সন্তানকে দুষ্ক্রিয়ান্বিত দেখা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুও আমার নিকট ভাল। ভগবান করুন, আমার হৃদয়ের এই অহঙ্কারের শাস্তি তিনি যেন আমার জীবিতকাল মধ্যে না দেন। যাহারা অধঃপতিত, যাহাদের জীবন কলঙ্কিত, আমি তাহাদিগকে কখনই বলিব না, "আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক পবিত্র,—আমার কাছে তোমরা অগ্রসর হও।" না—না, কখনই এমন ভাব আমার অন্তরে স্থান পায় না। যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল, সংসারে যাহাদের কোনপ্রকার পদস্খলন হইয়াছে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই আমার অন্তরের সহানুভূতি আছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু যদি আমার কোন সন্তানের এই দশা হয় তবে আমার হৃদয় বুঝি আর মানুষের হৃদয় থাকিবে না, জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহা খাক হইয়া যাইবে;—আমার মনে হইবে, আমার অতীত জীবনের কোন পাপ, আমার কোন অসতর্ক কথা এই পাপের বীজ সন্তানের হৃদয়ে বপন করিয়াছিল। বাস্তবিক, সন্তানের

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

জননীর জীবনযাপনের পথ অতি সংকীর্ণ। সন্তানকে পুতুল করিলেও চলিবে না, আবার খেলার সামগ্রী করিলেও চলিবে না। শান্তভাবে, সুশৃঙ্খল ভাবে, ভ্রষ্টার অতুল প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন-পথে তাঁহাকে চলিতে হইবে,—মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার বুকে তিনি এক অমর আত্মা পালন করিতেছেন। তাঁহার মধ্যদিয়া ভবিষ্যৎ সংসারে সুখ বা দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত হইবে, তাঁহার মধ্যদিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদ অথবা অভিসম্পাত সংসারের উপর বর্ষিত হইবে; জননী সংসারে হয় মঙ্গলময়ের কল্যাণ কুসুম ফুটাইয়া তুলিবেন অথবা শয়তানের অনুচর সৃষ্টি করিবেন।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ই জননীর প্রভাব সন্তানের উপর পতিত হয়। সুতরাং এই অবস্থায় উদ্বেগ দুশ্চিন্তা তিনি বিষের ন্যায় দূরে রাখিবেন। কিন্তু এই কাজটী বড় কঠিন; মানুষের শক্তির অতীত বলিলেও বুঝি অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা ও দৃঢ় ইচ্ছার বলেই মনকে ইহা হইতে মুক্ত রাখা যায়। গর্ভাবস্থায় জননীর আরাম-প্রিয়তা গর্ভস্থ সন্তানের চরিত্রের উপর বড় মন্দ ফল আনয়ন করে, এই সময়ে দুর্ব্বলতার অজুহাতে শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করা হয়, নানারূপ বলকারক ঔষধ সেবন করা হয়, মনের বল অথবা শিথিল করা হয়;—আর ভগবানের প্রেরিত শিশু-আত্মা জননীর অপরাধের দাগ প্রাণে লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রথম মাসের পর হইতে নবম মাস পর্য্যন্ত যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম শুধু সন্তানের কল্যাণের জন্য নয়, জননীর মঙ্গলের জন্যও নিতান্ত আবশ্যক। "আমি বড় দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়" প্রসূতির এইরূপ উক্তি ডাক্তারের অর্থ বৃদ্ধি করে, সুত জননীকে সন্তানহীনা, সুত পতিকে পত্নীহীন করে, আর কিছুতেই তত করে না।

আমার প্রথম সন্তান গর্ভে থাকিতে আমার স্বভাব বড় বিটখিটে ছিল,—আমি বড় আরামপ্রিয় ছিলাম। কাজকর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত ভারবহ বোধ হইত। ভাবী সন্তানের জামা-কাপড় তৈয়ার ভার ননদের উপর দেওয়া হইল, কারণ আমি ছাইকাট কিছু জানিতাম না। এই হইল প্রথম ভুল। আমার স্বামীর মাসিক আয় দুই শত পাউণ্ড বা তিন হাজার টাকারও কম ছিল। কিন্তু তাহাতে কি? আমাদের দাম্পত্য প্রেম এত গভীর ছিল যে পরস্পরের আরামের জন্য আমরা বিহারের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। বিবাহের যৌতুকস্বরূপও আমার হাতে এক শত পাউণ্ড বা পনের শত টাকা ছিল। ভবিষ্যৎ সৃষ্টি বা পরিশ্রমের ইচ্ছা আমার মনে একটুও জাগিল না। আমার মার সংসারে সূচীকর্ম্মের প্রচলন ছিল না, আমার আরামের নূতন সংসারেই বা কেন থাকিবে? এইরূপে আমার গর্ভাবস্থার নয়টী মাস চলিয়া গেল। দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া সারা দিন আমি সোফার উপর শুইয়া থাকিতাম। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে হইলে যেন মাথায় বাজ পড়িত। কিন্তু পানাহারে আমার অরুচি ছিল না। তথাপি মুখরুচিকর নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিতাম এবং অবস্থার অতিরিক্ত হইলেও গভীর ভালবাসায় বশবর্ত্তী হইয়া স্বামী তাহা আনিয়া দিতেন। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার দ্রব্য আহার করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি হয় তাহা সর্ব্বত্রই আলস্য বা মনের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে উৎপন্ন হয়। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি; আমার বেলা তাহাই হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ শুইয়া থাকা, অনেক রাত জাগা এবং পরিপাক শক্তির উপর অত্যাচারের ফল আমার পক্ষে বড় ভয়ানক হইয়াছিল। প্রথম সন্তানের জন্মকালে আমার জীবনের আশা ছাড়িয়াই দেওয়া হইয়াছিল। সন্তানের সম্ভাবিত জন্মকাল সম্বন্ধে গণনার ভুলে আমার পরিচিত নির্দ্দিষ্ট দাইটী আসি পাইলাম না। প্রথম প্রসূতিদের এরূপ ভুল প্রায় সর্ব্বদাই হয়। মা জীবিত ছিলেন না, সুতরাং এই সময়ে তাঁহার সাহায্য মিলিল না। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইল। এক বৃদ্ধা পিসী আমার শুশ্রূষা করিতে আসিলেন, কিন্তু রোগীর শুশ্রূষা করিতে হইলে যেরূপ দৃঢ়চিত্ততার আবশ্যক, পিসীর তাহা ছিল না। আমি

যাহা বলিতাম দাসীর মত তিনি তাহাই অবিচারে পালন করিতেন। কিন্তু অপরিচিতা ধাত্রীটী আমার পরম মঙ্গল করিলেন। প্রায় দুই মাস কাল জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থানে থাকিয়া অবশেষে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম। আমার ক্ষীণকায় শিশুটীকে স্তনদানের যে বিমল আনন্দ আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, কারণ আমার স্তনে দুধ ছিল না। তৈরী খাদ্য খাইয়া খাদ্য আমার মানুষ হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে আমি স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধাত্রীটীকে আমার যাবৎ ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহাকে রাখিতে খরচ বেশী ছিল না, আর তাঁর সাহায্য আমার বেশ ভরসার উদ্রেক করিয়াছিল। আমি বেশ একটু সবল হইলে তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, আমাকে ভাল করিয়া নিয়মিতরূপে হাটিয়া বেড়াইতে হইবে। সখের হাটা নয়, বেশ পরিশ্রম করিয়া রক্ত গরম না হওয়া পর্য্যন্ত হাটিতে হইবে।

একদিন ছেলেকে জামা পরাইতে পরাইতে ধাত্রী বলিলেন, "অনেক প্রার্থনার বলে এ ছেলেকে আপনার বাঁচাইতে হইবে।"

আমি। কেন, একথা বলছেন কেন?

ধাত্রী। আপনি যদি এই শিশুর প্রতি আপনার কর্ত্তব্য করিতেন তবে ইহার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরো কত সবল হইত! এর স্বভাব এমন খিটখিটে হইত না।

আমি। আমি কি করিয়া শিশুর প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী করিলাম?

ধাত্রী। আমি তা খুলিয়াই বলিতেছি। যখন আপনার মত সুস্থ সবল প্রকৃতিবিশিষ্ট এরূপ রোগা সন্তান প্রসব করিতে দেখি তখন তাহাদিগকে খুলিয়া সকল কথা বলা আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

আমি। খোকা যে রোগা হইল, আমার পক্ষে তাহা নিবারণ করা কিরূপে সম্ভব ছিল? আপনি ত জানেন আমার বুকে দুধ ছিল না, আমি তাহাকে দুধ দিতে পারি নাই।

ধাত্রী। হাঁ, আপনি পারেন নাই, আমি তাহা জানি। কিন্তু খোকার জন্মের পূর্ব্বে আপনি তাহার প্রতি এবং আপনার নিজের প্রতি যদি আপনার কর্ত্তব্য যথোচিতরূপে করিতেন তবে আপনি তাকে বুকের দুধই দিতে পারিতেন। আমি জানি না প্রথম চারিমাস আপনি খুব অসুস্থ ছিলেন কিনা; অনেক সুস্থ সবল মেয়েও গর্ভাবস্থার প্রথম চারিমাস অসুস্থ থাকে। কিন্তু তারপর প্রতিদিন মুক্ত বায়ুতে শারীরিক পরিশ্রম বা বেড়ান আপনার উচিত ছিল, একদিনও—বৃষ্টিবাদলেও—তাহা বাদ দেওয়া উচিত ছিল না। তা ছাড়া নানাপ্রকার মুখরোচক খাদ্যে তিনিবার না খাওয়াই আপনার উচিত ছিল। কারণ তাহাতে ক্ষুধামান্দ্য হওয়া অনিবার্য্য; আর এই ক্ষুধামান্দ্য প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশু উভয়েরই মেজাজ খারাপ করিয়া ফেলে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি,—আপনি রোগা ছাড়িয়া উঠিতে বড় ইচ্ছা করিতেন না, আর আপনার মেজাজও বড় ভাল থাকিত না।

আমি। হাঁ, তা বটে, আমার বড় পিত্তের উপদ্রব হইয়াছিল।

ধাত্রী। হাঁ,—আর এই শিশুও ঐরকমই হইবে। আপনার নিকট হইতে সে ইহা পাইয়াছে। আপনি রাগ করিবেন না,—আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য। আমার বেশ ভয় আছে যে আপনি শীঘ্রই ইহাকে নিয়া অনেক ভুগিবেন। দুধে থাকিতে সে উপযুক্ত খাদ্য পায় নাই, এখনও তাই ওর শরীর ছাপুই হইতেছে না।

আমি। কিন্তু আপনি ত দেখিতেছি ওকে জল দিয়ে তৈরী করা বুড ছাড়া আর অন্য কিছু দেন না। দুধ দেন না কেন?

ধাত্রী। হজম করতে পারবে না তাই দুধ দেই না। শুধু খাওয়ালে ত হয় না। হজম যদি করতে না পারে তবে ছেলের যে অসুখ করবে। যে সব ছেলে বুকের দুধ পায় না, তাদের জন্য আজকাল মেলিন্স বুড, এলেনবারির বুড প্রভৃতি কতকগুলি কৃত্রিম বুড বা খাদ্য বাহির হইয়াছে। সেগুলি অনেকটা নিরাপদ। আপনার ছেলের জন্য তাই আমি একটা আনাইয়াছি।

এই সকল কলোপকথনের ২।১ দিন পরেই ধাত্রী তাহার পাওনা পরসাকড়ি চুকাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। খোকার সব ভার আমার উপর পড়িল। ধাত্রীকে বিদায় করিয়া দিবার পর দেখিলাম, আমার বিবাহের যৌতুকের পোনর শত টাকা সমস্তই খরচ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর ১৩ পাউণ্ড (২২৫৲) বেতনই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল রহিল। বিবাহের পূর্ব্বে যে টাকা যথেষ্ট মনে হইয়াছিল, বিবাহের পর তাহা দ্বারা ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া পড়িল।

ধাত্রী আমাকে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা সব সত্য বলিয়া না মানিলেও তাঁহার কথাগুলি আমার প্রাণে খুব লাগিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, গর্ভাবস্থায় আমার অলসতা, আরামপ্রিয়তা, ইত্যাদি দোষেই খোকা আমার এমন রোগা ও খিটখিটে হইয়াছে; আমি এখন সংকল্প করিলাম যে, সমস্ত মন প্রাণ দিয়া আমি আমার ধনের যত্ন করিব।

ধাত্রী নিজের বিছানার পাশে দুখানা চেয়ার জোড়া দিয়া খোকার বিছানা করিতেন। তাহার বিছানাটা আদবেই নরম ছিল না, শক্ত কম্বলের উপর তাহাকে শোয়ান হইত। আমি এই জন্য মনে মনে বিরক্ত হইতাম। ধাত্রী চলিয়া যাইবার পরই আমি এ সকল বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম।

প্রথম রাত্রে আমরা শুইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে আমি কোলে করিয়াই রাখিলাম। ধাত্রীর কাছ থেকে যাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অধিকারে পাইয়া আমাদের যে কি আনন্দ হইল তাহা আর বলিবার নয়। আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে রাত্রির খাওয়ান খাওয়াইতেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম আর কি! আমাদের ঝি শেষে খাবারটা তৈরী করিয়া আনিল। কিন্তু খাবারটা সেদিন কেমন কাল কাল দেখাইতে লাগিল। বুঝিলাম ঝি বেশ পরিষ্কার করিয়া তৈরী করিতে পারে নাই। যা' হোক এতটুকু ছোট ছেলে তার আস্বাদ আবার কি বুঝিবে মনে করিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু যাহা ছেলের যে চীৎকার—যেন তার গায়ে কেহ সূচ ফুটাইয়া দিতেছে। স্বামী সে কান্না দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। আমি জোর করিয়া তাহাকে বেশ অনেকখানি খাবার খাওয়াইয়া দিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে কিন্তু বমি করিয়া কিছুটা ফেলিয়া দিল। তারপর হিক্কা—সে হিক্কা আর থামে না! অনেকক্ষণ কাঁধে ফেলিয়া শোওয়াইয়া পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে তবে সে ঘুমাইয়া পড়িল। তারপর আমি তাকে ধাত্রীর সেই কম্বলে, আর চেয়ারের তৈরী বিছানায় না শোওয়াইয়া আমার পাশে আমার সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলাম। রাত্র পাঁচ মিনিট শুইয়াছিল, তারপর কি ভয়ানক চীৎকারই না সে আরম্ভ করিল! আর্থার বলিলেন, "মেরি, ওর কাপড় ছাড়াইয়া দেখ, নিশ্চয় ওর গায়ে কোথাও পিন ফুটিয়াছে, তাই এত কাঁদছে।"

আমি উঠিয়া বসিলাম। স্বামী আলো ধরিলেন, খুঁজিয়া পিন কিন্তু পাইলাম না। তিনি বলিলেন, "ছেলে রোগা বটে, কিন্তু তার গলার জোর ত খুব!"

পিঠ চাপড়াইয়া, দোলাইয়া অনেক কষ্টে ছেলেকে ত ঘুম পাড়াইলাম। আমার ডান হাতের উপর তার মাথা রাখিয়া তাকে শোওয়াইলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার হাত ব্যথা করিতে লাগিল। হাত ঠিক করিয়া লইবার জন্য যেই একটু নড়িলাম অমনি সে আবার চীৎকার জুড়িয়া দিল। প্রায় সারারাত্রি এই ভাবেই কাটিল। একটু ঘুমায়, আবার চীৎকার। শেষে ভোর বেলা সেও অবসন্ন হইয়া পড়িল, আমিও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিবার যেন আর শক্তি রহিল না। স্বামী আপিস উঠিয়া বিষণ্ণ মনে একাকী প্রাতঃভোজন শেষ করিলেন। সে রাত্রির কষ্টের কথা জীবনে ভুলিব না। আর যে এমন কষ্টের রাত্রি কখনো আসে নাই তা নয়, কিন্তু সকল বিষয়েরই প্রথম স্মৃতি চিরদিন মনে থাকে।

(ক্রমশঃ)

নারী।

(১)

রমণী রে, তোর বুকে
কি সুধা লুকান আছে,
ধরার পিপাসু ছবি
ছুটায় রে তোর কাছে!

(২)

তোর রূপ, তোর হাসি,
একেকটী কথা তোর,
বাজায় প্রাণের বাঁশী
কি আবেশে করি ভোর!

(৩)

তুই যদি না রহিতি
শ্মশান হইত ধরা,
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া
মরিত দলিয়া জরা!

(৪)

রমণীর প্রাণে প্রাণে
ছুইয়ে যাদব-ভোর,
জগৎ মাতর বাকে
'ওরেশিস্' ছবি তোর।

(৫)

জননী ভগিনী রূপে,
ধারারূপে, সুতা রূপে,
কি সুধা বিলাস তুই
নিশিদিন চুপে চুপে।

(৬)

বাহিরে কি কোলাহল,
আঘাত সংঘাত কত,—
অন্তরে অন্তঃপুরে
একতারাটীর মত!

(৭)

তোর পাশে কি সান্ত্বনা,
কি আরাম, কি আরাম,—
শান্তির প্রলেপ তুই
দাবদাহে অবিরাম।

(৮)

রমণীরে, তুমি হও
দান তুই দেবতার,
মধুময়ী ভাগীরথী
মহাপীঠ সাধনার!

(৯)

তুই পুণ্য নিকেতন,
পবিত্রতা-প্রস্রবণ,
শক্তিরূপা নারায়ণী
বিশ্বের বাহিতা ধন।

(১০)

জীবন-যজ্ঞের চরু
ত্রিলোকের বিনোদিনী,
ভুবনমঙ্গল দীপ
নারী তুই নিরুপমা!

(১১)

আপনারে উৎসর্গিয়ে
জগতের হিত-ব্রতে,
কি স্বর্গ সৃজিস্ তুই
শ্রেষ্ঠ সত স্বর্গ হতে!

(১২)

তোর কোলে তোর বুকে
তোর পদে পেয়ে স্থান,
সাধ যায় জন্ম জন্ম
হই এত ভাগ্যবান।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্ট।

শ্যামনগরের জমিদার।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(১১)

ক্রমে আমাদের দেশে ফিরিবার সময় আসিল। একই দিনে ডাক্তার ঘোষাল, তাঁহার পত্নী, নৃপেন্দ্রনাথ, রাণীসাহেবা, রাজাসাহেব ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাদি, সুশীলা, কর্ম্মকার মহাশয় ও আমি—আমরা সকলে লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলাম। স্থির হইল যে আমরা ত্রিন্দিসি দিয়া যাইব।

ত্রিন্দিসিতে এক জাহাজে উঠিলাম। কয়েকদিন আমাদের সকলেই অল্পাধিক সমুদ্রপীড়া ভোগ করিয়া ক্রমে সুস্থ হইলাম। তারপর অতি আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কর্ম্মকার মহাশয় প্রতিদিন আমাদিগকে নানাবিধ উপায়ে নূতন নূতন আনন্দ দিতে লাগিলেন।

এই জাহাজের আরোহীদিগের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ ছিলেন। তাঁর নাম মিঃ হ্যারিসন্। ইনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের প্রধান সেক্রেটেরী। ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইয়াছে, তাই, কার্য্যস্থলে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছেন। মিঃ হ্যারিসন্ অত্যন্ত অল্পভাষী। তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতেন না। ক্বচিৎ রাজাসাহেবের সহিত দুএকটি কথা কহিতেন। এই গম্ভীরপ্রকৃতি অল্পভাষী মিঃ হ্যারিসন্ও যদুনাথকে পাইয়া তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গেলেন। মানুষে যেমন করিয়া বানর, ভালুককে লইয়া নানা মজা করে, যদুনাথকে লইয়া মিঃ হ্যারিসন্ যেন অনেকটা সেই প্রকার করিতেন। একদিন মিঃ হ্যারিসন্ বলিলেন, "কর্ম্মকার, তুমি মুখে বেহালা বাজাইতে পার?" যদুনাথ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ পারি।" "আচ্ছা বাজাও দেখি।" অমনি যদুনাথ মুখে বেহালা বাজাইলেন, অর্থাৎ তিনি মুখ দিয়া এমন শব্দ বাহির করিলেন যে, মনে হইতে লাগিল বুঝি অতি নিকটে কেহ বেহালা বাজাইতেছে। বেহালার বাজনা শেষ হইলে মিঃ হ্যারিসন্ বলিলেন, "মিঃ যদুনাথ, তুমি ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পার?"

যদুনাথ বলিলেন, "তা পারি।"

মিঃ হ্যারিসন্ বলিলেন, "আচ্ছা কর।" অমনি যদুনাথ বিখ্যাত বক্তাদিগের ভঙ্গিতে বুক উঁচু করিয়া, হাত নাড়িয়া, অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া মিঃ হ্যারিসন্ এত হাসিতে আরম্ভ করিলেন যে মনে হইল বুঝি দম বন্ধ হইয়া মারা পড়িবেন। যদুনাথের এই ইংরেজী বক্তৃতাতে ইংরেজী ভাষার কথা ব্যবহৃত হইতেছিল কিন্তু তিনি ঐ সকল কথা এমন অসংলগ্ন ভাবে বলিতেছিলেন যে তার কোনই অর্থ হয় না। সেই বক্তৃতার সময়কার যদুনাথের গম্ভীর মুখখানি দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কাহারও সাধ্য রহিল না।

(২)

একদিন রাজাসাহেব যদুনাথকে বলিলেন, "যদুনাথ, আমার একটি বহুমূল্যের ঘড়ি আজ হাত হইতে পড়িয়া খারাপ হইয়া গিয়াছে। তুমি সেটিকে ভাল করিয়া দিতে পার?"

যদুনাথ বলিলেন, "হজুর, ঘড়িটিকে একবার দেখিলে বলিতে পারি।" রাজাসাহেব যদুনাথকে ভাঙ্গা ঘড়িটি দেখাইলেন, যদুনাথ সেটিকে খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "এখন এটাকে কাজ চলিবার মত করিয়া দিতে পারি।"

রাজাসাহেব। কত সময় লাগিবে?

যদুনাথ। রাজা-সাহেবের যদি নিতান্ত প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ চলা গোছের করিয়া দিতে পারি।"

রাজা-সাহেব ঘড়িটি যদুনাথকে দিলেন। যদুনাথ পনের মিনিট মধ্যে সেটিকে মেরামত করিয়া রাজা-সাহেবের হাতে দিলেন। রাজাসাহেব এজন্য যদুনাথকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেন, যদুনাথ বলিলেন, "হজুর, এজন্য পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। এ গরীবের উপর হজুরের অনুগ্রহ থাকিলেই হইল। রাজা-সাহেব ইহাতে যদুনাথের উপর অত্যন্ত খুসী হইলেন।

সাহা-সাহেবের একটি পাঁচ বৎসর বয়সের পুত্র ছিল। তার ডাক-নাম ছিল বুল্ বুল্। বুল্ বুল্ প্রথম প্রথম যদুনাথকে দেখিয়া ভয় পাইত। কিন্তু কয়েক দিবস পরেই তার সহিত যদুনাথের এমন বন্ধুত্ব জন্মিল যে রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে যদুনাথের কাছে যাইব বলিয়া বুল্ বুল্ কান্না জুড়িয়া দিত, তখন তাহাকে সান্ত্বনা করা দায় হইত। বুল্ বুল্ দিবসের অধিকাংশ সময় যদুনাথের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়াইত।

এই জাহাজে জোসেফ নামক একজন ইহুদি যুবক ছিলেন। জোসেফের মস্তিষ্কের একটু গোলমাল ছিল। জোসেফ তাঁহার মাতার সহিত বোম্বাই যাইতেছিলেন। জোসেফ অন্য বিষয়ে প্রকৃতিস্থ লোকের ন্যায় আচরণ করিতেন কিন্তু কেহ তাঁর নিকট "ক্রাইষ্ট" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। তখন আর তাঁর পাত্রাপাত্র, স্থান অস্থান, জ্ঞান থাকিত না। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতেন তাহাকেই কামড়াইতে যাইতেন এবং বলিতেন যে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পাতালে চলিয়া যাইবেন এবং পাতালের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বদ্মায়েস লোকদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিবেন। এই সময়ে কয়েকজন বলবান্ লোক অতি কষ্টে তাঁহাকে নিবারিত করিত। জোসেফকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে তিনি কিছুই আহার করিতেন না। সেইজন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিতেন না। একদিন জোসেফের এইরূপ উন্মত্ততাবস্থায়, কোনপ্রকারেই তাঁহাকে শান্ত করা যাইতেছে না। তিনি সকলের হাত ছাড়াইয়া, জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য ছুটিয়াছেন, এমন সময় জোসেফের বিপরীত দিক হইতে তীব্রকণ্ঠে তিনবার "কুহু কুহু কুহু" উচ্চারিত হইল। অমনি জোসেফ স্থির হইলেন। তাঁহার আর সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া হইল না। তিনি শব্দের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখানে কোকিল আসিল কোথা হইতে? আমি ঐ কোকিল চাই।" যদুনাথ ঐ শব্দ করিয়াছিলেন। জোসেফের কথা শুনিয়া তাঁর নিকটে গিয়া যদুনাথ বলিলেন, "কোকিল আমার গলার মধ্যে আছে। আপনি কোকিলের ডাক শুনিবেন?" জোসেফ বলিলেন, "হাঁ শুনিব। কোকিলের ডাক শুনিলে আমার মন বড় ভাল থাকে। সেইজন্যই ত ভারতবর্ষে যাইতেছি।" যদুনাথ অমনি জোসেফের হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসাইলেন ও নিজে একখানি চেয়ারে বসিলেন এবং কোকিলের স্বরের অনুকরণে "কুহু কুহু" শব্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপ পাঁচ মিনিট চলিল। শুনিতে শুনিতে জোসেফ চেয়ারে হেলান দিয়া তন্দ্রা-মগ্ন হইলেন। ইহার পর হইতে যদুনাথ জোসেফের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন এবং তিনি সর্ব্বদাই জোসেফকে ফুর্ত্তিতে রাখিতেন। জোসেফের মাতা সেদিন জোসেফকে রক্ষা করার জন্য যদুনাথকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

ক্রমে আমাদের জাহাজ এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিল।

(৩)

এডেন বন্দর হইতে রওনা হইবার দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। অল্প অল্প ঝড় বহিতে লাগিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঝড়ের বেগ এত বর্দ্ধিত হইল যে জাহাজের আরোহী ও পরিচালকগণকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। যতই রাত্রি বেশী হইতে লাগিল ঝড় ও বৃষ্টির বেগ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু মেঘ গর্জ্জনের সহিত সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন মিলিত হইয়া জাহাজবাসীদিগের কর্ণ বধিরপ্রায় করিয়া তুলিল। উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় জাহাজ একবার উঠিতে ও একবার পড়িতে লাগিল। আমাদের কাহারও জাহাজে স্থির হইয়া বসিবার কিম্বা দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য রহিল না। জাহাজ এত দুলিতে লাগিল যে আমরা সকলেই গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। এই-সময়ে একবার যেন একটা শব্দ হইল যে জাহাজের কোন কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। ইহাতে জাহাজের আরোহীরা আরও ভীত হইলেন। জাহাজের মিস্ত্রীদের সহিত যদুনাথও কল মেরামত করিতে লাগিয়া গেলেন।

সারারাত্রি ধরিয়া জাহাজ অন্ধবেগে ছুটিয়া চলিল। জাহাজের কাপ্তেন বলিলেন যে জাহাজ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতেছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে কোন পর্ব্বতে কিম্বা কোন বড় জাহাজে লাগিয়া আমাদের জাহাজ চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কার কথা কাপ্তেন জাহাজের সকল আরোহীর নিকট প্রকাশ করিলেন না। অল্প সংখ্যক আরোহীদিগকে তিনি প্রকৃত আশঙ্কার কথা জানাইলেন এবং অন্যান্য আরোহী-দিগকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, "কোন চিন্তা নাই, আপনাদের কোন বিপদ ঘটিবে না।" শেষ রাত্রের দিকে ক্রমশঃ ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে বেলা প্রায় নয়টার সময় ঝড় বৃষ্টি একবারে থামিয়া গেল, সমুদ্র শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। জাহাজ স্থির হইল।

তখন আমরা দেখিলাম যে আমরা একটী দ্বীপের অতি নিকটে রহিয়াছি। কাপ্তেন বলিলেন যে তিনি এই পথে অনেকবার জাহাজ লইয়া গিয়াছেন কিন্তু এই দ্বীপ কখন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আরোহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং স্বয়ং কাপ্তেন সেই দ্বীপে উঠিয়া সেই দ্বীপের কিয়দংশ দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে বার তের জন আরোহীর সহিত কাপ্তেন ছোট বোটে করিয়া সেই দ্বীপের তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সহিত আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেই সময় আমার পায়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হওয়ায় আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইতে পারিলাম না। মিঃ হ্যারিসন দ্বীপ-দর্শনার্থীদিগের অগ্রণী হইলেন। মিঃ হ্যারিসনের উদ্ভিদ্ বিদ্যায় অধিকার ছিল। তিনি একখানি ছোট কুড়াল হাতে করিয়া গেলেন।

(৩)

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে দ্বীপদর্শন করিতে গমনকারীরা ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ হ্যারিসন কতকগুলি লতাপাতা সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে একজন নূতন মনুষ্য আসিলেন। সেই নবাগত মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাহাজের আরোহীরা চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

মিঃ হ্যারিসন জাহাজে উঠিয়াই বলিলেন, "গত রাত্রি আমাদের বড় কষ্টে কাটিয়াছে, কিন্তু আমার সঙ্গে এই যে নূতন মনুষ্যটিকে দেখিতেছেন ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদের এত যে কষ্টভোগ তাহা সার্থক হইয়াছে। ইঁহার পরিচয় পাইলে আপনারা সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন, একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমুদ্রের তীরে দৈবাৎ ইঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়া আমি বিস্মিত হই। তারপর অতি অল্প কথায় ইনি তাঁহার যে পরিচয় দেন, তাহাতে আমার বিস্ময়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। ইনি আমার সহিত আমাদের জাহাজে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে আমার সঙ্গে আনিয়াছি। ইনি সময় মত ইঁহার জীবনের বিস্ময় ও কৌতূহলজনক বিবরণ আমাদিগকে শুনাইতে চাহিয়াছেন।"

(৪)

মিঃ হ্যারিসন যাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে আনিয়াছেন তাঁহার পরিধানে স্থূল বস্ত্র, তাঁহার মস্তকে জটাভার, সেই জটা আগুল্ফলম্বিত। তাঁহার মুখ-মণ্ডল বিশাল শ্মশ্রু ও শ্মশ্রুতে আবৃত। তাঁহার বিশাল শ্মশ্রু তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার জটা ও শ্মশ্রু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। ইঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশের কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইল। ইঁহার "আয়ত লোচন, উন্নত ললাট, সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট," দেখিয়া ইঁহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল না।

নবাগত ব্যক্তি ডাক্তার ঘোষাল, তৎপুত্র নৃপেন্দ্র, যদুনাথ ও আমাকে দেখিয়া ইংরাজী-ভাষায় বলিলেন, "আপনাদের চেহারা দেখিয়া আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান করিতেছি।" আমরা বলিলাম, "আপ-নার অনুমান সত্য। আমরা বাঙ্গালী।" তাহা শুনিয়া নবাগত ব্যক্তি আমাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। আমিও বাঙ্গালী।" ডাক্তার ঘোষাল বলিলেন, "বলেন কি! আপনিও বাঙ্গালী! এখানে কেমন করিয়া আসিলেন? আপনার এরূপ অবস্থা কেন?" এই

কথার উত্তরে নবাগত ব্যক্তি পরিষ্কার বাঙ্গলা ভাষায় বলিলেন, "সে বিবরণ আমি সময় মত আপনাদিগকে শুনাইব। আমার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইতেছে এই জটা ও শ্মশ্রু-গুম্ফ এবং পরিধেয় মূলবস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালীর মত ধুতি চাদর পরিধান করা। এখানে যদি ধুতি চাদরের একান্ত অভাব থাকে তাহা হইলে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আপনাদের মত কোট পেণ্টালুন পরিধান করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমার নিকট ধুতি আছে, কিন্তু গায়ে দিবার চাদর নাই।" নৃপেন্দ্র বলিলেন, "আমার নিকট ধুতিও আছে, চাদরও আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহা এখনই আপনাকে দিতে পারি।" নবাগত ব্যক্তি আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়? আপনার কণ্ঠস্বর যেন আমার বড় পরিচিত বোধ হইতেছে।" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়।" তাহা শুনিয়া নবাগত ব্যক্তির উজ্জ্বল চক্ষু আরও উজ্জ্বল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ী কোন গ্রামে বলিতে আপত্তি আছে কি?" আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি একটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার বাড়ী শ্রাবনগর গ্রামে ছিল। এখন আপনার নাম কি, নিবাস কোন গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "খুব জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তৎপূর্ব্বে আমি আপনাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।" আমি বলিলাম, "আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা আমাকে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "আপনি কতদিন হইল বাঙ্গলাদেশ ছাড়া?"

আমি। প্রায় পনর বৎসর।

নবাগত ব্যক্তি। বাঙ্গলাদেশ হইতে পনর বৎসর পূর্ব্বে কি উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়াছিলেন?

আমি। ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যাই। আমাদের গ্রামের জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে যান। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাই।

নবাগত ব্যক্তি। আশা করি, আপনার বন্ধুগণ অনেকদিন হইল স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

আমি। আমি যতদূর জানি তাহাতে শুনিয়াছি যে, আমরা যে কয়জন একসঙ্গে বিলাতে যাই তাঁহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় ও আমি ছাড়া আর সকলেই স্বদেশে ফিরিয়াছেন। আমি নানা দেশে ঘুরিয়াছি। কৃষ্ণপদ জাহাজডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন।

নবাগত ব্যক্তি। আহা! বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহার মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গেল?

আমি। তাঁহার মৃতদেহ পাওয়ার কথা শুনি নাই। তাঁহার মৃত্যু হওয়ার কথা আমার অনুমান মাত্র।

নবাগত ব্যক্তি। এখন আর আপনাকে বিরক্ত করিব না, আমার বর্ত্তমান বেশভূষার পরিবর্ত্তন না করিয়া এবং আমার এই বিশাল জটা শ্মশ্রু প্রভৃতির বিনাশ সাধন না করিয়া আপনাদিগের সহিত আর কোন আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

তৎপর নবাগত ব্যক্তির মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত হইল। তিনি বাঙ্গালীর মত ধুতি চাদর পরিধান করিলেন। এইবার তাঁহার মূর্ত্তিটি দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি আমার নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। নবাগত ব্যক্তি আমার বিস্মিতভাব অবলোকন করিয়া বলিলেন, "ভবানীচরণ, এখন বল দেখি আমি কে?

আমি বলিলাম, "আমার যদি বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার কৃষ্ণপদ দাদা।" নবাগত ব্যক্তি বলিলেন, "তোমার সন্দেহের কারণ নাই। আমি তোমাদের কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ই বটে। মিঃ হ্যারিসনকে ইতিপূর্ব্বেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়াছি। এখন এই জাহাজের সমস্ত আরোহীদিগের সমক্ষে আমার জীবনের গত বার বৎসরের বিস্ময়কর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিব।"

কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ের কথা।

(১)

আমরা ডেসডেমোনা জাহাজের আরোহী ছিলাম। ত্রিপোলি বন্দর ছাড়িবার পর কয়েক দিবস নির্দ্দিঘ্নে কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিকালে আকাশ মেঘ-শূন্য, চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া পৃথিবী যেন হাসিতেছে। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। রাত্রি প্রায় একপ্রহর। আরোহীদিগের মধ্যে কেহ বা মনের সুখে গান করিতেছেন, কেহ বা বাঁশী বাজাইতেছেন, কেহ কেহ বা তাস খেলিতেছেন, কেহ বা বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, রমানাথ ও আমি আমার পিতার কথা ভাবিতেছি। অব্যাহতগতিতে জাহাজ চলিতেছে। অকস্মাৎ জাহাজ যেন একটু দুলিল। আমরা সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনে হইল যে জাহাজ যেন আর চলিতেছে না। ব্যাপার কি জানিবার জন্য বাহির হইলাম। বোধ হইল আমাদের জাহাজখানি যেন ক্রমশঃ নীচে নামিতেছে। এমন সময় জাহাজের কাপ্তানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে ভীতির চিহ্ন। তিনি শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! একটী প্রকাণ্ড ডুবার-পর্ব্বতে লাগিয়া আমাদের জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। অল্প দূরে আর একখানি জাহাজ আছে। তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তা দ্বারা সেই জাহাজের আরোহীদিগকে আমাদের বিপদের কথা জানাইয়াছি। তাঁহারা উত্তরে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের জাহাজ আমাদের জাহাজের নিকটে আসিবার সাধ্য নাই। তাঁহারা আমাদের জাহাজের আরোহীদিগকে রক্ষার জন্য কয়েকটী বোট পাঠাইতেছেন। আমরা স্থির করিয়াছি বোটে করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে অগ্রে নামাইয়া দিব। কিন্তু সময় যেরূপ অল্প তাহাতে বেশী লোককে বাঁচাইতে পারা যাইবে না। আমাদের অধিকাংশেরই সমুদ্র-সমাধি হইবে।"

আমরা সকলে মিলিয়া তখন স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত এই কার্য্য চলিতে লাগিল। জাহাজের অন্যান্য আরোহীদিগের সহিত রমানাথ ও আমাকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইতে দেখিয়া একজন ইংরেজ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "বাঃ, ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা এবং সাহস আছে দেখিতেছি যে!" রমানাথ অমনি সেই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ঐ সকল গুণগুলি ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নহে।" সেই সময় একজন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন, "এখন আর বিষাদ বিসম্বাদ কেন? অতি অল্পক্ষণ পরেই আমরা তর্কবিতর্কের অতীতলোকে গমন করিব। এখন যত পারেন আর্ত্তদিগকে রক্ষা করুন, আর ভগবানের নাম করুন, আর তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করুন। এখন আর কাহারও সম্বন্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবেন না।" সন্ন্যাসীর এই কথাগুলি বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিলেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ ভদ্রলোকটী রমানাথের দিকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী, ঠিক কথা বলিয়াছেন। মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন।" রমানাথ সেই প্রসারিত কর গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আপনিও আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আমরা ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করি। চলুন, যতক্ষণ বাঁচি বিপন্নদিগের উদ্ধারের উপায় করি গিয়া।" তাহার পর আমরা সকলে যথাসাধ্য স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বোটে নামাইয়া দিতে লাগিলাম। স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল।

একজন ইংরেজ মহিলাকে বোটে নামাইয়া দিতে গেলে তিনি বলিলেন যে, "তাঁহার স্বামী তাঁর সঙ্গে বোটে না গেলে তিনি একাকিনী যাইবেন না।" তখন সেই মহিলার স্বামীকেও তাঁহার স্ত্রীর সহিত বোটে নামিয়া যাইতে বলা হইল। সেই ভদ্রলোকটি ক্রোড়পতি। তিনি আর সকল আরোহীদিগকে ফেলিয়া তাঁর নিজের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য বোটে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আধ ঘণ্টা ধরিয়া স্ত্রীলোক

বালকদিগকে বোটে নামাইয়া দেওয়া চলিল। আমাদের জাহাজ ক্রমশঃই ডুবিতে লাগিল। প্রথমে পাটাতন ডুবিল। তখন আরোহীরা জাহাজের উপর উঠিলেন। ক্রমে জাহাজের উপরেও জল উঠিল। আমরা তাহার উপর দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বকথিত সন্ন্যাসী মহাশয় গম্ভীরকণ্ঠে কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন, "আবীরাবির্ম্মএধি।" জাহাজে যত স্ত্রীলোক ও বালক ছিল তাহাদের সকলকে বোটে নামাইয়া দিবার সময় হইয়া উঠে নাই। সুতরাং জাহাজ যতই জলময় হইতে লাগিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের আর্ত্তনাদ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর গান করিতে লাগিলেন—

"ওহি দেশমে যানা,
যাহা চন্দ সুরয নাহি তাওয়ে,
যাহা নহি আপনা বেগানা।
ওহি দেশ যে যানা।"

জাহাজ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের গানের বিরাম নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরের মধুরকণ্ঠে গান, সেই গান শুনিতে শুনিতে আমি জলমগ্ন হইলাম। সমগ্র জাহাজ জলমগ্ন হইল। জাহাজের আরোহীরা সমুদ্রের জলে ভাসিতে লাগিলেন।

যাঁহারা সন্তরণপটু তাঁহারা সাঁতার দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বিস্তৃত সমুদ্র সাঁতরাইয়া পার হওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তথাপি প্রাণের মমতা কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমি প্রাণপণে সাঁতরাইতে লাগিলাম। ক্রমে হাত পা অবশ হইয়া আসিল, আর সাঁতার দিবার শক্তি রহিল না। তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীনতার যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও আমার শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলাম না। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতাম। প্রতিদিন ভগবানকে ডাকিতাম। কিন্তু সেই প্রতিদিনের বরাবাঁধা নিয়মে ভগবানকে ডাকার সহিত আজ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকার যে কত প্রভেদ তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে বুঝিবে? আজ তাঁহাকে যে আন্তরিকতার সহিত ডাকিলাম, আজ তাঁর চরণে যেরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলাম, তৎপূর্ব্বে তেমন করি নাই। আজ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম, তেমন আনন্দ ও ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। এইজন্যই কি ভক্ত তুলসী-দাস বলিয়াছিলেন যে, "দুঃখের মাথায় বাজ পড়ুক, দুঃখের বলিহারী যাই। এমন দুঃখ হউক যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে হরিনাম স্মরণ করাইয়া দেয়।" এইরূপ ভূমানন্দ অনুভব করিতে করিতে কখন চৈতন্য হারাইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

চাঁদ সুলতানা।

চাঁদ সুলতানা ভারতীয় রমণীকুলের শৌর্য্যবীর্য্যদের অন্যতমা। তিনি যেরূপ অলোকসামান্য সাহসিকতা, বীর্য্যবত্তা ও যে অতুল প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অবশেষে সুসজ্জিতা হইয়া রণরঙ্গিণী বেশে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া বিপুল বিক্রমে মোগলবাহিনীকে বারংবার যেরূপ শোচনীয়ভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন; তাদৃশ বীর্য্যবত্তা ও রণকৌশল ভারতীয় কোন মহিলাই প্রদর্শন করিতে তো সক্ষম হনই নাই, অনেক পুরুষের পক্ষেও তাহা দুর্লভ। তিনি রণরঙ্গিণী বেশে উন্মত্তসিংহীর ন্যায় নিজ হস্তে সার্দ্ধ চারি সহস্র মোগলের প্রাণ বিনাশ করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

চাঁদ সুলতানা বিজয়পুরাধিপতি আলী আদেল সাহের সহধর্ম্মিণী। আদেল সাহা একটী শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, বিজয়পুরের শাসনভার চাঁদ বিবি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া চাঁদ সুলতানা উপাধি ধারণ করেন। অতঃপর আহমদ নগরাধিপতি চাঁদ সুলতানার পিতা মোজাফর সাহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে আহমদ-

নগরের শাসনভারও চাঁদ সুলতানার হস্তে পতিত হয়। এই সময় দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর সাহ আহমদ-নগর অধিকার করিবার জন্য রাজা মানসিংহের সেনা পতিত্বে এক প্রচণ্ড বাহিনী প্রেরণ করেন। চাঁদ সুলতানা আকবর সাহের ভ্রূকুটিভঙ্গিতে ভীত না হইয়া আপনার সৈন্যদল একত্রিত করিয়া, তাহাদিগকে অগ্নিময় উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে প্রোৎসাহিত করতঃ স্বয়ং যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে মোগল বাহিনীকে এরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

অতঃপর আরও পাঁচবার মোগল সৈন্য আহমদ-নগর আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া যুদ্ধসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। নিরুপায় হইয়া সম্রাট আকবর চাঁদ বিবির সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিজয়পুর ও আহমদ-নগরের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। যত দিন চাঁদ সুলতানা জীবিত ছিলেন, ততদিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সম্রাট আকবর বিজয়পুর ও আহমদনগরের ত্রিসীমায় আর মোগলসেনা প্রেরণ করিতে সাহস করেন নাই। চাঁদ সুলতানা পারস্য ও আরব্য ভাষায় অসামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। "গোল চামন" নামক পারস্য ভাষায় রচিত তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক সম্প্রতি মুন্সী নেওলকিশোর তাহার প্রেসে মুদ্রিত করিয়াছেন। ডিমাই ৮ পেজি ৯ ফর্ম্মায় উহা সম্পূর্ণ। তন্মধ্যে অনেকগুলি কবিতা আছে। "চৌগান" (বর্ত্তমান "ক্রিকেট") ও "ঘোড়দৌড়" ইত্যাদি খেলার প্রশংসা ও বিষয়বস্তু এবং উপদেশ সম্বন্ধীয় কবিতাই উহাতে অধিক। উঁহাতে তরবারি চালনা, বেহালা ও সেতার সম্বন্ধেও কবিতা আছে। বেহালা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে কবিতা থাকায় নিশ্চয় অনুমান করা যায় যে, চাঁদ সুলতানা শুধু বীর রমণী ছিলেন না, সঙ্গীত বিদ্যাতেও মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন।

(১)

ঘিরেছে মোগল আ'মদ নগর,
হুহুঙ্কারে কাঁপে অবনী অম্বর,
গোলাগুলি ছুটে শমন কিঙ্কর,
ভীম গর্জ্জনে কাঁপে নরনারী।
স্বাধীনতা ধন করিতে হরণ,
দাসীনতা পাশে করিতে বন্ধন,
বিক্রান্ত মোগল আসে অগণন,
বীরমদে মত্ত, কৃপাণ ধরি॥

(২)

বিষম বিপদ করি দরশন,
স্বামীর গৌরব করিয়া চিন্তন,
দয়াময় নাম করিয়া স্মরণ,
সাজি বীরবেশে ধরিয়া অসি।
নানা অস্ত্রশস্ত্রে হইয়া সজ্জিতা,
শিরে শিরস্ত্রাণ কবচ ভূষিতা,
বিমুক্ত বেণীতে খঞ্জর ঝুলায়ে,
চলিলেন রাণী অশ্বপৃষ্ঠে বসি॥

(৩)

সাজি বীরজায়া মহাহব রঙ্গে,
বিক্রান্ত বিপুল রথীগণ সঙ্গে,
সিংহীর বিক্রম ধরি নিজ অঙ্গে,
ভৈরব হুঙ্কারে কাঁপায়ে ধরা।
আরক্ত নয়ন স্পন্দিত রসনা,
তুরঙ্গে মাতঙ্গে উন্মত্ত সেনানী,
পদাতিক সৈন্যে ছাইল মেদিনী,
করেতে কৃপাণ, সাহসে ভরা॥

(৪)

বীর্য্যবতী চাঁদ কহিলা গর্জ্জিয়া,
জলদ গম্ভীরে সৈন্যে সম্বোধিয়া,
বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া,
"শুনহে মম সৈনিক নিকর।
উন্মুক্ত কৃপাণ করহ ধারণ,
বীর পণে আজি কর সবে রণ,
মধুমাখা বড় স্বাধীনতা ধন,
রক্ষ তাহে করি সাহসে ভর॥

(৫)

. . . .

কিবা ক্ষিপ্ত হরি বিদ্ধ হলে শেলে,

প্রবেশে যেমন ভীরু অজ বলে,
সেইরূপে বধ বিপুল মোগলে।
হও অগ্রসর আজি ভীম বলে,
সাহস অনল হৃদয়েতে জ্বেলে.
"দিন—দিন—দিন" রণমেতে বলে,
হও কীর্ত্তিমান ধরণীতলে।

(৬)

দেবতাবাঞ্ছিত স্বাধীনতা ধন,
রক্ষিবারে তাহা কর প্রাণপণ,
শোণিত তর্পণে কর সবে রণ,
হৃদয়ে বিপুল সাহস ধর।
বজ্র করে ধর অসি খরধার,
মোগল বাহিনী কর ছারখার,
ভৈরব গর্জ্জনে ছাড় হুহুঙ্কার,
আশহ অরাতি নাশ বার বার,
বিজয় পতাকা উড্ডীন কর॥

(৭)

অবলা রমণী আদি কুলবালা,
অন্তর মহল করিয়ে উজালা,
পর্দ্দার ভিতরে থাকিব নিরালা,
এই ত বিধান সংসার মাঝে।
কিন্তু!
চিরকুটি যেই স্বাধীনতা ধন,
রক্ষিবারে তাহা প্রাণ করে পণ,
এসেছি আজিকে এ রণপ্রাঙ্গণ,
এসেছি রণরঙ্গিণী সাজে॥

(৮)

এ দৃশ্য দেখিয়ে ওহে রণীগণ,
হয় নাকি লজ্জা তোদের এখন,
বীরত্ব প্রতাপে কর দেখি রণ,
নারী বলে মোরে কর না হেলা।
এই কাঁপ দিনু রণসিন্ধু মাঝে,
ক্ষুদ্র নারী প্রাণ লেগে থাক কাজে,
ঐ যে স্বরগে জয়ডঙ্কা বাজে,
রণার্ণবে সবে পশ এই বেলা॥"

(৯)

বীরত্ব প্রতিভা দীপ্ত চাঁদ বিবি,
মহিমা মণ্ডিত জলন্ত ছবি,
জগৎ পিতার নাম হৃদে ভাবি,
লোহিত তুরঙ্গে আরোহি ত্বরা।
দশানন বল ধরি বাহু দণ্ডে,
পূর্ণ রণস্থল ঘুরি দণ্ডে দণ্ডে,
বধিছে অসংখ্য অরাতি পাষণ্ডে,
(যেন) মহিষ-মর্দ্দিনী পাগলপারা॥

(১০)

বীরগর্ব্বে অসি ধরি বীরাঙ্গনা,
আশুতোষ গিরি যেন অগ্নিকণা,
উগারিছে তাহে দগ্ধ দিগঙ্গনা,
ভীষণ নিনাদে সবে কম্পমান।
বিস্মিত মোগল হেরি বীরপনা!
ধাঁধাঁ লাগে দেখে অসির চালনা,
সাক্ষাৎ শমন নহে এ ললনা,
ভয়ে ভীত হয়ে নহে আগুয়ান॥

(১১)

বীরবালা চাঁদ ধরি প্রহরণ,
অগণন শত্রু করিছে নিধন,
অগ্নিময়ী মূর্ত্তি করিয়ে ধারণ,
অরাতিগণে করিছে হনন।
কভু অসি বর্শা বন্দুক কখন,
বজ্র করে চাঁদ করিয়ে ধারণ,
নাশে শত্রু করি ঘন গরজন,
ভয়ে শত্রুদল করে পলায়ন।

(১২)

"দাঁড়াও ফিরিয়ে, দাঁড়াও মোগল,!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়, কেনবা বিহ্বল,
ভয়ে ভীত কেন অস্বারোহীদল,
সে ডাকে হায়! কেহ না ফিরিলা।
প্রাণভয়ে ভীত পালা'ল মোগল,
আহমদ নগর আনন্দে বিহ্বল,
রাহুমুক্ত শশী জ্যোৎস্না বিমল,
নারীবীর্য্য ধন্য ভারত-মহিলা॥

শ্রীমতী কাশিমপুরী।

আমার স্বামী সম্বন্ধে স্মৃতি-কথা*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পবিত্র হইব ওই চরিত্র উচ্চারে,
ফুটে যাহা সুন্দর রূপের আধারে।
হীনবুদ্ধি আমি অতি, নাহি পুণ্যবল,
চরণ ধরিয়া, মুখ হেরিব কেবল।
গাইব ওবিয়া-ছন্দে শিষ্ট-অভিমত,
জীবন যাপিব তব ধ্যানে অবিরত।
তুকারাম ভণে, তব নাম নারায়ণ,
তোমাতেই করিবে সে মন সমর্পণ॥

তুকারাম

পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত ও আমার স্বামীর বাল্যকাল।

আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগের ("রাণাডে"দিগের) মূল-নিবাস,—রত্নগিরি জেলার অন্তর্ভুক্ত, "চিপলুন" তালুকে "গুহাগররাণজী মোতার পারেরী," ওর্কে "পাচেরিলডা"—এই স্থানে ছিল। উক্ত বংশের উত্তরাধিকারী হওয়ায়, এখনো পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের "খোতি" ভূমির উৎপন্ন আয়, আমার স্বামীই পাইয়া আসিতেছেন। সেখানকার ভগবন্ত রাও নামে এক ব্যক্তি (আমার স্বামীর পিতামহের পিতামহ) ঔরঙ্গজেব প্রদেশে এই গ্রামে—পণ্ঢরপুরের নিকটবর্ত্তী "কসরে-করকম্ব" হইতে এই গ্রামে আসিয়া রহিলেন। ইনি গৃহস্থ হইলেও, জ্যোতিষে বেশ পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে,—তিনি একদা নানা ফর্ণবিস সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। স্বীয় জননীর বহু সন্তানের মধ্যে একমাত্র ইনিই বাঁচিয়াছিলেন। ইনি যে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন সে কেবল ইঁহার মাতার (রুক্মাবাইর) বার বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক কঠোর ব্রতাচরণের ফলে। রুক্মাবাইর সন্তানাদি বাঁচিত না বলিয়া তিনি বার বৎসর ধরিয়া অশ্বত্থবৃক্ষ ও গাভী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন; এবং তিনি সেই সময়ে গোমূত্রে চাপাটি করিয়া আহার করিতেন; তিনি আর কিছুই আহার করিতেন না। তিনি ভক্তিমতী ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত যে কোন সময়েই তাঁর গৃহে আসুক না কেন, তিনি আগে উঠিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে, স্বয়ং পাক করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, এবং অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, "আমার পুত্র অশ্মিলে তাহার পুত্র-পৌত্রাদি যেন তোমার মত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয় এবং তোমারই ন্যায় তাহারা যেন বহুল বিস্তার লাভ করিয়া অনেককে ছায়াদান করে।" এই প্রার্থনানুসারে, দেবতারা ভাস্কর-রাও আপ্পাকে পূর্ণায়ু, ভাগ্যবান ও পরাক্রমী করিয়াছিলেন, এবং "এক হইতে একবিংশ" এই কথা অনুসারে, শাখা-প্রশাখায় বহু বিস্তৃত হইয়া, রাণাডে-বংশের সকল পুরুষই বুদ্ধিমান, শূর, পরাক্রমী, উদ্যোগী, দীর্ঘকায়, বলবান ও উদারচিত্ত হইয়াছেন। ইহা সেই মহাসাধ্বীর পুণ্যের ফল বলিতে হইবে।

আপ্পাজী ভগবন্ত—ইনি উপরি-উক্ত সাধ্বীর একমাত্র পুত্র ও আমার স্বামীর আপনার প্রপিতামহ ছিলেন। সাঙ্গলী-রাষ্ট্রের (সংস্থানের) অধিপতি প্রখ্যাত চিন্তামণ-রাও ওর্কে,—আপ্পাসাহেব পটবর্দ্ধন,—ইঁহার তিনি প্রধান "কারকুন" ছিলেন। পটবর্দ্ধনী সৈন্যের এক-ভাগের সেনাধ্যক্ষের পদও তিনি একই সময়ে পাইয়াছিলেন। তিনি একদা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া এক কেল্লা জয় করেন ও সেই সময় যে লুটের মাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে তিনি কিছুই স্পর্শ করেন নাই—এইরূপ কথিত আছে। কিন্তু নিজের যোগ্যতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আপ্পাসাহেবের নিকট ইংরেজ সরকারের তরফে ওয়কীল (প্রতিনিধি কার্য্য-

* স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার পত্নী শ্রীযুতী রমাবাই রাণাডে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে পরহিতৈষিণী যশস্বিনী হিন্দুমহিলাদিগের অগ্রণী। যাবজ্জীবন তাঁহার রচিত তাঁহার শ্বশ্রূসমক্ষীয় স্বামীর জীবনকথার বঙ্গানুবাদ ভারতমহিলায় প্রকাশ করিতে আমাদের অনেক দিন হইতে চেষ্টা ছিল। কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। সম্প্রতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জীবনকথার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন, আমরা তাহা হইতে সংকলন করিয়া এই জীবনকথা প্রকাশ আরম্ভ করিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন বিষয়েই তিনি ভীত হইতেন না. নিজ বুদ্ধিতে যাহা ভাল ও ঠিক মনে করিতেন, সেইরূপই তিনি নিজ প্রভুকে পরামর্শ দিতেন। সেই সম্বন্ধে প্রভুর কিঞ্চিৎ অসন্তোষ হইলেও তিনি ভয় করিতেন না। খাঁটি ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা, এই দুই গুণের জন্য পটবর্দ্ধন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। তিনি বংশপরম্পরাক্রমে যে চাকরাণ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সাঙ্গলী-রাষ্ট্রে আমাদের বংশেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীচিদম্বর স্বামী নামক এক ব্যক্তি, যিনি কর্ণাটক প্রদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের অপ্পার গুরু ছিলেন। অপ্পা আপনিই আপনার মরণকাল জানিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বেও তিনি বড় ঘোড়ার উপর দৃঢ়াসন হইয়া বসিতেন। তাঁর মন ও শরীরের অঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় ও সবল ছিল। ঈশ্বরারাধনা ও ঈশ্বর চিন্তাতেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এবং মুখেও তিনি নাম স্মরণ করিতেন। তাঁহার ৯০ বৎসর বয়সে, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে তিনি কৈলাসবাসী হইলেন। দেহাবসান হইবার পূর্ব্বে, তিনি স্বীয় পুত্রের নিকট আপনার মৃত্যুকাল বলিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে।

অপ্পার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অর্থাৎ আমার শ্বশুর আপনার পিতামহ, অমৃত রাও-তাত্যা, ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে প্রথমে, "করকব" হইতে নগর-জিলাতে চাকুরী করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শিরস্তাদার হইয়া পরে, মামলেদার পদে নিযুক্ত হন, এবং নগর জিলা হইতে পুণা-জিলায় আসেন। পুণাতে ও "অম্বেগাঁও"এ বহু বৎসর মামলেদারের কাজ করিবার পর, "পাবল" তালুকে তিনি বদলী হইলেন এবং সেইখানেই "পেনশন" লইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া "তাত্যার" চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ বলবন্ত-রাও-দাদা, মধ্যম গোবিন্দ-রাও-ভাউ, সেজ গোপাল-রাও-আনে ও চতুর্থ বিষ্ণুপন্ত-আন্না। এই চারি জনের মধ্যে গোবিন্দ-রাও ও বিষ্ণুপন্ত, "মিরাজ"র চাকুরী করিয়া, পরে ১৮৪১।৪২ অব্দে কোল্‌হাপুরে "অবাধ-মিশী"র কাজে নিযুক্ত হন, আর দুই জন তাত্যার নিকট "পাবলে"তেই রহিলেন। তাত্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের মতই দীর্ঘকায় ও বলবান ছিলেন। ইনি খুব ভাল ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। সংস্কৃত ও জ্যোতিষে তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি উহা ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বহু সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, তিনি স্বহস্তে কতকগুলি পুঁথির নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। "পুরুষ সূক্ত"এর উপর ইনি টীকা ও মরাঠীতে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং উহা ছাপাইবার জন্য আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। তাত্যা খুব ভাল কবিতা করিতে পারিতেন; তাহাড়া জ্যোতিষের গণনাও উত্তমরূপ করিতে পারিতেন, জন্মকোষ্ঠী দেখিতেন ও প্রস্তুত করিতেন।

আমাদের শ্বশুর মহাশয়ের কর্তৃত্বে অবস্থিতিকালে ১৮ই জানুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে আমার স্বামীর জন্ম হয়। সেই সময় তাত্যা জন্মের দিন ক্ষণ টুকিয়া রাখিয়া নিজ হস্তে আমার স্বামীর জন্মপত্রিকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাত্যা এই প্রকারে, যেমন পূর্ণ বয়সে তেমনি উত্তর বয়সে, আয়ুঃক্রম ক্ষয় উত্তম রাখিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬৮ অব্দে, কোল্‌হাপুরে আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া, জীবনযাত্রা শেষ করিলেন। শ্বশুর মহাশয় কোল্‌হাপুরে আসিবার পর কিয়দ্দিবস "অবাধ মিশী"র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে, সেইখানেই তিনি মামলেদার হন। ভূদরগড়, পাহড়া, গড়-হিঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন জিলায় মামলেদারি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কোল্‌হাপুরে বদলী হওয়ায়, ১৮৬২।৬৩ অব্দে খাস-কার্য্যাধ্যক্ষ-পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন।

১৮৪২ অব্দে তিনি "করবির"র একলা আসিয়াছিলেন, ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার ননদের ("দুর্গা আক্কা"র) জন্ম হইবার ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত, "নিফাড়ে" আমার দিদি-শাশুড়ীর নিকট ছিলেন। যখন আমার ননদের জন্ম হয় তখন আমার স্বামীর বয়স আড়াই বৎসর ছিল।

ভাত্যা তখন আষেগাঁয়ে দামলেদারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নিকট সপ্তাহ খানেক থাকিয়া, তাহার পর শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোল্হাপুরে যাইবার জন্য আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ আমার স্বামীকে ও আমার ননদকে লইয়া বয়েল-গাড়ীতে যাত্রা করিলেন। এই প্রবাসযাত্রাকালে আমার স্বামী ঈশ্বরকৃপায় একটা সঙ্কট হইতে রক্ষা পান। তাহার বিবরণ এই :—শাশুড়ী ঠাকরুণ "নিফাড়" হইতে প্রথম বাহির হইয়া আষেগাঁয়ে আসিবার সময় তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য আগত আষেগাঁ হইতে এক সিপাহি ও আমার স্বামীর দূর সম্পর্কের কাকা বিঠ্ঠল-বাবাজি-রাগাডে এই দুইজন সঙ্গে ছিলেন। বিঠ্ঠ কাকা ঘোড়ায় চড়িয়া গাড়ীর পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন। দিনের বেলাটা খুব গরম হওয়ায়, সন্ধ্যাকালে ঠাণ্ডার সময় গাড়ী ছুড়িয়া সমস্ত রাত চালান হইত। ঐ দিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ছিল। প্রায় রাত্রি দুইটার সময় গাড়ীর সকল লোকই (শাশুড়ী ঠাকরুণ ও দুই শিশু) গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। ছোট মেয়েটিকে কোলের কাছে নিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণ ঘুমাইতেছিলেন এবং আমার ননদের ও-পাশে আর একটা আলাদা বিছানায় আমার স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। সময়টা ঠাণ্ডা হওয়ায় ও রাত্রি ১১।১২টা অতীত হওয়ায়, যে সিপাহি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল সে এই সময় সামনের দিকে, গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল, তারপর, অল্পকালের মধ্যেই গাড়ীওয়ালা ও সিপাহী দুজনেই ঢুলিতে লাগিল। বয়েল দ্রুত চলিতেছিল এবং বিঠ্ঠ কাকা অনেক পিছনে ছিলেন। এই সময় একটা রাস্তার বাঁক আসিল। বয়েলটা সেখান হইতে গাড়ী সজোরে লইয়া বাহির হইয়া গেল। এই সময়ে আমার স্বামী ঘুমে লুটিয়া পড়িয়াছিলেন এবং একেবারে গাড়ীর কোণে আসিয়া পড়ায়, রাস্তার বাঁকে দেয়ালের কোণে জোরে ধাক্কা লাগিবার দরুন, বিছানা চাদর সমেত ছিটকাইয়া রাস্তার উপর পড়িলেন। শাশুড়ী ঠাকরুণ তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। কিন্তু গাড়ী যখন ছুটিয়া চলিতেছিল, তখন সিপাহী ও গাড়ীওয়ালা জাগিয়াছিল। তথাপি গাড়ীর দ্রুত গমনশব্দে, পিছনে কিছু পড়িয়া গিয়াছে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। এইরূপে গাড়ী দেড় মাইল আগে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে আধ ঘণ্টা পোয়া ঘণ্টার মধ্যে আমার স্বামী বিঠ্ঠ কাকার ঘোড়ার পায়ের টপটিপ শব্দ শুনিয়া 'বিঠ্ঠ কাকা' বলিয়া হাঁক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এইখানে আমি পড়িয়া গিয়াছি।' সেই হাঁক শুনিবামাত্র বিঠ্ঠ কাকা আমার স্বামীর গলার আওয়াজ চিনিতে পারিয়া, তখনি ঘোড়াকে খাড়া করাইলেন ও নীচে নামিয়া আমার স্বামীকে তুলিয়া কোলে লইলেন এবং উহার ছিন্নভিন্ন শরীর কাপড়ে জড়াইয়া কোলাপুরে ঘাঁটিয়া গিয়া ঘোড়ার উপর বসিলেন এবং শাশুড়ী ঠাকরুণের গাড়ীর নিকট আসিয়াই শাশুড়ী ঠাকরুণকে বলিলেন,—'গোপিকা-ভগিনী, কেমন আছ ত? ছেলেরা বিছানায় ঠিক আছে ত?' তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে, বলিয়া উঠিলেন,—'হাঁ, সব ঠিক আছে', এই কথা শুনিয়া বিঠ্ঠ কাকা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছ? দুইটি শিশুই তোমার কাছে আছে ত? ঠিক করে দেখ।' এই কথা বলিবামাত্রই তিনি ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং গাড়ীর ভিতর চারিদিকে হাতড়াইতে লাগিলেন। এবং যখন দেখিলেন, মেয়েটি আছে কিন্তু ছেলেটি নাই, তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন বিঠ্ঠ কাকা জড়ানো কাপড় হইতে আমার স্বামীকে বাহির করিয়া শাশুড়ী ঠাকরুণকে দিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—'আজ পরমেশ্বর খুব রক্ষা করেছেন।'

বিঠ্ঠ কাকার মুখে আমি এই গল্পটা শুনিয়াছি। এখনো পর্য্যন্ত এই গল্প করিবার সময় তাঁর চোখ জলে ভরিয়া আসে। এইরূপে আষেগাঁয়ে আসিবার পর, কিছু দিবস সেখানে থাকিয়া শাশুড়ী ঠাকরুণ দুই শিশুকে লইয়া কোল্হাপুরে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিলেন। আমার স্বামীর তিন বৎসর হইতে তের বৎসর পর্য্যন্ত শৈশবের অধিকাংশ কাল কোল্হাপুরেই কাটিয়াছিল। ৬।৭ বৎসর বয়সে, আমার স্বামীকে পাতোবা-ভাত্যা বিবকরের পাঠশালায় দেওয়া হয়। এই সময়কার, আমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র ও অভ্যা-

সাদির সমস্ত বিবরণ আমার খুড় শাশুড়ীর মুখের কথা হইতে দেওয়া যাইতেছে—তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলিও ঠিক রাখা হইয়াছে। কেননা তাহা হইলে আমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র তখন কিরূপ ছিল তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

খুড়শাশুড়ী একবার আমার স্বামীর ছোট বেলাকার এই গল্পটি করিয়াছিলেন :—

"আমি কোলুটোলার সরকারী কুঠিতে যখন ছিলাম, তখন "কীর্ত্তনে" উপর তলায় এবং আমরা নীচের তলায় থাকিতাম। দুই ঘরেই বহু পরিবার। আমাদের ঘরে বয়স্ক লোক বেশী, ছেলে পিলে কম ; এবং কীর্ত্তনের ঘরে ছেলেমেয়ে অনেক। সেইজন্য আমরা দুই ঘর লোক এত বড় বাড়ীতে থাকি ; কিন্তু বাড়ীটা বড়ই কোলাহলময়। দুই পরিবারের অন্তর্গত আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে এক পরিবারের মতই ছিলাম। আমার দেবর ও আঘা-সাহেব কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদাভেদ মোটেই ছিল না। ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যেই যে ঐরূপ ধারণা ছিল তাহা তাহাদের ব্যবহারেই দেখা যাইত। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কিছু একটা ঘটিলে, সকলেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হ'ত। দুই উনান জ্বালান হ'ত না। প্রত্যেক উৎসবে কে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করবে সেলে আমাদের ঝগড়া হ'ত কিন্তু পরে এইরূপ স্থির হ'ল, কুলধর্ম্ম স্থলে, উৎসবের অনুষ্ঠান পৃথক পৃথক হবে। বাকী উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি আধাআধি বণ্টন করে দুই পরিবারের মধ্যে পালা করে হবে। তদনুসারে আমরা উৎসব করে আসছিলেম। "কীর্ত্তনে"র ছেলে শৈশবকাল হইতে খুব চালাক চতুর ছিল। কিন্তু আমাদের এই ছেলেটি বড়ই ঠাণ্ডা ও ম্যাদা ছিল। সে কিছুই বুঝত না। তাকে দিয়ে কারো নিকট কোন কথা বলে পাঠালে সে ঠিক করে বলতে পারত না। স্কুলের পরীক্ষা হইয়া গেলে পর, অন্য ছেলেরা "আমরা পাস হয়েছি, আমাদের পণ্ডিতজি এই এই কথা বলেছিলেন" ইত্যাদি কত কথাই বাড়ী এসে বলত। কিন্তু এর সে সব কিছুই না। আপনা হইতে "আমি পাস হয়েছি" এ কথাটি পর্য্যন্ত বলত না। আমাদের ছেলেটি পাস হয়েছে—কীর্ত্তনের ছেলেদের মুখে শুনে, আমি জিজ্ঞাসা করলেম :—"ওরে মাধা (মাধব), তুই পাস হয়েছিস্ আমাদের কেন বলিস নি ? তোর এই বিষয়ে দেখছি কোন আগ্রহ নেই। ঐ "বিনায়ক"কে দেখ দিকিন। ও কেমন হাসিয়ার।"

তখন সে বলিল, "এর আবার বলবার কি আছে ? রোজ স্কুলে গিয়ে আমরা পড়া অভ্যাস করতুম, তাতেত পাস হবারই কথা, বেশী আর কি হয়েছে ?" এই কথা বলে সে নীরবে চলে গেল।

তবু মায়ের সর্ব্বদাই ভাবনা হ'ত,—'পরে এই মাধবের দশা না জানি কি হবে। ও ১০৲ টাকা রোজকার করে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে পারবে, এটুকু বুদ্ধিও কি ওর হবে ?'—এই রকম তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন। "ঐ দুর্গীকে দেখনা ?—মাধবের ঠিক উল্টো ; অতিশয় বাচাল, ও চালাক চতুর। দুর্গী এখনো সেই রকমই আছে। বাপ ও ভায়ের আদর পেয়ে আর ওকে বুদ্ধিমতী বলায় ও অত্যন্ত কঠোরভাষী হয়ে পড়েছে। আর, ও "অক্কাসাহেব" হওয়া অবধি, মাধবের চেয়ে আরও চালাক চতুর হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এই রকম আত্মভাষী হওয়ায়, যা' তা' বলে ও আপনার কথাই সাত কাহন মনে করে ; আর এই ছেলে দেখ-দিকি কেমন ভাল, কথায় বাধা, মৃদুমিষ্ট ও সরল। ঘোর প্যাঁচ কিছুই জানে না,—বুঝতেই পারে না। একবার কোন বিষয় আরম্ভ করলে, যতক্ষণ না শেষ হয়, সেটা নিয়মিত করতে থাকে, তার জন্য ওকে আবার বলতে হয় না। কিন্তু তাতে কোন বাধা দিলেই ও গোঁ ধরে কাঁদতে বসে যায়। শীঘ্র ওকে থামান যায় না। প্রথমে "ধূলো অক্ষরে"র পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়ায় পাঠশালা থেকে আসতে না আসতেই ঘরে সারাদিন আপনা-আপনি বিড়-বিড় করে অক্ষর আওড়াতো ও আঙ্গুল দিয়ে মেজের উপর অক্ষর লিখিত। এই ওর খেলা—এই ওর আমোদ ছিল। এমন একরোখা ছিল যে, যা করত একেবারে পাকা

হত। যখন পৈতে হল তখন ওর বয়স খুব কম এবং সকাল বেলায় মারাঠি পাঠশালার দেরীতে অর্থাৎ ১০টা বাজলে ছুটি হত। তখন খুব কিদে পেত বলে, মা চাপাটি করে রাখতেন ও ছেলে স্কুল থেকে এলে তার উপর ঘি ঢেলে তাকে দিতেন। একদিন কেবল ঘোল করে রেখেছিলেন। মাখন আগে দিয়ে ঘি করা হয়নি, তাই মা চাপাটির উপর মাখন দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলে আপনার জেদ ধরে বসল, "রোজ যেমন হয়, সেই রকম পাতলা ঘি ঢেলে দেও।" "মাখন থেকে ঘি করা হয়নি, কাল ঘি দেব"—এই রকম করে তিনি অনেক বল্লেন, কিন্তু তাতে কিছু হল না। তখন মা ঘিয়ের কড়ায়ে এক চামচ জল দিয়ে তাই উনানে গরম করলেন ও তাই চাপাটির উপর ঢেলে দিলেন। তাতে সে শান্ত হয়ে নীরবে চাপাটি খেতে লাগল। "দুর্গে" সেখানে কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সে এই ব্যাপার লক্ষ্য করায় খুব হেসে উঠল ও হাত তালি দিয়ে তাকে টিট্‌কারী করতে লাগল:—"দাদা, তোর মা, ঘি বলে তোকে জল দিয়েছে।" কিন্তু ছেলে ও-কথায় মোটেই লক্ষ্য করলে না। নীচের দিকে তাকিয়ে "চাপাটি" খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।"

প্রায় প্রতিদিন সকালে পাঠশালা হতে এসে ও চাপাটি খেয়ে দুর্গীর সঙ্গে "সাগর-গুটির" খেলা খেলত, পরে স্নান করত। যেই ওর মাথায় প্রথম ঘড়ার জল ঢালা হয়েছে অমনি ও "পুরুষ সূক্ত" বলতে আরম্ভ করত; এবং তার মধ্যে কেউ কথা বলায় সে যদি ভুলে যেত ত ভারি বিরক্ত হয়ে উঠত। একদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করবার সময় বিঠু কাকা এসে তাকে থামিয়ে সন্ধ্যার ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্নটার উত্তর দিয়েই সে এই জেদ ধরে বসল যে, "আমি গোড়ায় থেকে আর "সন্ধ্যা" করব না। যেখানে আমাকে থামিয়েছিলে সেই জায়গাটা আমাকে এনে দেও, তারপর আমি "সন্ধ্যা" পুরাপুরি করব।" অনেকক্ষণ এই রকম গোঁ ধরে বসে রইল। সন্ধ্যাও করবে না, উঠেও যাবে না। শেষে বিঠুকাকা অনেক সন্ধ্যা করে গল্লেন—"এইবার বাকীটুকু শেষ কর,—এইখানে তোকে আমি থামিয়েছিলুম।" এই রকম বলার পর, সমস্ত সন্ধ্যা শেষ করে উঠে গেল।

ছুটির দিন,—গলার হার অলঙ্কার বালা ও আংটি খুব আদর করে মা ছেলের গায়ে পরিয়ে দিলেন। তবু কণ্ঠিহার পরিয়ে দেওয়ায় সে হারটা ধুতির কাপড়ে ঢেকে রাখল, জামার আস্তিনটা সামনের দিকে টেনে বালাটা তার মধ্যে ঢেকে রাখল, আর হাত বাকিয়ে আংটির পাথরটা মুঠোর ভিতর রাখল। ও এই রকম নীরস প্রকৃতির লোক ছিল। আমি একবার রাগ করে' বলেছিলুম,—"দেখ মাধব, তোর মা এত যত্ন করে গহনা পরায়, তুই কেন পরাতে দিস্‌নি বল দিকি? আর তা পরিয়ে দিলেও তুই পাগলের মত ঢেকে রাখিস।" তখন ঐ বালক বল্লে কি শোন। আমাদের বাড়ী রোজ ভিখারী আসে, তাদের কোথায় গহনা থাকে?" এই রকম ওর প্রকৃতি ছিল। বেচারী মা ওর জন্য ভেবে ভেবেই মারা গেল। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কোথায়? কপালে দু-চারটে শুভ রেখা থাকাতেই দু-চার পয়সা যা হচ্ছে—তা বৈ আর কি?

কোল্‌হাপুরে অবস্থিতি কালে, আমাদের গৃহে ও "কীর্ত্তনে"দের গৃহে কোজাগর উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ ও মিত্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করে দুগ্ধ দান করবার রীতি ছিল। এবং সকল স্কুলের ছাত্রেরা সেই দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে পাশা খেলবার অনুমতি পেত। তদনুসারে দুই পরিবারের সকল ছেলেই একত্র হয়ে পাশা খেলত। মার মৃত্যুর প্রথম বৎসরে, মাধবের দশ বৎসর বয়স মাত্র ছিল। "কোজাগর" এল। তখন কীর্ত্তনের মণ্ডলী কোন কারণে "রাজুরী"তে গিয়েছিল। এই জন্য এই সময়ে কোন ছেলেই ঘরে ছিল না। দুর্গী ছিল, কিন্তু সে ৮।৯ টা বাজলেই শুতে যেত। তাই খেলবার কেউই ছিল না; তবু রাত্রে, আমার দেবরের আহার হয়ে গেলে, মাধব আমার নিকট পাশার ছক্ চাইলে। আমি বল্লেম, দুর্গী পর্য্যন্ত শুয়েছে; এখন তুই কার সঙ্গে পাশা খেলবি। সে বল্লে, মা

"আমি আমাদের কারো কী কারো সঙ্গে খেলব। তুই যে না।" আমি পাশার একটা ঘুঁটি নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিলুম। তা নিয়ে সে খানিকক্ষণ খেলা করে একটা ধানের বস্তার সম্মুখে বসে পাশা খেলতে লাগল। এক হাত নিজের ও এক হাত ধানের এই বলে' খেলা সুরু করে দিলে। দুজনের খেলাতেই ধানের খেলাই ভাল হতে লাগল। তাই আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম একজনেরই কেবল খারাপ হচ্ছে। কাঠের থাম পর্য্যন্ত তোকে হারিয়ে দিয়ে অপমান করছে? তখন বিরক্ত হয়ে সে বল্লে "তাতে কি? যা সত্যি তা সত্যি। ধানের দান পড়ার তার ঘুঁটি আগে উঠে গেছে; আমার পড়ে নি বলে' আমার ওঠে নি। ওতে অপমানটা কিসে হল? ও আপনার ডানহাত ধানের হাত বলে' ডান হাতে খেলছিল। ঐ হাতে খেলবার অভ্যাস থাকায় খেলা ভাল হচ্ছিল। কিন্তু যে হাতে খেলবার অভ্যাস না থাকায় ঠিক খেলা হচ্ছিল না। ওরকম করে' খেলা কি করে হবে? আর কোন ছেলে হলে ধানের কাছে হার মানত কি না কিন্তু ওর ছেলেবেলা থেকেই সরল স্বভাব। যে কোন কাজ করত তাতে প্রতারণা করতে জানত না। একবার মা বর্ফী দিয়েছিলেন; এবং ওর অন্য হাতে ছোট এক টুকরো দিয়ে বল্লেন—"এইটে তুই খা আর ওটা ঐ ছেলেকে দে।" মাধব ছোট টুকরোটা আপনার মুখে দিয়ে বড়টা চাকরাণীর ছেলেকে দিলে। ঐ ছেলের হাতে বড় টুকরোটা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরে ওকে ছোট টুকরোটা দেবার কথা ছিল, তুই ওকে বড়টা দিলি, আর তুই ছোটটা নিলি?" মাধব বল্লে—তুই এই হাতেরটা দে ওকে দিতে বলেছিলি। তাই ওটা দিয়েছি। তখন "ঐ হাতের টুকরোটা দে" বলায় নিজেরই ভুল হয়েছিল, মা জানতে পারলেন।'

আমার স্বামীর বয়স যখন ১১ বৎসর, সেই সময় আমার ননদের বয়স ৯ বৎসর মাত্র ছিল। এই বৎসরেই ননদের বিবাহ হয়। তাকে "আনন্দী" পড়িসের ঘরে দেওয়া হইয়াছিল। এক বৎসর পরেই আমার স্বামীর বয়স ১২ বৎসর পূর্ণ হইলে, ঠিক সেই সময়ে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ অষ্টম গর্ভের একটি সন্তান প্রসব করিয়া তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। তাহার পর, আমার স্বামীকে ও কীর্ত্তনের ছেলেকে কোল্হাপুরের ইংরাজী স্কুলে পাঠান হইল। সেই সময়ে রঙ্কাণী চাফাজী ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন।

প্রায় এই সময়েই আমার শ্বশুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বিবাহ হয় এবং আমার স্বামী ১৩ বৎসরে পড়িবামাত্রই "ওয়াই" প্রদেশের মেহরাপত্র দাণ্ডেকর নামক বৃহৎ পরিবারে এক সদ্বংশজাতা কন্যা সঁখু-বাঈর সহিত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমার স্বামীর বিবাহ হয়।

(ক্রমশঃ)

মুসলমান সমাজে অবরোধ।

যে-সমস্ত গুরুতর কারণ পরম্পরায় ভূমণ্ডলব্যাপী মহাপরাক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ সৌভাগ্যশালী মুসলমান জাতির আজ এই নিদারুণ ও দুঃসহ শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিয়া, অতি সংকীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখা,—তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতা হরণের ন্যায় পাপ-কার্য্য আর কিছুই নাই। যেরূপ পরাধীনতা মানুষকে নির্ব্বোধ এবং অন্ধ করিয়া রাখে, যে পরাধীনতা পরম করুণাময় খোদাওন্দতাআলা-প্রদত্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞান ও শিক্ষার অমৃতরসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, সেরূপ পরাধীনতা অপেক্ষা বৃহৎ পাতকের নাম। আততায়ী ব্যতীত কাহাকেও বধ করা যদি ভীষণ পাপ হয়, তাহা হইলে অকারণে নারীজাতিকে সর্ব্বসৌন্দর্য্য অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখা কিরূপ ভীষণ ও ভয়াবহ পাপ, তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে! যে স্নেহের ও যে প্রীতির লোক,—কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস এবং প্রীতির ও সাম্যমৈত্রীর অমৃত-প্রবাহ স্বরূপ—মাতৃজাতিকে অন্ধ-অন্তঃপুরে দুর্ভেদ্য যবনিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখা গৌরব ও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সত্যতা

এবং মনুষ্যত্ব হইতে তাহারা যে এখনও বহুদূরে পতিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এই বিষয়ে আমরা এমন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং কোরআন ও হাদিসজ্ঞ আলেমগণও এই অতি জঘন্য—অতি বীভৎস এবং জাতীয় জীবনের ভীষণ মহামারী-সূচক অবরোধ প্রথাকে শিথিল করিবার জন্য একটি বাক্য উচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠিত ও ভীত! এই অমানুষিক পাপপ্রথা কেমন করিয়া আমাদের সমাজ দেহকে পচাইয়া তুলিতেছে এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার পথে কিরূপ নিদারুণ কণ্টকারোপণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

আমাদের সমাজে এই মারাত্মক প্রথা আমার ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থলে ৭।৮ বৎসরের বালিকাদিগকে পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইতে দেওয়া হয় না। যে শিশু দেখিলে পাপাত্মার মনেও স্বর্গের নিরাবিল আনন্দ এবং প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়, হায়! তাহাদিগকে পর্য্যন্ত বাহিরের মুক্ত বায়ু হইতে বঞ্চিত করা হয়!

অবরোধ-প্রথায় যারা স্ত্রীলোকদিগের যে-সমস্ত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, আমরা ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে ক্ষতি।

বিশুদ্ধ বায়ু জীবন ধারণের পক্ষে যেরূপ হিতকর ও স্বাস্থ্যজনক, এরূপ আর কিছুই নহে। আমাদের মহিলাবৃন্দ এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য কখনও সুবিধা পান কি? তাঁহারা যদি কখনও পাল্কী বা যানে কোনও স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তাহার উপর এমন করিয়া পর্দ্দা আঁটিয়া দেওয়া হয় যে, বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না! এই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং ভ্রমণ-জনিত শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালনের অভাবে, আমাদের মহিলারা দিন দিন দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিতেছেন! দুই একটি সন্তান প্রসবের পরেই তাঁহারা রুগ্না এবং বৃদ্ধা হইয়া পড়েন! আর এইরূপ দুর্ব্বল ও শক্তিহীনা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণের দরুণ সমাজে দুর্ব্বল কাণাঙ্গ হীন-মাদর্শ কাপুরুষ ও শ্রীহীন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে!

দরিদ্রতা, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য, পুষ্টিহীনতা, নির্ম্মল আমোদপ্রমোদের অভাব, ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাব ও সাময়িক-পরিচর্য্যা-হীনতা এবং চিত্তের কুটিলতার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যনাশ এবং পরমায়ু হ্রাস হইতেছে; তাঁহার উপর মাতৃজাতি পুরুষাপেক্ষা অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানগণ আরও স্বাস্থ্যহীন এবং দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। শারীরিক সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবন লাভ ব্যতীত কোনও জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

শিক্ষা-সম্বন্ধে ক্ষতি।

অধুনা বাংলাদেশের নানাস্থানে কয়েকটত নিম্ন-শিক্ষার বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি করিয়া মাইনর স্কুলও এক একটি জেলায় স্থাপিত হয় নাই। আমাদের গোঁড়া ও মূর্খদলের লোকেরা ত এখনও মেয়েদিগের লেখাপড়া শিক্ষার নামে ভয়ে কম্পিত। ইহারা ৭।৮ বর্ষ বয়স্ক মেয়েদিগকেও ঘরের বাহিরে যাইতে দিতে নারাজ। ইহারা এমনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, ৭।৮ বৎসরের শিশুদিগের প্রতি কিম্বা তাহাদের দর্শকদিগের প্রতি অতি জঘন্যভাব পোষণ করে। যাঁহারা কন্যাদিগকে নিম্ন পাঠশালায় প্রেরণ করেন, তাঁহারাও এমন অদূর-দর্শী যে, মেয়েরা ভালরূপে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা না করিতেই যেই ৮।৯ বৎসর বয়স হয়, অমনি পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করেন। এজন্য আমাদের সমাজে কন্যা-দিগের উচ্চ শিক্ষার পথ একেবারেই রুদ্ধ।

অভিজ্ঞতার ক্ষতি।

বাহিরে না গেলে, মানুষের অভিজ্ঞতা কি বৃদ্ধি পাইবে? প্রকৃতির মধ্যাগ্রন্থ যে পাঠ করে নাই, প্রকৃতির ভিতরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে দর্শন করে নাই, প্রকৃতির মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার কারিগিরির মহিমা ও কুদরত দেখিল না, বুঝিল না, সে যে কিরূপে খোদাভক্ত ও খোদাপ্রেমিক হইতে পারে তাহা বুদ্ধির অগম্য! খোদাকে দেখা, খোদাকে জানা, ইহার

অর্থই হইতেছে, তাঁহার বিশাল সৃষ্টির বৈচিত্র্য নৈপুণ্য, ধেকমত, নিয়ম ও কার্য্য পরিদর্শন এবং উপলব্ধি করা। এইজন্যই মহাপয়গম্বর বলিয়াছেন যে, "এক মুহূর্ত্তের বিজ্ঞানচিন্তা, ষাট হাজার বৎসরের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "অজ্ঞ পণ্ডিতের নিদ্রা, মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ফলতঃ পৃথিবীতে মূর্খতা অপেক্ষা পাপ নাই এবং জ্ঞান অপেক্ষা পুণ্য নাই।" এই জ্ঞান আমরা এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎ হইতেই লাভ করি। আমরা এই জগৎ-সংসারের প্রাকৃতিক এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য হইতে, বৈচিত্র্য হইতে, কার্য্য হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বদা গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; ইহার ফলে তাঁহারা যার-পরনাই অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত আলোক এবং বায়ুবিহীন অন্ধকার গৃহের ন্যায়ই সঙ্কীর্ণ এবং ভয়াবহ! হায়! যে জাতির নারীগণ এইরূপ শিক্ষাহীন স্বাধীনতাহীন মূর্খ এবং অনভিজ্ঞ সে জাতির দুরবস্থার নিবারণ করে কাহার সাধ্য? এই নিদারুণ অনিষ্টকর পাপ অবরোধপ্রথা দূর না করিলে উচ্চশিক্ষার কোনও আশা ভরসা নাই। আর উচ্চশিক্ষা না হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং জ্ঞানের বিকাশ কিছুই হয় না। যেখানে জ্ঞান নাই—সেখানে ধর্ম্ম নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে গমনাগমনের—বিশেষতঃ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মক্তবে এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের অনুকূল স্থানগুলিতে যাইবার জন্য তাহাদিগকে স্বাধীনতা না দিতেছি এবং প্রবৃত্ত না করিতেছি, ততদিন আমাদের আর কল্যাণ নাই। যে জাতির নারীগণ স্বাস্থ্য হইতে, জ্ঞান হইতে, অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিতা, সে জাতির সন্তানগণ যে পৃথিবীতে অতি নগণ্য অপদার্থ এবং অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পৃথিবীর কোনও মুসলমান দেশে কোনও কালে এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল না এবং এখনও নাই।

এস্‌লাম স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের বিরোধী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকেরা কার্য্যের জন্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজনের জন্য হাত পা এবং মুখ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ ঢাকিয়া সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পারেন। ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবের স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। আমাদের দেশের হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাহারা 'বে-আব্রু' অবস্থায় বাহির হইত। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দঃ) এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। তিনি মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে যাইবার সময় একখানি চাদরের দ্বারা শরীর উত্তমরূপে ঢাকিয়া যাইতে আদেশ করেন। ইহারই নাম পর্দ্দা। কালে এই পর্দ্দা হইতে আব্বাস-বংশীয় খলিফাদের সময় স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাইবার জন্য বোর্কার সৃষ্টি হয়। (আল্-এসলাম.)

সিরাজী।

মহত্ত্ব।

নিবিড় আঁধার পরার নয়ন
ঢাকিয়া নীরবে কোঁটে,
রুদ্ধ তাহার আঁখি খুলে দিয়া
আলোক আসিয়া উঠে।
নিবিড় নীরব আঁধার হাসিয়া
বাড়ায় গুরুত্ব তার,
আলোক হাসিয়া বাড়ায় তাহার
উজল কৌমুদী ভার।

শ্রীবিভাবতী সেন।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch ——and I will be heard." (WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহাসমরে ভারত-নারীর সাহায্য।

বর্ত্তমান কালসমর আরম্ভ হইয়াছে পর ভারতবাসী, নানাপ্রকারে,—ধনপ্রাণ দিয়া আমাদের সম্রাট ও সাম্রাজ্যের সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ভারত-নারীও স্বতন্ত্রভাবে সাধ্যমত দানে পরাঙ্মুখ হয় নাই। বঙ্গদেশে, যে সকল বাঙ্গালী যুবক সৈন্যদলে প্রবেশ করিতেছে শ্রীযুক্তা সরলা রায় ও শ্রীমতী বেলা হালদারের নেতৃত্বে কলিকাতা মহিলাসমিতি তাহাদের প্রত্যেককে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষপূর্ণ একটী ব্যাগ উপহার দিতেছেন। ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে। নারীদের এই যে উৎসাহ ও সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মূল্য অর্থসাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক।

ভারতবর্ষে যে সমরঋণ সংগ্রহ হইতেছে, নারীগণ স্বতন্ত্র ভাবে তাহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গদেশে এজন্য ইউরোপীয় ও ভারতীয় মহিলাগণের একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের মহিলাগণও অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধনিরত সৈন্যগণের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেছেন। গত ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রায় দশ লক্ষ টাকা সৈন্যদিগের সুখসুবিধার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণরপত্নী বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ের মহিলাগণ যুদ্ধে যেরূপ সাহায্য করিতেছেন তাহা ইংলণ্ডের মহিলাগণের সাহায্য অপেক্ষা হীন নহে।

যুদ্ধের ফল।

যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য তখন, যুদ্ধে সাহায্য করা সকলেরই উচিত। কিন্তু এই যুদ্ধ যে কেত অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় মন ততই অবসন্ন হইয়া পড়ে। মন ব্যাকুল হইয়া শুধু বলে, ভগবান শান্তি আনয়ন কর। যুদ্ধের কুফল সম্বন্ধে আমরা আমেরিকার সুবিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য চ্যানিং এর রচনা অবলম্বনে নিম্নে কিছু আলোচনা করিব।

যুদ্ধের উপকারিতা।

যুদ্ধ কখনো কখনো কিছু উপকারও করে। সংসারে অবিমিশ্র মন্দ কিছুই নাই। গুরুতর দুঃখ কষ্ট, দুষ্কর্ম্ম হইতেও ভগবান কিছু না কিছু সুফল উৎপন্ন করেন। নরহত্যা কত সময় অতি পাপিষ্ঠ মানব-শত্রুর জীবন নাশ করিয়া তাহার পাপের স্রোত বন্ধ করে। ডাকাতির দ্বারা কত সময় কৃপণের অব্যবহার্য্য সঞ্চিত ধন লোকের কাজে লাগিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কি নরহত্যা ও ডাকাতির প্রশংসা করিতে হইবে? অসভ্য যুগে যুদ্ধ দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে। তখন জোর জবরদস্তি, মারামারি, কাটাকাটি নিত্য ঘটনা ছিল। যুদ্ধ দ্বারা একজন বলবান লোক বহু জাতিকে আয়ত্তাধীন করিয়া সমাজ গঠন ও রাজ্যগঠনের সূত্রপাত করিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে সভ্যজাতি সমূহ অসভ্যজাতিগুলিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে।

পাপের বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া মানুষের অন্তর যেমন পাপের প্রতি বিতৃষ্ণ হয় এবং পুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় যুদ্ধের দ্বারাও সেইরূপ অনেক সময় আক্রান্ত জাতির অন্তরে দেশহিতৈষিতা, অলৌকিক শৌর্য্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণাবলির বিকাশ হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে বেলজিয়মের অধিবাসীগণ যে বীরত্ব, স্বদেশহিতৈষণা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ দেখাইয়াছে, যুদ্ধ না হইলে তাহার এতটা বিকাশ হইত কি না সন্দেহ।

যুদ্ধের বাহ্যিক কুফল।

কিন্তু এগুলি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সুফল মাত্র। যুদ্ধের প্রকৃত ফল পাপ, অপরাধ ও দুঃখ। ন্যায্য অধিকারের উপর শারীরিক বলের প্রাধান্য স্থাপনই ইহার আসল প্রকৃতি। বেলজিয়ম, সার্বিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের মাতৃভূমির অধিকার হইতে, যে পার্জ্জিত ধনসম্পত্তি, গৃহের সুখ-শান্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহার আসল প্রকৃতি প্রকাশ করিয়াছে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, সভ্যতা যুদ্ধ দ্বারা পদে পদে বিনষ্ট হইতেছে। যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যগণ কত প্রকার শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। হস্তপদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, বিষাক্ত ক্ষতদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীষণ দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্তু এসকল শারীরিক ক্লেশ ও বাহ্যিক অনিষ্ট অপেক্ষা যুদ্ধের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনিষ্টই গুরুতর।

যুদ্ধের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুফল।

দুর্ভিক্ষ মহামারী দ্বারা যত লোকের মৃত্যু হয় যুদ্ধ দ্বারা তত হয় না। ভূমিকম্প দ্বারা যত নগর মহা-নগর, প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস হয় যুদ্ধ দ্বারা ততটা হয় না। অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন দ্বারা যত শস্যক্ষেত্র বিনিষ্ট হয় সৈন্যদলের পদপীড়নে তাহা হয় না। মানুষের মৃত্যু যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ফল নহে,—যে উপায়ে এই মৃত্যু হয় তাহাই যুদ্ধের ভীষণতম ফল। শুধু মানুষের মৃত্যুই যদি যুদ্ধের ফল হইত তাহাতে তত আশঙ্কার বিষয় ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ যে মানুষকে পশুতে পরিণত করে ইহাই যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর কুফল। মানুষ মানুষের ভাই হইবার জন্যই জন্মিয়াছে, যুদ্ধ সেই মানুষকেই পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করে। মানব-ভ্রাতার দুঃখ কষ্ট মোচনই মানুষের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, কিন্তু যুদ্ধে মানুষ মানুষের দুঃখ সৃষ্টি করে; দুঃখ বৃদ্ধির নূতন নূতন উপায় আবিষ্কারে দেহ মন নিয়োজিত করে। প্রকৃতির অত্যাচারে মানুষ যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তাহার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার চেষ্টাই

মানুষের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া সেই সকল শক্তিকে মানুষের জীবন বিনাশে কিরূপে নিযুক্ত করা যায় যুদ্ধকালে মানুষ তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন হয়। মানবপ্রকৃতির কি ভীষণ পরিবর্ত্তন, কি অস্বাভাবিক ব্যাপার! মানুষের হৃদয়ই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের সামগ্রী, কিন্তু যুদ্ধে মানব-হৃদয়ের কি শোচনীয় অধঃপতন হয়। মানুষ বাহির লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বাহিরের ইষ্টানিষ্টই তাহার দৃষ্টিতে বেশী পড়ে, ফ্রান্সের রীমস নগরের ইতিহাস-বিখ্যাত মনোরম গির্জ্জাটী ভারমানগণ গোলার আঘাতে ধ্বংস করিয়াছে, বেলজিয়ামের সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র অ্যান্টোয়ার্প নগর তাহারা ভস্মসাৎ করিয়া তাহার বিশেষত্ব নষ্ট করিয়াছে—এই সকল বিষয় জনসাধারণের মর্ম্মকে কতই না পীড়িত করে, কিন্তু এই যুদ্ধে পৃথিবীর যে নৈতিক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহার তুলনায় এই সকল ক্ষতি ত নগণ্য। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক।

মনে করুন, সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য যে, সাম্রাজ্য-সভা (Imperial Conference) হইয়া গেল, সেইরূপ একটী মহাসভার অধিবেশন পৃথিবীর কোন স্থানে হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মঙ্গলের উপায় নির্দ্ধারণ সেই সভার উদ্দেশ্য। সহস্র সহস্র লোক সেই সভার প্রতিনিধিরূপে একত্র সম্মিলিত হইয়াছেন। হঠাৎ কোন দৈব কারণে—যেমন ভূমিকম্পে—সম্মিলিত সেই সহস্র সহস্র প্রতিনিধি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সমস্ত সভ্যজগত এই শোচনীয় ঘটনায় স্তম্ভিত হইবে, কিন্তু পৃথিবীর কল্যাণচিন্তায় মিলিত এই সকল সজ্জনের মৃত্যুতে আমাদের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাবের উদ্রেক হইবে, আমরা হয়ত সেই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিব। এখানে যেমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, যুদ্ধস্থলেও তাহাই হয়। কিন্তু দুই স্থলে মিলনের উদ্দেশ্যের কি গুরুতর পার্থক্য! এক ক্ষেত্রে সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় পৃথিবীর হিতচিন্তা করিতে করিতে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মরে ভ্রাতাকে হত্যা করিতে করিতে, হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ প্রাণে পোষণ করিবার মুহূর্ত্তে।

আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মনে করুন, আপনি কোন নির্জ্জন দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া দূরে এক স্থানে একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেই নির্জ্জন দেশে লোকালয়ের চিহ্ন দেখিয়া আপনি আগ্রহে তাহার দিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনি কি দেখিলেন?—দেখিলেন সেই গৃহে এক সুবৃহৎ পরিবারের বাস ছিল, কিন্তু হঠাৎ কোন দারুণ মহামারির আক্রমণে বাড়ীর লোক সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদের মৃতদেহে গৃহ পূর্ণ। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আপনার মন প্রথমে ভয় ও বীভৎস ভাবে পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু সেই দৃশ্যের মধ্যেও আপনি সেই পরিবারস্থ ব্যক্তিদের পরস্পরের প্রতি প্রেমের সুন্দর প্রকাশ দেখিতে পান। সেই ভীষণ দৃশ্যের মধ্যেও আপনি হয়ত দেখিবেন, মৃত্যুর গ্রাসেও ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, সকলে পরস্পরকে ভাল বাসিতে বাসিতে পরস্পরের পাশেই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মাতা হয়ত সন্তানের গলা জড়াইয়া রহিয়াছেন, সন্তান মায়ের গলা জড়াইয়া রহিয়াছে। অনেকের মুখেই হয়ত অন্তিম প্রার্থনার চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশিত।

মৃত্যু-যন্ত্রনার মধ্যেও গৃহবাসীগণ এইরূপ প্রেম-ভালবাসা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছে যখন আপনি বুঝিতে পারেন, তখন প্রথম দৃষ্টিতে আপনার মনে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল তাহা দূর হয়, অন্তরে শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তি ভাবের উদয় হয়। মনে হয়, "কি সুন্দর পরিবার! মৃত্যুও তোমাদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।" বিষাদ, ভক্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ অন্তর লইয়া আপনি সে স্থান হইতে বাহির হইয়া দূরে যেন আর একখানি গৃহ দেখিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে সেখানে অগ্রসর হইতে হইতে মনে করিলেন, হয়ত আর একটি এইরূপ দৃশ্যই দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কি দেখিলেন? এখানেও মৃত্যুরই লীলা। কিন্তু এস্থানে লোকগুলি পরস্পরের সহিত

কলহ করিয়া সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সকল শবের মুখই ক্রোধে বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটা সাংঘাতিক অস্ত্র, মৃতদের কাহারো হাত কাটা, কাহারো পা কাটা, কাহারো মস্তক বিচ্ছিন্ন, কাহারো বুকে মারাত্মক অস্ত্র বিদ্ধ রহিয়াছে। এখানে পরস্পরকে বিনাশ করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে পরস্পরকে জড়াইয়া মরিয়া রহিয়াছে—এ আলিঙ্গন প্রেমের আলিঙ্গন নয়। নারী এখানে মরিয়াছে সম্মান হারাইয়া, শিশু মরিয়াছে রক্তে স্নাত হইয়া। তখন কি মনে হয় না, কি নরকের দৃশ্য! কি শয়তানের লীলা! দুইটী দৃশ্যের মধ্যে কি বিষম পার্থক্য!

মৃত্যু ভয়ানক হইলেও বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধানে যখন মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তখন মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও একটা মিষ্টতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যু শুধু অস্বাভাবিক নয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অন্তরের হীনতম বৃত্তিগুলি এই মৃত্যুতে আত্মপ্রকাশ করে। রোগে মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে প্রেম সহানুভূতি, ধর্ম্মের মধুরতা, আর যুদ্ধে মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে ক্রোধ হিংসা, পরস্বাপহরণ, অধর্ম্ম লালসা। মৃত্যু এস্থলে শান্তি আনয়ন করে না, প্রতিশোধ পিপাসা পশ্চাতে রাখিয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যুদ্ধে বাহিরের অনিষ্ট অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনিষ্টই বেশী করে। আমরা বাহির লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, বাহিরের লাভ লোকসানই বেশী দেখি, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। মানুষকে ভালবাসিবার জন্য মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু যুদ্ধে মানুষ মানুষকে কসাই অপেক্ষাও নৃশংসতার সহিত বধ করে। মানবের সুন্দর প্রেমপূর্ণ গৃহরূপে ভগবান এই পৃথিবী গড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই সন্তানগণ ভ্রাতৃরক্তে তাঁহার এই সুন্দর গৃহকে কলুষিত করিতেছে। হায়, কবে মানুষ যুদ্ধের এই ভীষণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে!

পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ-বিপ্লব।

সম্প্রতি মিঃ কার্পেন নামক এক ব্যক্তি বিবাহ-বিপ্লব (Marriage Revolt) নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অতি বিস্তৃত ভাবে ইহাতে বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবিধ কথার আলোচনা করিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক বলেন, বিবাহ অচ্ছেদ্য ধর্ম্ম-বন্ধন। পার্থিব কোন আইন আদালত বা সমাজের শক্তি নাই যে এই বন্ধন ছেদন করিয়া দিতে পারে। আজকাল নব্যতন্ত্রের একদল লোক দেখা দিয়াছে, তাহারা বলে, বিবাহ দুইজন নরনারীর মধ্যে একটা চুক্তিমাত্র। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে, এমন কি এক পক্ষের ইচ্ছা হইলেই, এই সম্বন্ধ ছিন্ন করা যাইতে পারে। এই দুই চরম পন্থার মাঝামাঝি আর কোন একটা মধ্যপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এই মতই আজকাল বিস্তার লাভ করিতেছে। মতটী এই যে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, উন্মাদ, গুরুতর অপরাধে শাস্তিভোগ, একে অন্যকে পরিত্যাগ প্রভৃতি গুরুতর কারণে দেশের আইন বিবাহ বন্ধন ছেদন করিয়া দিতে পারে। বিবাহ-বন্ধন ছেদনের উপযুক্ত কারণাবলি সকল দেশে সমান নয়। ইংলণ্ডে এই বিষয়ের আইন বড় কড়া এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তাহা বড় কঠোর। স্ত্রী যদি অবিশ্বাসিনী হয় তবে স্বামী তাহা প্রমাণ করিতে পারিলেই ইংলণ্ডের আইন ডাইভোর্স বা বিবাহ-বন্ধন ছেদনে অনুমতি দেয়, কিন্তু স্ত্রীর বেলা শুধু স্বামীর চরিত্রহীনতা প্রমাণ করিলেই হয় না। চরিত্রহীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করে তাহা যদি স্ত্রী প্রমাণ করিতে পারে তবেই সে বিবাহ ভঙ্গের অনুমতি পায়। তা ছাড়া ইংলণ্ডে ডাইভোর্স মোকদ্দমার খরচ এত বেশী যে ধনী ব্যক্তি ছাড়া এই জাতীয় মোকদ্দমা সাধারণ লোকে বড় করে না। আয়র্লণ্ডও কানাডা দেশে বিবাহভঙ্গের মোকদ্দমা আরোও কঠিন। সুইডেন দেশে বিবাহভঙ্গের মোকদ্দমা বেশ সহজ। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া যদি বলে আমরা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে চাই তবে সহজেই বিচারক বিবাহ ভঙ্গের অনুমতি দেন। অথবা এক পক্ষ যদি প্রমাণ করিতে পারে, যে অপর পক্ষ এক বৎসর কাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা ঘোর

মদ্যপায়ী, কিংবা নিতান্ত অমিতব্যয়ী, অথবা নিতান্ত ক্রোধস্বভাব ইত্যাদি,—তবে বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। নরওয়ে এবং সুইডেনেও এই অবস্থা। সুতরাং এই সকল দেশে ডাইভোর্সের সংখ্যা খুব বেশী। পক্ষান্তরে এ সকল দেশে নরনারীর নৈতিক চরিত্র খুবই উন্নত। ডাইভোর্সের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে এই সকল দেশে পানদোষ, অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাইতেছে।

মিঃ কার্সন স্পেন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, স্পেন দেশে পৌরহিত্য-প্রাধান্য বেশী, বিবাহ সম্বন্ধে প্রাচীন মতই সেখানে প্রচলিত, সুতরাং বিবাহ-ভঙ্গও খুব কম হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে দাম্পত্য জীবন যে খুব উচ্চ শ্রেণীর তাহা বলা যায় না। বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে যে স্থলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করিতে পারে না, সেখানে বিবাহভঙ্গ করিয়া তাহারা মনোমত পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহিত হইলে তাহার ফল ভাল হয়। যারা বাধ্য দাম্পত্য জীবন অপেক্ষা এই শ্রেণীর বিবাহ শুধু যে সুখের হয় তাহা নহে, এই শ্রেণীর বিবাহকারীদিগের যে দাম্পত্য জীবন তাহা আদর্শ দাম্পত্য জীবনে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা পবিত্র প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ক্রমেই ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। মিঃ কার্সন বলেন, ডাইভোর্স বা বিবাহভঙ্গ একটা সমাজিক ব্যাধি নহে, ব্যাধির ঔষধ। তিনি বলেন, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে, যে অসুখী দম্পতি চির অশান্তির বোঝা হৃদয়ে লইয়া আর তাহা নীরবে বহিতে চাহিতেছে না। এইরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা দিন দিন সর্ব্বত্রই বাড়িতেছে। বিবাহ না হইলে পূর্ব্বে মেয়েদের ত সুখে যাইবার পরিবারই উপায় ছিল না, এখন অনেক মেয়ে নিজেরাই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। পুরুষদেরও গৃহকর্ত্রী একজন না হইলে আহার-বিহারের অসুবিধা বড় হয় না, কারণ সভ্যদেশগুলিতে সুখস্বচ্ছন্দে আহার-বিহারের জন্য পরিপাটী ভোজনাগার সকল রহিয়াছে। নারীগণ এখন পূর্ব্বের ন্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয় না, সুতরাং স্বামীকে স্ত্রীর উপর যথেচ্ছ অধিকার দিতে এখন তাহারা আর প্রস্তুত নয়। আমেরিকায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কুড়ি লক্ষ বেশী। সুতরাং সেখানে প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই শুধু বিবাহের নয় একবার বিবাহভঙ্গের পর পুনর্ব্বিবাহেরও সুবিধা রহিয়াছে। সেখানে প্রতি বারটী বিবাহের মধ্যে একটী বিবাহ ভঙ্গ হয়। আমেরিকার পরেই ফ্রান্স দেশে ডাইভোর্সের সংখ্যা বেশী। ইংলণ্ডে ডাইভোর্সের মোকদ্দমার খরচপত্র কমাইবার কথা হইতেছে, এবং স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে।

মিঃ কার্সন বলিতেছেন, জাতির মঙ্গলের জন্য বিবাহ-ভঙ্গ ব্যাপারটী সহজসাধ্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ যেখানে প্রেমহীন দাম্পত্য জীবন সেখানে সন্তান-সন্ততি ভাল হওয়া সম্ভব নহে।

এই সমস্তই পাশ্চাত্য দেশের কথা। আমাদের দেশেও মুসলমান সমাজে তালাক বা ডাইভোর্স প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা বোধ হয় নগণ্য। বিবাহভঙ্গ ব্যাপারটা আমাদের নিকট নিতান্তই অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু যে সকল বিবাহ, বিবাহ নামের যোগ্য নয় এমন বিবাহ এদেশে অসংখ্যই হইতেছে। এই সকল বিবাহ ভঙ্গ করিবার কোন ব্যবস্থা থাকিলে বোধ হয় ভাল হইত।

ভারত-নারীর প্রতি ভারতের যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

মাদ্রাজের যুবকবৃন্দের নিকট মাদ্রাজ মহিলা-কলেজের অধ্যক্ষ কুমারী ডি লা হে নারীদিগের প্রতি যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনারেবল দেওয়ান বাহাদুর রাজগোপাল আচারিয়ার সি, আই, ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমারী হে বলেন :—

আমি বেশী দিন এদেশে বাস করি নাই। এদেশের গার্হস্থ্যজীবন সম্বন্ধে আমি যখন সকল কথা জানি না,

তখন এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা শোভন হইবে না মনে করিয়া আমি আমার ছাত্রীদিগকে এ বিষয়ে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করি। সুতরাং আমি তাহাদের মুখপাত্রীরূপে তাহাদেরই মতামত তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তোমাদের সহপাঠিনী ভগিনীদের মত বলিয়াই আমার উক্তিগুলি তোমরা গ্রহণ করিও। আমি মুসলমান সমাজের কথা তেমন কিছু জানি না। শুধু হিন্দু সমাজের কথাই বলিতেছি।

প্রাচীনাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

যদিও আমি নবীনাদিগের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্যের আলোচনা করিব, তথাপি প্রথমে প্রবীণাদিগের প্রতি—তোমাদের গৃহকর্ত্রীদিগের প্রতি, তোমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষে প্রাচীনাগণই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির স্তম্ভস্বরূপ। সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গেলে, নূতন কিছু প্রচলিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই স্বপক্ষে আনয়ন করা করা আবশ্যক। মনে কর তোমার ভগ্নী সাধারণ শিক্ষা অথবা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তোমার মাতাকে বুঝাইয়া তাঁহার সম্মতি লইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তোমরা স্বীকার কর,—ধরিয়া লইয়া আমি এখন আলোচনা করিতেছি। যদি তোমার ভগ্নী শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষিণী হয় তবে প্রাচীনাদিগের অনুমতি লওয়া তোমারই কাজ। তুমি বলিতে পার, 'কেন? আমার কাজ কেন?' কেন,—তুমি তাহা বেশ জান। কারণ মেয়ের কথা মা বা গৃহের অন্যান্য প্রবীণাগণ অগ্রাহ্য করিলেও তাহার দাদার কথা,—পুরুষের কথা তাহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। শিক্ষার মূল্য তুমি কিরূপে তাহাদিগকে বুঝাইবে?—তাঁহাদিগের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যবহার দ্বারা। যদিও তোমাদের সাংসারিক উন্নতির জন্য তোমাদের মাতা খুড়ী পিতামহী তোমাদিগকে ইংরেজী বিদ্যাশিক্ষার জন্য ঘর ছুইতে দূরে পাঠাইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা যে বড় প্রভুত্ব মনে তোমাদিগকে আনিতে দিয়াছেন তাহা মনে করিও না। প্রাচীন প্রথা মত তাঁহারা যদি তোমাদিগকে গৃহেই রাখিতে পারিতেন তবে তাঁহারা কত সুখী ও নিশ্চিন্ত হইতেন! তাঁহাদের মনে খুব ভয় আছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা তোমাদিগকে বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। তোমরা তোমাদের গভীর শ্রদ্ধা, বিনয় ও আনুগত্য দ্বারা প্রমাণ কর যে পাশ্চাত্যশিক্ষা তোমাদের জীবনকে উন্নত করিয়াছে, প্রফুল্লিত করিয়াছে। তবেই না তাঁহারা মেয়েদিগকেও শিক্ষা দিতে ভয় পাইবেন না! তোমার দৃষ্টান্ত দ্বারা যদি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পার যে পাশ্চাত্য শিক্ষা তোমার অনিষ্ট করে নাই, তবেই ভগ্নীর জন্য অনুরোধ করিবার তোমার অধিকার জন্মিবে।

তারপর নবীনাদিগের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্যের আলোচনা করিব। প্রথমে স্কুলের শিক্ষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। আজকাল প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেরই ধারণা জন্মিয়াছে, যে স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীটা কিরূপ হইবে তাহা লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা কি তাহাদের পক্ষে উপযোগী হইবে? স্ত্রীলোকদিগের কতটা শিক্ষা দরকার? গান করা, রান্না করা, ন্যারোবে শুশ্রূষা করা, মাতৃভাষায় একটু লিখিতে পড়িতে শেখা—ইহা হইলেই কি মেয়েদের শিক্ষা পর্য্যাপ্ত হয় না? এই শিক্ষার সাহায্যেই আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা হওয়া কি সম্ভবপর নয়?—আমি বলিব, না—তাহা সম্ভবপর নয়। এ শিক্ষা প্রচুর নয়। তোমরা হয়ত বলিবে, কেন নয়? —কারণ তোমাদিগের স্ত্রীরা তোমাদের জীবনসঙ্গিনী হইবে, তোমাদিগের সন্তানদিগের শিক্ষয়িত্রী হইবে। তোমরা বলিতে পার 'আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কি কি পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব, তাহা আমরাই ভাল বুঝি।' তা সত্য। কিন্তু আজকাল বিবাহ স্থিরকরণে যদি তোমাদের কোন হাত থাকে তবে যে তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া বস,—'পাত্রী কি ইংরেজী জানে?' স্বামী সুশিক্ষিত, কিন্তু স্ত্রী সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা—এরূপ অবস্থাও

সুখের দাম্পত্যজীবন সম্ভব,—এবং এরূপ সুখী দম্পতি অনেক দেখিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ সুখী পরিবারেও অনেক স্বামী মনে করেন,—আমি আমার স্ত্রীকে এত ভালবাসি, আমরা কত সুখে আছি, কিন্তু স্ত্রী যদি লেখাপড়া জানিত, সকল বিষয়ে যদি আমাকে সাহচর্য্য দান করিতে পারিত তবে আরো কত সুখের হইত? স্বামীর জীবনের সকল কথা স্ত্রী বুঝিতে পারে না, দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ সুখের পথে ইহা যে একটা বড় অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ নাই। সন্তানের উপর মায়ের প্রভাবের ত তুলনাই হইতে পারে না। শিশুর জীবনের প্রথম সাত বৎসরেই তাহার ভাবী-জীবনের ভিত্তিপত্তন হয়। এই সময়ে তাহার মনে যে সকল ধারণা বদ্ধমূল হয় তাহা চিরজীবন থাকিয়া যায়। তাহা হইলে নিশ্চয়ই মাতা সুশিক্ষিতা, উদারচিত্তা হওয়া আবশ্যক—যেন তিনি সন্তানকে কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত রাখিতে পারেন,—অথচ প্রাচীন আদর্শের যেটা ভাল সন্তানের অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতে পারেন।

এতক্ষণ আমি পত্নীরূপে ও জননীরূপে মেয়েদের কর্ত্তব্যের কথা আলোচনা করিলাম, কিন্তু নারীর কি নিজের একটা ব্যক্তিত্ব নাই? তোমরা যে তোমাদের জীবনে উচ্চশিক্ষার এতটা মূল্য দেও, নারী শুধু মনুষ্যত্বের দাবীতেই ত সেই উচ্চশিক্ষার দাবী করিতে পারে। নারী ত মানুষ বটে! স্বামীর জীবনের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশে নারী বঞ্চিত থাকিবে কেন? তোমরা বন্ধুতে বন্ধুতে কথা কহিবে আর তোমার স্ত্রী শুধু নীরবে নয়—কিছুমাত্র না বুঝিয়া বোকার মত—তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সুখী হইবে কেন? স্ত্রীদের মনে যে ইহাতে কষ্ট হয় না,—সর্ব্বত্র একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। এ বিষয়ে এদেশে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখি নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে আমি এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। একটী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে গভীর ভালবাসা, কিন্তু স্ত্রী অতি অল্পশিক্ষিতা। আমি দেখিলাম স্বামী তাঁহার সুশিক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে উচ্চ বিষয়ের যে আলোচনা করিতেছেন স্ত্রী তাহাতে যোগ দিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষেও আজকাল এরূপ পত্নীর অভাব নাই। কারণ, তোমাদের নবীনা মেয়েরা যে বুদ্ধিতে, অনুভব শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা বড় হীন আমার তাহা কিছুতেই মনে হয় না। তুমি হয়ত বলিবে, 'হিন্দুজাতির আদর্শ-পত্নী যাঁহারা তাঁহারা ত ইংরেজী জানিতেন না, ইংলণ্ডের ইতিহাস, জ্যামিতি, প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন পড়েন নাই। কিন্তু হায়, আজকাল সেরূপ মেয়ে কোথায়?—আজকাল শকুন্তলার মত নবীনা কোথায়? অতীতের দিকে চাহিয়া তুমি যে এমন দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ কর, তাহাতে মস্ত বড় একটা ভুল করিয়া বস; তুমি আধুনিক শকুন্তলাদের কথা ভুলিয়া যাও। প্রাচীন ভারতের অনেক মহিলা বিশেষ কৃতী ছিলেন,—তাঁহাদের অনেকে ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। শকুন্তলার কথা আমি বিশেষ ভাবে জানি। তিনি কি তোমার আদর্শমত শিক্ষাহীনা-সুগৃহিণী, সুপাঠিকা, ও উৎকৃষ্ট শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন?—পোষোক্ত সদ্‌গুণগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি চিত্রবিদ্যায়ও নিপুণা ছিলেন, তিনি দুষ্মন্তের ছবি নিজে আঁকিয়াছিলেন, তিনি সুকবি ছিলেন, কবিতায় তিনি দুষ্মন্তকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও উত্তম বাগ্মী ছিলেন দুষ্মন্তের সহিত রাজসভায় তাঁহার বাদানুবাদ উপলক্ষে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি তৎকালের জ্ঞান ও বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপেই ভূষিতা ছিলেন। যদি শকুন্তলা বর্ত্তমান যুগে জীবিত থাকিতেন তবে কি তিনি আজকালের প্রচলিত বিদ্যা ও জ্ঞানে ভূষিতা হইয়া স্বামী দুষ্মন্তের উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী হইতে চেষ্টা করিতেন না? নিশ্চয়ই তিনি করিতেন। তোমাদের নারীগণ তোমাদের চিন্তার অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত থাকিবে ইহা ভাবিতেও ক্লেশ হয়। জাতীয় উন্নতি ব্যাহত না করিয়া এরূপে একটা জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে না। সেইজন্য আমি বলি, তোমাদের ভগিনীদিগকে—আজকালকার মেয়েদিগকে, বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সুশিক্ষা দেওয়া তোমা-

দের কর্ত্তব্য। আমি একথা বলিতেছি না যে এই বিদ্যালয়-শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভের আর উপায় কোথায়? এখন এই শিক্ষাই তাহাদিগকে দেও। ক্রমে ক্রমে হয়ত এই দেশের ও জাতির পক্ষে অধিকতর উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু একথা বলিও না যে, এই শিক্ষা যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট নয়, তখন তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। যেটা ভাল এখন হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই এখন তাহাদিগকে দেও।

নারীর উচ্চশিক্ষা।

স্কুলে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের যে অসন্তোষ দেখা যায়, স্কুলের শিক্ষা গৃহের চালচলনের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া, যে অভিযোগ শোনা যায়, আমার মনে হয় তাহার প্রধান কারণ হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাব। তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, নারীদিগকে কলেজের উচ্চশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কি না? অনেকে বলেন, উচ্চশিক্ষা দ্বারা পুরুষ ভাবাপন্ন, বিজাতীয় প্রকৃতি বিশিষ্টা, স্বাধীনচিত্তা, বুটপরা, চসমাওয়ালা মেয়ের সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহারা পুরুষের ব্যবসা অবলম্বন করে, পুরুষের সমকক্ষ হইতে চায় এবং গার্হস্থ্য জীবন ও গৃহকর্ম্মকে ঘৃণা করে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

আমার ব্যক্তিগত মত এই,—যে সকল মেয়ে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না, অথবা যাহাদের গভীর জ্ঞানলাভের জন্য অন্তরে একটা পিপাসা নাই, তাহাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। যদি স্কুলে কোন মেয়ে লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ না দেখায় তবে তাহাকে কলেজে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। এইরূপ স্কুলে মেয়েকে কলেজে পাঠান আমি নিষ্ঠুরতা মনে করি। কারণ ইহাতে সে শক্তির অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে যাইয়া শুধু তাহার শরীর নয় মন ও হৃদয়-বৃত্তিরও অনিষ্ট করে। সুতরাং দেখিতেছ, আমি সকল মেয়ের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নই। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ সাধারণ ভাবে সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। অবশ্য এইরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় বটে, যে কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা বিলাতি চালচলন অস্বাভাবিক মাত্রায় অনুকরণ করেন, এবং জাতীয় ভাব বর্জ্জন করিয়া ভারতনারীর মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন; কিন্তু আমি দেখিয়াছি, অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাই সুশিক্ষা লাভ করিয়া যথেষ্ট মানসিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্বাভাবিকতা বা জাতীয় ভাব কিছুমাত্র হারান নাই।

আমার একথা মনে হয় না, যে উচ্চশিক্ষা ভারত-নারীকে ভারতীয় বিশেষত্ব হইতে বিচ্যুত করিবে। তোমরা কি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছ? যদি বিসর্জ্জন না দিয়া থাক তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা তোমাদের মেয়েদিগকে কেন জাতীয়ত্ব-বর্জ্জিত করিবে?" আমি তোমাদের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারি, আমার ছাত্রীদের মধ্যে আমি ভারতবর্ষের প্রতি এবং জাতীয় ভাবের প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখিতে পাই।

"বুটজুতা" আর "চসমা"—এত ভয়ের জিনিষ নয়। অধ্যয়নে পুরুষের যেমন মেয়েদেরও তেমনি চক্ষুর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। বুটজুতা পরিবার 'প্রয়োজনীয়তাটা' আমিও বুঝি না। জুতা জিনিষটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অস্বস্তিকরও বটে। দেশের আব-হাওয়ার জন্য বাধ্য না হইলে জুতা পরিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু মেয়েরা এ সম্বন্ধে কি বলে তোমরা জান? তাহারা বলে, "আচ্ছা, ছেলেরা যে আমাদের বড় নিন্দা করে, তাদের কথা কি? তাহারা যে বড় বুট পরে, কলার গলায় দেয়, সাহেবী পোষাক পরে তার কি? আমরা শকুন্তলা নই বলিয়া তারা যে বড় নিন্দা করে—তারা বুঝি দুষ্মন্ত!" আসল কথাটা এই, পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে নূতন জিনিষ। এই শিক্ষা প্রভাবে মেয়েরা প্রথমে কতকটা পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইলেও দু'দিন পরে আর তাহা থাকিবে না। এখনই জাতীয়ভাবের শ্রেষ্ঠতার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই যে নারীদিগকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবে, কিন্তু মেয়েরা চালচলনে, বরণধারণে ও আকাঙ্ক্ষায় ভারতীয়ই থাকিবে।

শ্যামনগরের জমিদার।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(২)

চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলাম ওই দ্বীপের সমুদ্রতটে পড়িয়া রহিয়াছি। তখন অপরাহ্ণ। কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম, কি প্রকারে এখানে আসিলাম কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এখনও তাহা স্থির করিতে পারি নাই। সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইল। অতি কষ্টে উঠিয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও পায়ে অত্যন্ত বেদনা। কোন্‌খানে আসিলাম, এখানে কতদিন কি ভাবে কাটাইতে হইবে, আর কখনো স্বদেশ ও স্বজনগণকে দেখিতে পাইব কিনা, এই সকল চিন্তা তখন আমাকে আকুল করিল। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র হইয়া কাটাইলাম। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের জল মুখে দিলাম, কিন্তু সেই লবণাক্ত জল গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না। দুর্ব্বলতা বশতঃ আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। তৎপর যখন জাগিলাম, তখন প্রাতঃকাল। তখন শরীর যেন একটু সুস্থ বোধ হইল। রাত্রিকালে মুক্ত আকাশতলে সমুদ্রের তীরে নিদ্রিত ছিলাম, তথাপি শীত বোধ হয় নাই।

নিশ্চেষ্ট হইয়া সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে প্রাণ যাইবে বিবেচনা করিয়া দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলাম। সেদিন উঠিয়া দেখিলাম চলিতে তেমন কষ্ট বোধ হইতেছে না। কিন্তু তখন আমার পরিধানে কোনপ্রকার বস্ত্রাদি ছিল না। সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্ত্তিতে কি করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এবং যদি কোন জাহাজ সেই স্থান দিয়া যায় এই আশায় সমুদ্রের যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাটিল। সূর্য্যের প্রখর কিরণে বালুকারাশি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইতে লাগিল।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আমার অনতিদূরে কাল রংএর একটি পেণ্টালুনের মত কি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। সেখানি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম সেটি একটা জীর্ণ প্যাণ্টালুন। সেইটিকেই অগত্যা পরিধান করিলাম। তাহার দ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারিত হইল।

তারপর সেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইলাম। অতি কষ্টে প্রায় একপোয়া ক্রোশ অগ্রসর হইয়া নারিকেল বৃক্ষপূর্ণ একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে বহু নারিকেল পতিত রহিয়াছে। আছড়াইয়া আছড়াইয়া সেই নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া মালা ভাঙ্গিয়া কয়েকটি নারিকেলের শস্য ও জল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। তখন মনে হইল, যে এই স্থানে আর যা কিছুরই অভাব হউক না কেন নারিকেল খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারা যাইবে। সেই নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর অনতিদূরে একটা প্রকাণ্ড শাখাবহুল বৃক্ষ দেখিলাম। সেটি অনেকটা আমাদের দেশের অশ্বত্থবৃক্ষের মত। সেই বৃক্ষের প্রকাণ্ড গুঁড়ির একদিকে বহু গোছের একটা কোটর। সেই কোটরের মধ্যে অনায়াসে একজন মানুষ বসিয়া থাকিতে পারে। আমি সেই কোটরের নিকট যাইবামাত্র সেখান হইতে একটি শৃগাল বাহির হইয়া চকিতনেত্রে আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। সেই কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কোনরকমে সেই কোটরে থাকিয়া রাত্রি যাপন করা যাইতে পারে।

তখন সেই বৃক্ষের তলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সমুদ্রের তীরের দিকে চাহিলাম। মনে সর্ব্বদাই এই আশার সঞ্চার হইতে লাগিল যে ঐ পথ দিয়া কোন না কোন জাহাজ নিশ্চয়ই যাইবে এবং তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হইবে। সমুদ্রের তীরে গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সেখানে বসিয়া থাকিয়া হতাশ হইয়া পুনরায় সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে আসিলাম। তখন সূর্য্য অস্তমিত

প্রায়। এই সময়ের মধ্যে একটি মনুষ্যও আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল না। বৃক্ষ কোটরে রাত্রিযাপন করিলাম।

এইরূপে দশ দিন ধরিয়া সেই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে এগার দিনের দিন দুইটী মনুষ্য-মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দুইটীই পুরুষ, খর্ব্বাকৃতি। ইহাদের বর্ণ তাম্রের ন্যায়। ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র। মস্তক কেশ-বিরল। কপাল অত্যন্ত উঁচু। ইহাদের শরীর দৃঢ় ও মাংসল। ইহাদের স্কন্ধদেশে নরমুণ্ডমালা দুলিতেছে। ইহাদের উভয়েরই হস্তে তীর ও ধনু। এই দুই নরমূর্ত্তি আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়সূচক শব্দ করিল। তারপর তাহারা উভয়েই পরস্পর দু'চারটি শব্দ উচ্চারণ করিল এবং হাত মুখের ভঙ্গি করিল। সেই শব্দ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা উভয়েই কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এবং আমাকে তাহাদিগের অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল বলিয়া বোধ হইল। আমি তাহাদের অনুগমন করিলাম। তাহারা প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ চলিয়া একটি স্থানে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে কয়েকটী প্রকাণ্ড ছায়াবহুল বৃক্ষ রহিয়াছে। সেই বৃক্ষগুলির মধ্যে সকল বৃক্ষেই দুইএকটি করিয়া কোটর রহিয়াছে। সেই বৃক্ষগুলির তলায় প্রায় কুড়িটি মনুষ্যমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের আকারপ্রকার আমার পূর্ব্বদৃষ্ট সঙ্গী দুইটীর ন্যায়। সঙ্গী দুইটী সেই স্থানে উপবিষ্ট লোকগুলির নিকট একটা শব্দ করিল। অমনি সেই লোকগুলি আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন তাহাদের অঙ্গভঙ্গি ও ইঙ্গিত দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে তাহারা আমাকে সেইখানে বসিতে অনুরোধ করিতেছে। তদনুসারে আমি সেই স্থানে বসিতে উদ্যত হইলে একব্যক্তি আমার নিকট একখণ্ড কাষ্ঠ রক্ষা করিল। আমি সেই কাষ্ঠখণ্ডে উপবেশন করিলাম।

আমি যে লোকগুলিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কেবল তিনটী স্ত্রীলোক আর সকলেই পুরুষ। আমি উপবেশন করিবার পর সেই লোকদিগের মধ্যে দুই জন দুই তিনবার উচ্চৈঃস্বরে নিকট চীৎকার করিল। সেই চীৎকারের কয়েক মিনিট পরে প্রায় দশ জন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক, পোনর ষোল জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ এবং প্রায় কুড়ি জন বালক-বালিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুই তিন জন কতকগুলি নারিকেল ও পাকা কলা আমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া তাহাদের মুখের নিকট হাত দিল। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে তাহারা আমাকে ঐসকল নারিকেল ও কলা খাইতে অনুরোধ করিতেছে। আমি সুপক্ক কদলীগুলির খোসা ছাড়াইয়া সেগুলি উদরসাৎ করিতে লাগিলাম এবং আমার নিকটে উপবিষ্ট কয়েকটী অল্প-বয়স্ক বালকবালিকাকে দু'একটী সুপক্ক কদলী খাইতে দিলাম। আমরা কুকুর বিড়াল পুষিলে তাহাদিগকে যেরূপ যত্ন করি, খাইতে দিই, এই সকল পশু-প্রকৃতির লোকগুলি আমাকেও সেইরূপ কিছু মনে করিতেছে কিনা ইহাই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু চিন্তা করিয়া ফল নাই। হয় আমি এই নরপশু-দিগকে পরিচালিত করিব, না হয় তাহাদিগের দ্বারা চালিত হইব। ইহারা যদি নরখাদক হয়, তাহা হইলে যে কোন সময়ে আমাকে মারিয়া আমার মাংসে উদর-পূর্ত্তি করিতে পারে।

এই নরপশুদিগের সহিত কয়েক দিবস যাপন করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ইহাদিগকে সকল বিষয়ে আমার আজ্ঞাবহ করিতে পারিব। ইহারা এখনও স্বভাবের শিশু হইয়া রহিয়াছে। বাস করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানে না। অরক্ষিত বনজাত ফলমূল ও মৃগয়া-লব্ধ পশুমাংস আহার করিয়া ইহারা প্রাণধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কৃষি অপরিজ্ঞাত। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করিয়া ইহারা অগ্ন্যুৎপাত করিয়া সেই অগ্নিতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র প্রজ্বলিত করিয়া শীত নিবারণ করে এবং কখনও কখনও সেই অগ্নিতে পশুমাংস ঝল-

খাইয়া লয়। রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অথবা বৃক্ষকোটরে শয়ন করে।

ইহারা যে ভাষা ব্যবহার করে তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তাহারা মোটের উপর দশটী কি বারটী শব্দ ব্যবহার করে। সেগুলিও অতি সংক্ষিপ্ত। তিন চার দিনের মধ্যেই আমি সেগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। আমি যে স্থানে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আসিয়া পড়িয়াছি, সেই স্থান প্রকৃত দ্বীপ কিনা, সেই স্থান হইতে অন্যত্র যাইবার উপায় আছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রথম প্রথম কয়েক মাস যাবৎ আমি সমুদ্রের তীর ধরিয়া সেই স্থান প্রদক্ষিণ করিলাম। সেই সময়ে আমার সঙ্গে এই স্থানের কয়েকজন অধিবাসীও রহিল। এইরূপ ভ্রমণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে এই স্থানটি দ্বীপই বটে। ইহার পরিমাণ চারি বর্গ ক্রোশের অধিক হইবে না। ইহার চতুর্দ্দিকে অনন্ত জলরাশি।

(৩)

ক্রমে ক্রমে আমি সেই দ্বীপের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে সেই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত পাঁচ শতের অধিক হইবে না। ইহাদের পরস্পরের আচার ব্যবহারের বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইল না।

ইহাদের সহিত প্রায় চার পাঁচ মাস যাপন করিবার পর আমি ভাবিলাম যে কতদিনে এই সভ্যতার আলোকস্পর্শশূন্য দ্বীপ হইতে উদ্ধারলাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই; মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দ্বীপে কাটাইতে হইতে পারে। এমত অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য। এই নরপশুদিগের সহিত বাস করিয়া জীবন-ধারণ অসহ্য বিবেচনা করিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিব কি? না, আত্মহত্যা করিবার অধিকার আমার নাই। এই দ্বীপের বর্ব্বর অধিবাসীদিগকে আমি সভ্য করিবার চেষ্টা করি না কেন? তাহা হইলে ত আমারি সময় অনর্থক কাটিবে না? ইহাদিগকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষা দিলে, ইহাদিগের মুখে ভাষা আনিয়া দিলে, এবং এই দ্বীপের পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী ও খনিজ পদার্থ সমূহের অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে আমার এতদিনের কষ্ট-লব্ধবিদ্যা অন্ততঃ কিয়দংশে সফলতা লাভ করিবে। কিন্তু এই নরপশুদিগকে আমাদের ন্যায় সভ্য করিবার চেষ্টা করিলে, ইহাদের উপকার কি অপকার হইবে? সভ্যতালাভে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হইয়া ইহাদের মনে অসন্তোষ ও অশান্তির আবির্ভাব হইবে না ত? তা যাহাই হউক আমি এই দ্বীপে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না।

(৪)

অনেক চিন্তার পর সেই দ্বীপের অধিবাসীদিগকে আমাদের সভ্যতার আদর্শে সুসভ্য করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলাম।

পাছে আমার অধিগত বিদ্যা ভুলিয়া যাই, পাছে লিখিতে ভুলিয়া যাই, পাছে উচ্চারণের ত্রুটি থাকে, এই আশঙ্কায় আমি প্রতিদিন দিবা দুইপ্রহরের সময় ও রাত্রি দুইপ্রহরের সময় বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির যে সকল অংশ আমার কণ্ঠস্থ ছিল, তারস্বরে সেই সকল অংশের আবৃত্তি করিতাম। উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করিতাম, কত রকম তর্কবিতর্ক করিতাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ধরিয়া কাঁটা দিয়া কলার পাতে বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় আমার মনের ভাব লিখিতাম।

এইরূপে এই বার বৎসর যাপন করিয়াছি। এই দ্বীপের অধিবাসীদিগকে বাঙ্গলা-ভাষা শিখাইয়াছি। এই দ্বীপ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। এই দ্বীপে আমার বার বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক-খানি সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করিব স্থির করিয়াছি। সেই সকল কথা এখন সবিস্তারে বলিতে গেলে তাহা সকলের মনঃপূত না হইতে পারে।

সময়ের হিসাব রাখিবার জন্য আমি এই দ্বীপে জাগরিত হইবার পর হইতে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইলে একটী নূতন দিন হইল এইরূপ গণনা করিতাম এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের সংখ্যাসূচক শব্দটী কয়েক-বার উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতাম। এইরূপে আমি

এই দ্বীপে চারি হাজার দুই শত বাইট দিন বাস করিয়াছি।

(৪)

গত রাত্রি এই দ্বীপে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য রাত্রি প্রভাত ও ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইলে আমি এই দ্বীপের অবস্থা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। এই ঝড়বৃষ্টিতে এখানকার অধিবাসীদিগের কোন অনিষ্ট হয় নাই। সমুদ্রের তীরে আসিবার সময় পথিমধ্যে এই উদারচেতা ইংরেজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা জানাইয়া আমাকে তাঁহাদের জাহাজে লইবার প্রার্থনা জানাই। তিনি সব কথায় আমার পরিচয় জানিয়া লইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাঁহার সঙ্গে এই জাহাজে আনিয়াছেন। বারশ বৎসরের পর এই দ্বীপ ও দ্বীপবাসীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমার মনে যে কোনরূপ কষ্ট হইতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু স্বদেশ, স্বদেশবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে দেখিবার জন্য মন এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে এই দ্বীপের অধিবাসীদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়াই আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। আমার এই দ্বীপে আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, এই দ্বীপ হইতে আমার অকস্মাৎ তিরোধান এই দ্বীপবাসীদিগকে তদ্রোধিক বিস্মিত করিবে।

ভগবানের কৃপায় আমার আদর্শ অনুসারে আমি এই দ্বীপবাসীদিগকে অনেক বিষয়ে উন্নত করিতে পারিয়াছি।

(৫)

জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে। আর দিন দুই তিন মধ্যে বোম্বাই পৌঁছিব শুনিতেছি। ভবানীচরণকে আমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা এবং আমার বন্ধুবান্ধবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বিশেষ কোন সংবাদ বলিতে পারিল না অথবা বলিল না। ডাক্তার ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র বলিলেন যে আমার পিতার নির্ব্বাসনের আদেশ রহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার সংকল্পিত বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তাহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ তিনি রাখেন না। ক্রমে বোম্বাই পৌঁছিলাম। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের পোনরই। স্থির করিলাম পূর্ব্বে কাহাকেও সংবাদ না দিয়া একবারে আমাদের কলিকাতার বাটীতে গিয়া উঠিব। কত বৎসরের পর দেশে ফিরিতেছি, কিন্তু যাঁহাদিগের জন্য ফিরিতেছি, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা, তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন কিনা?

রামকমল বিদ্যালঙ্কারের কথা।

(১)

শাস্ত্র কখন মিথ্যা হয় না। "সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।" কৃষ্ণপদ বাবাজী জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশে ফিরিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার শনির দশা শেষ হয় নাই। বিশ্বনাথ রায় বাহাদুরই দেখিতেছি বাবাজীর শনি। যে পঁচিশ বৎসরের পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, সে কৃষ্ণপদ না'ত কে? কিন্তু শনি বিশ্বনাথ রটাইতেছেন যে, ও ব্যক্তি প্রকৃত কৃষ্ণপদ নয়, ও জাল কৃষ্ণপদ। বিশাল সম্পত্তির লোভে কোন জুয়াচোর কৃষ্ণপদ সাজিয়াছে। বলিতেছেন যে ইতিপূর্ব্বে জাল-প্রতাপচাঁদ লইয়া কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। আরে বাপু, যে আসিয়াছে সে কখনই জাল-কৃষ্ণপদ হইতে পারে না। আমি ত তাহাকে তাহার জন্মাবধি দেখিয়াছি। আমি তাহাকে চিনিতে পারিব না? সে যদি প্রকৃত কৃষ্ণপদ না হইবে, তাহা হইলে সে আমাদের সকলের, সকল বিষয়, বিকুণ্ঠাবুর সম্পত্তি ঘটিত, বিষয় এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানিবে কেমন করিয়া? সে রমানাথকে চিনিবে কেমন করিয়া, হরকুমারকে চিনিবে কেমন করিয়া, ডেপুটেমোনা জাহাজ ডুবীর কথা রমানাথকে বলিবে কেমন করিয়া? কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তারাও হইয়াছেন তেমনি। তাঁরাও বিশ্বনাথের সুর ধরিয়াছেন। তাঁরাও বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে যে প্রকৃত কৃষ্ণপদ তাহা যতদিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবেন না। এই আপত্তি উঠাতে কৃষ্ণপদ বাবাজী শ্যামনগরে আইনা স্থগিত রাখিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, 'এই বিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সে কলিকাতার বাটীতে থাকিবে। সাপরিকার মাতা এই সকল শুনিয়া মৃত-প্রায় হইয়াছেন। শুনিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট এই সন্দেহের নিরাকরণের জন্য এক কমিশন বসাইবেন। তাঁরা নাকি আবার আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। বাবাজীর কোষ্ঠীটা আবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে তাহার উপর বিশ্বনাথ শনির দৃষ্টি আর কত দিন আছে।

কৃষ্ণপদ দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া এক বৎসর ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন করিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমার স্বামী সম্বন্ধে স্মৃতি-কথা।

আমার স্বামীর বিবাহ হইয়া গেলে, কীর্ত্তনে চারি ভাই ও আমার স্বামী, এই কয়জন, শিক্ষার জন্য বোম্বাই নগরে গেলেন।

কোল্‌হাপুরের বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষা হইবার পর, "এখন শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বোম্বাইয়ে পাঠাও" এই বলিয়া প্রতিদিন কীর্ত্তনের নিকট আমার স্বামী তাগিদা করিতে লাগিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীর প্রতি কখনো কঠোর ব্যবহার করিতেন না কিংবা রাগ করিতেন না। তথাপি আমার স্বামী আপনি নিজে গিয়া তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না কিংবা কোন প্রার্থনা জানাইতেন না; ছোট বেলা হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বামীর এইরূপ অভ্যাস ছিল। আবশ্যক হইলে অন্যকে দিয়া তাহা জানাইতেন।

কচিৎ কখন সাক্ষাতে বলিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি অতি অল্প কথায় ভক্তিনম্রভাবে বলিতেন। খাইবার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে শ্বশুর মহাশয়ের সম্মুখে তিনি বসিতেন না। সম্মুখে কিছু বলিবার দরকার হইলে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া কথাটি বলিয়াই নিজের কাজে চলিয়া যাইতেন। ছেলেবেলা হইতেই এইরূপ অভ্যাস থাকায়, শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে যাইবার খুব আগ্রহ থাকিলেও ভীরু স্বভাবপ্রযুক্ত শ্বশুর মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া এই কথা বলিতে তাঁহার কখন সাহস হয় নাই। তাই, প্রতিদিন শেষ নিদ্রা হইতে উঠিয়া তিনি আবা-সাহেব কীর্ত্তনের নীচের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং কীর্ত্তনে উঠিয়া বাহিরে আসিলেই তাঁহাকে বলিতেন, "আবা-সাহেব, বোম্বাইয়ে আমাদের কখন্ পাঠান হবে? ভাউ-সাহেবকে বোলে' আমাদের সবাইকে শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে পাঠিয়ে দিন।" এইরূপ দুই তিন মাস নিয়ত আবা-সাহেবকে বলিয়া তবে তাঁহার আবাহন সম্পূর্ণ করেন। পরে, তিনি ও শ্বশুর মহাশয় পরামর্শ করিয়া, বিনায়ক রাও, বলবন্ত রাও, নীলকণ্ঠ রাও, ত্রিম্বক রাও ও আমার স্বামী—এই পাঁচ জনকে, এক চাকর ও ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিয়া, ১৮৫৬ অব্দে শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে পাঠাইলেন।

আমার স্বামী সেইখানে যাইবার পর, তিন বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৫৯ অব্দে বোম্বাই ইউনিভার্সিটির "ম্যাট্রিকুলেশন" পরীক্ষা দিলেন ও তৎপূর্ব্বে এলফিন্‌ষ্টন ইনষ্টিটিউটে প্রথম ১০, পরে ১৫ ও তাহার পর ২০ টাকার ছাত্রবৃত্তি পাইতেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার পর, প্রথম তিন বৎসর জুনিয়ার ও তাহার পর তিন বৎসর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ইউনিভার্সিটি হইতে প্রদত্ত হয়। সেই সময়, আমার স্বামী প্রথম ৫০ টাকা ও তাহার পর ১২০ টাকা মাসে মাসে "ফেলোশিপের" বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৬১ অব্দে আমার স্বামী "লিটল-গো"র পরীক্ষা দিয়া ১৮৬২ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ও সেই বৎসরেই ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে অনার-পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক ও ২০০ টাকার পুস্তক পুরস্কার পাইলেন। ১৮৬৪ অব্দে এম-এ ডিগ্রী পাইলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ অব্দে বোম্বায়ের ইন্দুপ্রকাশ-পত্র বাহির হইয়াছিল, এবং তাহার পরি-

চালকেরা ইংরাজী অংশের সম্পাদনের ভার আমার স্বামীর প্রতি অর্পণ করিলেন। তিনিও পরীক্ষার অভ্যাসক্রমের ব্যাঘাত না করিয়া এই কাজ উত্তমরূপে চালাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরেই, "পানিপথের যুদ্ধের শতসাম্বৎসরিক দিবস" এই বিষয়ের উপর একটা অগ্রলেখ (leader) লিখিয়াছিলেন। এই লেখায় যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও দেশপ্রীতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দরুণ সকলের দৃষ্টি ঐ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এম-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন অভ্যাস যখন চলিতেছিল তখনই কালেজে "ক্লাস পড়াইবার" ভার তাঁর উপর ছিল। কোন কাজেই ত্রুটী না হয় এই জন্য তিনি শিক্ষাদান সম্বন্ধে গ্রন্থাদি খুব পাঠ করিতেন। এই সময়ের ফলে ১৮২৪ অব্দে চোখ বিগড়াইয়া যাওয়ায় একেবারেই দেখিতে পাইতেন না। তিনি ছয় মাস পর্য্যন্ত সবুজ রঙ্গের পটি দিয়া চোখ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ডাক্তার ভাউদাজী "চোখ খুলিয়া আদপে দেখিবে না" আমার স্বামীকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে আদেশ করিতেন। প্রতিদিন সকালে, কোন না কোন বন্ধু আমার স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভাউদাজীর বাড়ী লইয়া যাইতেন, এবং সেখানে ডাক্তার নিজ হাতে চোখের পটি খুলিয়া, চোখ ধুইয়া, ঔষধ দিয়া আবার পটি বাঁধিয়া দিতেন। এইরূপে ছয় মাস পর্য্যন্ত আমার স্বামী চোখের জন্য এত কষ্ট পাইতেছিলেন, তবু পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন ছাড়েন নাই। চক্ষুপীড়ার সময়, সহাধ্যায়ী মিত্রমণ্ডলীর মধ্যে এক একজন পালা করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন আর তিনি শুনিতেন। অধ্যয়নের এইরূপ প্রণালী ছিল। তাঁর এই চক্ষুপীড়া কমবেশী পরিমাণে শেষ পর্য্যন্ত ছিল। পরে আমার স্বামী "এল্-এল্-বি" পরীক্ষায় অনর সমেত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। ইহার পূর্ব্বে, এলফিন্‌ষ্টন্ কালেজে ইংরেজী শিখাইবার যে কাজ তাঁহার ছিল, তাহার দরুণ তখনকার কালেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ চর্চ্চীলড্, অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ সকলে মিলিয়া ৩০০ টাকা মূল্যের এক সোনার ঘড়ী তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

১৮৬৬ অব্দে, পুনরায় শিক্ষাবিভাগের 'আর্কিভ' মারাঠী অনুবাদকের পদে আমার স্বামী ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। পরে অকলকোটায় কিছুদিন ম্যানেজারের কাজ ও কোল্‌হাপুরে বিচারপতির কাজ করিয়া পুনর্ব্বার ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ পর্য্যন্ত বোম্বায়ের এলফিন্‌ষ্টন্ কালেজে ৪০০ টাকা বেতনে ইংরাজী অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই কাজে থাকিতে থাকিতেই হাইকোর্টে 'টর্ম' রক্ষা করিয়া অ্যাড্‌ভোকেটের পরীক্ষা দিলেন এবং তাহাতে বেশ সফলতা লাভ করিলেন। মধ্যে যখন কোল্‌হাপুরে আমার স্বামী বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন, সেই সময় আমার শ্বশুর মহাশয় খাস ম্যানেজারের পদে ছিলেন। আমার স্বামী কোল্‌হাপুরে যখন বদলী হইলেন তখনও তাঁর ছেলেবেলাকার সেই ভীরুতা, সেই ভক্তিনম্রতা সমানই ছিল। ছাত্রাবস্থার সময়ে যেরূপ, এ সময়েও সেইরূপ; তিনি কাহারও উপর রাগ করিতেন না, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না, সেইরূপ নীরবে আপনার কাজ করিতেন ও অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতেন। এইরূপ তাঁহার কাজের ধরণ ছিল।

কোল্‌হাপুরে আমার শ্বশুর মহাশয় অনেক দিন বাস করায়, অনেক ভালো ভালো লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন। ঘরের লোক ছাড়া সেখানে পরকীয় অন্য লোকেরও অনুরোধ উপরোধ করিবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। তথাপি আমার স্বামীর কাজকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে নিস্পৃহতা ও সতর্কতা থাকাতে, তিনি কাহারও অনুরোধ উপরোধ রাখিতেন না—একথা আমার শ্বশুর মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন; তাই কাজ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, তিনি একটি কথাও মুখ হইতে বাহির করিতেন না। আমার স্বামী কোল্‌হাপুরে যাইয়া যখন বিচারপতির কাজ করিতেছিলেন, একমাস সওয়া মাসের পর, একদিন আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকদ্দমার প্রতিবাদী একটা বড় গরের গৃহস্থ হওয়ায়, শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তাহা ছাড়া তাঁহার সহিত নিতান্ত দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়

সম্বন্ধও ছিল। সেই ব্যক্তি বাড়ী আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে, "আমার হইয়া আপনি দুই এক কথা মাধব রাওকে বলিবেন। আপনার ইহা ভাল লাগে না, তা আমি বুঝি। কিন্তু আপনার যাতে সঙ্কোচ হয় এমন কোন কথা বলিতে আমি বলিতেছি না। আমার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিবেন যে, ফুরসতের সময় আমার সমস্ত কাগজপত্র তিনি পড়ে দেখবেন ও ধীরেসুস্থে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নেবেন। এ ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। একবার এই সমস্ত শুনলে পর যদি কোন বেরোবার রাস্তা আছে বলে তাঁর মনে হয়, তবে আমি সেই রাস্তা ধরে চলব। এইটুকু মাত্র আপনি আমার হয়ে বলবেন।" এইরকম করিয়া খুব ধরিয়া পড়ায়, শ্বশুর মহাশয় স্বীকৃত হইলেন এবং আমার স্বামী যেখানে বসিতেন, কাঠীর সেই উপর তলায় শ্বশুর মহাশয় সেই লোকটিকে লইয়া গেলেন। শ্বশুর মহাশয়কে দেখিবামাত্র আমার স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহারা দুজনে বসিলে পর, আমার স্বামী বসিলেন। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন,—"ইনি একটা কথা বলবেন বলে এসেছেন, এঁর কথাটা শুনে নেও।" আমার স্বামী কোন উত্তর দিলেন না। ইহা দেখিয়া সেই ভদ্রলোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই কথা বলিলেন—"আমি আর কোন কাগজপত্র আনিনি; আপনার ফুরসৎ হলে নিয়ে আসব।" তখন আমার স্বামী বলিলেন,—"আজ আমার অনেক লেখবার কাজ আছে, ফুরসৎ পেলে আপনাকে জানাব।" এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"তা বেশ। ফুরসৎ হলে আমাকে জানালেই আমি আবার আসব। এখন যাই।" এই বলিয়া তিনি নমস্কার করিলেন ও উঠিয়া গেলেন। তাহার পর শ্বশুর মহাশয় নীচে যাইবার জন্য উঠিলেন। তখন আমার স্বামীও উঠিয়া তাঁহাকে খুব নরম ভাবে অথচ স্পষ্ট কথায় এইরূপ বলিলেন যে, "এখানে আমি কাজের জন্য এসেছি। সমস্ত কোল্হাপুরই আপনার; এবং যে-সে লোক এসেই নিজের কাজের জন্য অনুরোধ উপরোধ করবে। এরকম না হলেই ভাল হয়। নইলে আপনার কষ্ট হবে। তাহা হইলে আমাকে এখান থেকে বদলী করে দিতে হবে। মোকদ্দমার কোন পক্ষেরই কাজ আমি বাড়ীতে দেখব না কিংবা তার কথা আদালতের বাহিরে শুনব না,—এইরকম আমার নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা আপনি চালাবেন।" এইরূপ বলিবার পর, তিন চারি মাস কোল্হাপুরেই কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই।

পরে পুনায় আসিবার পর অবধি এল্‌ফিনষ্টোন্ কালেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৭১এর নবেম্বর মাসে পুনায় ৮০০ টাকা বেতনে সদর আমীনের (ফার্ষ্ট ক্লাস সবজজ) পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৩ অব্দে আমার স্বামীর প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি পুনায় আসিবার পর হইতে কয়েক মাস ধরিয়া পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছিলেন। সনেশ সাহেব সাকুর্ডে-করের ঔষধ ও পাচন সুরু হইয়াছিল। তবুও তাঁর পীড়াটা দিন দিন কমিয়া না যাওয়ায়, প্রথম চারি পাঁচ মাস সামান্য পীড়া বলিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, এখন ডাক্তার ও বৈদ্যেরা তাহাকে ক্ষয়রোগ বলিলেন। এই রোগভোগের সময়, স্বামীর অত্যন্ত উদ্বেগ ও রাত্রি জাগরণ হইত। আদালতের কাজ সমাপন করিয়া দিবসে ও সমস্ত রাত্রি ঠিক সময়মত নিজের হাতে ঔষধ দেওয়া ও রাত্রিজাগা কত কঠিন তা যে ভুক্তভোগী সেই জানে। সৌভাগ্যবতী রমাবাঈর * স্বভাব অতিশয় নম্র ও মন

* বিবাহের পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল রখুবাঈ। বিবাহের পরে মহারাষ্ট্রী রমণীদের নাম বদল হইয়া যায়। ইহার সহিত এই স্মৃতিকথার লেখিকা রমাবাঈকে পাঠকবর্গ যেন না মিশাইয়া ফেলেন। অনুবাদক।

কুমারী অবস্থায় স্ত্রীর নাম যাহাই থাকুক বিবাহের পর স্বামীর নাম অনুসারে মারাঠী স্ত্রীর নাম পরিবর্ত্তিত হয়। স্বামীর নাম মহাদেব থাকিলে স্ত্রীর নাম হইবে উমা বা গৌরী। স্বামীর নাম বিষ্ণু বা মাধব থাকিলে স্ত্রীর নাম হইবে লক্ষ্মী বা রমা। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের স্ত্রীর নাম উমা বা গৌরী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নাম দেখিতেছি রমা। তাঁহার খুড়ীমা তাঁহার নামোল্লেখ কালে 'মাধব' বলিয়াই উল্লেখ করিতেছেন। অথচ গ্রন্থাদিতে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে নামই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। ডাঃ যঃ গঃ।

মৃত্যুর পূর্ব হওয়ায়, তাঁহার প্রতি আমার স্বামীর অত্যন্ত ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সেইজন্য, তাঁহার পীড়ার সময় যত কাজই হোক না কেন, তিনি তাহা নিজে করিবেন এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। বিস্তর ঔষধ উচ্চার করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়, ৬ই কার্তিক তারিখে। ১৮৫৪ শকে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃঃ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর, এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার স্বামীর অত্যন্ত শোক হইয়াছিল। বিনা অশ্রুপাতে একদিনও যায় নাই। রাত্রিতে আহারের পর যতক্ষণ না ঘুম আসিত, তিনি তুকারামের অভঙ্গ পাঠ করিতেন। কোন অভঙ্গ করুণ ও প্রেমপূর্ণ হইলে, তিনি তাহা দুই তিনবার আওড়াইতেন ও ভাবে অভিভূত হইতেন। কিন্তু আমার বিবাহ হইবার পর, দন্তাকালে আমাকে শিক্ষা দিতে তাঁর ঘণ্টা দেড়েক যাইত। আমার বিবাহের ও তাহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত আমি সবিস্তারে লিখিতেছি।

আমার প্রপিতামহের নাম পদপত রাওভাউ। ইনি একজন মস্ত নামজাদা সিপাহী ছিলেন। ইনি শঙ্কর-উপাসক ও দৃঢ়নিশ্চয়ী ছিলেন। তথাপি ইঁহার চিত্ত ভক্তিরসে পূর্ণ ছিল। ইনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। পূর্ণ বয়সে একবার তাঁর মাতোশ্রীর প্রতি রাগের মাথায় কিছু দুরুত্তর করিয়াছিলেন। ইহার দরুণ ঘণ্টা খানেক ধরিয়া তাঁহার পশ্চাত্তাপ হওয়ায়, আমাদের গ্রামে সাগরেশ্বর নামক শিবের মন্দিরে যাইয়া আপনার জিভের আধা কাটিয়া তিনি শিবলিঙ্গের উপর উৎসর্গ করিলেন। "মাতোশ্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার বলা অপেক্ষা আমাকে বোবা করিয়া দিলে ভাল হইত," এইরূপ বলিয়া তিনি শিবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। এই ব্যাপারটা নিকটে হওয়ার দরুণ মন্দিরপরিচারিকা দেখিবামাত্র তখনি সম্মুখে আসিয়া সে শিবলিঙ্গের উপর স্থাপিত জিভের টুকরাটা উঠাইয়া লইল ও উহা অগত্য অন্ধকারের মধ্যে ডুবাইয়া পদপত-রাও-ভাউর জিহ্বায় লাগাইয়া দিল। এবং বলিল আর কখন এরূপ করিও না। 'দুই কাহে থাকতেই এ কাজ কেমন করে করতে দিনি' এই বলে তোমার মা আমাকে অভিশাপ করতেন না কি?" কেবল অন্ধকারে ডুবানো চটচটে টুকরাটা জিভে বেশ আঁটিয়া বসিয়াছিল, এইরূপ লোকে বলে। যাক্। পদপত-রাও-ভাউর মাণিক-রাও-আবা নামে একমাত্র পুত্র ছিল। ইনিই আমার পিতামহ ছিলেন। "আবা"র চার পুত্র ও দুই কন্যা হয়; "আবা" উল্লেখ-যোগ্য কোন পরাক্রমের পরিচয় দেন নাই। সম্ভবতঃ ইনামের উৎপন্ন আদায় উসুল করিয়া ইনি নিজের সময়টা দেবীর "পূজা" অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন। আমার পিতামহীই সংসারের সমস্ত কাজ দক্ষতার সহিত দেখিতেন।

চার ছেলের মধ্যে বড় ছেলে মাধব-রাও-আবা-সাহেবের উপরেই পিতামাতার ভালবাসা বেশী ছিল। কারণ তিনি স্বভাবতঃ বুদ্ধিও তেজীয়ানও পরম-মেধাবী ছিলেন, তথাপি আপনার বংশের লৌকিক মর্য্যাদা ও প্রাধান্যের পক্ষে যাহা শোভা পায় সেইরূপ সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্যসহকারে চলিতেন এবং নিজ বংশ সম্বন্ধে তাঁহার খুব একটা অভিমান ছিল। তিনি উদার-চিত্ত ও কর্ম্মঠ ছিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা দেবতার উপর ন্যস্ত ছিল। আনন্দ বা দুঃখের সময় তাঁহার মন কখন চঞ্চল বা অস্থির হইত না। তিনি স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত দেবতার উপর নির্ভর করিয়া সকল অবস্থাতেই শান্তভাবে থাকিতেন, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দীর্ঘপ্রযত্নী ছিলেন। যতই কষ্ট হোক না কেন তিনি হতাশ হইয়া কখনই হাতের কাজ ছাড়িতেন না। তিনি "জ্ঞানেশ্বরী" ও "অমৃতানুভব" পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। নিজ মিত্রমণ্ডলীর সহিত অদ্বৈত মত সম্বন্ধে বারংবার বিচার ও চর্চ্চা করিতেন। তিনি খুব মানী, চতুর ও পাকা হিসাবী ছিলেন। আমাকে ধরিয়া, তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। আমার মায়ের সর্বশুদ্ধ ২০টি সন্তান হয়। কিন্তু তার মধ্যে আমরা ৭ জন মাত্র বাঁচিয়া রহিলাম।

আমার মা "মিরজে"র প্রসিদ্ধ রাজবৈদ্য "রাঘোপন্ত-ভাই কবয়কত্তের" কন্যা। ইঁহারা পাঁচ ভগিনী ও তিন ভাই ছিলেন। আমার মায়ের স্বভাব অতিশয় মায়ালু সহিষ্ণু ও লাজুক ছিল। তিনি প্রায়ই কোন না-কোন

কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে তাঁহার কখনই ভাল লাগিত না। ঘরের কাজে একটু রেহাই পাইলেই তিনি ঔষধ তৈয়ারী করা, চাউল-ভাঙ্গা প্রভৃতি কোন-না-কোন কাজে সময় কাটাইতেন।

আমার মায়ের চিকিৎসার কাজটা বেশ আসিত। কত কত বৎসরের পুরাতন রোগ তিনি চট্ করিয়া সারাইয়া দিতেন। ইহার দরুণ আশপাশের দশ বার গাঁয়ের লোক খুব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। সকল রোগীকেই নিজের খরচায় ও নিজের হাতে সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। রাত্রি দিন, সময়ে অসময়ে, রোগী আসিলে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না; তিনি তখনই উঠিয়া ঔষধপত্র দিতেন; খুব গরীব হইলে তাহাকে পাঁচ সাত দিন দেউড়ীতে রাখিয়া দিয়া দুই বেলা নিজের হাতে পথ্য ও ঔষধ দিতেন। বায়ু রোগ ও উন্মাদ রোগে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সব কাজে আমার পিতার সম্মতি ও সাহায্য ছিল; কারণ এইরূপ পরোপকারের কাজ তাঁহার খুব ভাল লাগিত। "এতে যা লাগে স্বচ্ছন্দে খরচ কর। এই আসল ধর্ম্ম" এই বলিয়া তিনি মাকে প্রোৎসাহিত করিতেন।

আমার পিতা স্বভাবতঃ অতিশয় কর্ম্মিষ্ঠ ও জেদী ছিলেন। সেই দরুণ বাড়ীর লোকের মধ্যে তাঁহার কথায় কাহারও দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইত না। আমার মা পূর্ব্ববয়সে অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজ মিতাচারিতা, সহিষ্ণুতা ও শান্তস্বভাবের দরুণ তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিত; তিনি এইরূপ বুঝিতেন যে, পতিই নারীদের দেবতা, গুরু, সর্ব্বস্ব। তাই তিনি গুরুমন্ত্রও আমার পিতার নিকট হইতেই লইয়াছিলেন। এবং সেই মন্ত্র তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত জপ করিতেন। ১৭৭৩—৭৭ অব্দের দুর্ভিক্ষে, আমার মাতার বড় টানাটানি হইয়াছিল। সেই দরুণ, এত বৃহৎ পরিবারের সংসার চালানো দুই চারি বৎসর বড়ই কঠিন হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি খুব ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। পুত্রকন্যাদিগকে কোনরকম দুঃখকষ্টের কথা জানিতে দিতেন না এবং দৈন্যের দরুণ আমার পিতার নিকট কোনরকম নালিশ করিতেন না বলিয়া তিনি বেশ শান্তভাবে ও ধৈর্য্যসহকারে দিন কাটাইয়াছিলেন। আমাদের সকল ভাইবোনদের এখনো সে কথা বেশ মনে আছে। তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে, স্নেহশীল বন্ধুর মত আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পুরাণ পাঠ শেষ হইলে পর, আমাদের সবাইকে ডাকিয়া খোলা উঠানে বসিতেন ও পুরাণ হইতে দেবদেবীর কথা ও কাহিনী বলিতেন। ইহা দেখিয়া আমার পিসিমা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "আমার উমা-ভগিনীর মনে হয় তাঁর ছেলেরা বড়ই বুদ্ধিমান। তিনি পুরাণ থেকে যে সব কথা বলেন এরা যেন সবই বোঝে। এই সব কথা ওদের কাছে কেন বলা? বয়স্ক লোকদেরও ওসব মনে রাখা কঠিন।" তখন আমার মা বলিতেন যে, "আমি কুকুর বিড়ালের গল্প ত জানিনে, তা আমি এখন কি করি। ঐসব গল্প তুমি তবে বল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভাল বীজ আমাদের ক্ষেতে বোনা আবশ্যক। যে রকম জমি মিলবে সেই রকম অঙ্কুর ধরবে। এইজন্য নিদেন নিজ মুখে দেবতাদের কথা উচ্চারিত হলে আমাদের পুণ্য হবে। আর আমাদের কি করবার আছে?" কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেই সময় আমাদের ভাইবোনদের বয়স অনুক্রমে চার, সাত, আট, দশ এইরকম ছিল। তবু কিন্তু তাঁর বলা একটি গল্প শোনবামাত্রই আমাদের মনে থাকত। নূতন পড়া ও নূতন শোনা গল্প ভুলে যাই, কিন্তু মার বলা এই সমস্ত গল্প একেবারে নূতনের মত আমাদের স্মরণে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

হালাম জাতি।

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে হালাম নামক পার্ব্বত্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কুকী, টীপরা প্রভৃতি জাতির তুলনায় বিশেষভাবে উন্নত। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোকের সংখ্যা অতি অল্প—অধিকাংশ লোকই গৌরবর্ণ। নাসিকা

প্রায় অধিকাংশ লোকেরই খাঁদা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মস্তকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ কেশ, সেই কেশে তাহারা খোঁপা বাঁধিয়া রাখে। গোঁপ দাঁড়ি প্রায় লোকেরই অতি অল্প। পুরুষেরা আজকাল বাঙ্গালীর ন্যায় কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে স্বহস্ত-নির্ম্মিত একপ্রকার ধড়া পরিধান করিত। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই কুকীদিগের ন্যায় খেস্ পরিধান করে। সেই খেস্ কালবর্ণের পরিধান করাই ইহাদের রীতি।

ইহাদের মত সুখী লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহাদের পয়সার দরকার প্রায়ই হইত না, সুতরাং অভাব কাহাকে বলে তাহারা জানিত না। কৃষিকার্য্যে ইহাদের মূলধন দরকার হয় না, আট আনা মূল্যের একখানা টাকল (একপ্রকার দা) লইয়া ইহারা ফাল্গুন মাসের শেষভাগে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। দশ বার বৎসর কালের পুরাতন বাঁশ জঙ্গলই তাহাদের কৃষির উপযুক্ত স্থান। এই জঙ্গল কর্ত্তন করাকে তাহাদের ভাষায় "লৈয়াচুন" কহে। লৈয়াচুন আরম্ভ করিবার দিনে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া তাহারা কার্য্যে ব্রতী হয়।

জঙ্গল কাটিয়া তাহা শুকাইবার জন্য চৈত্র মাস অপেক্ষা করে। তারপর চৈত্র মাসের শেষভাগে কিংবা বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে ঐ কর্ত্তিত জঙ্গলে আগুন দেয়। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ আগুনের উত্তাপে এক ফুট মাটী আল্‌গা হইয়া পড়ে। তারপর সেই মাটীতে ধান, কার্পাস, তিল, চিনার তরমুজ, মগধান, (ভুট্টা) লঙ্কা এবং নানাবিধ তরকারী রোপণ করে। তাহারা টাকলের অগ্রভাগ দ্বারা অল্প মাটী খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ ফেলিয়া দেয়; এখানেই ধরিতে গেলে তাহাদের কৃষিকার্য্য শেষ হইল। জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার এবং আষাঢ় মাসে একবার এই দুইবার আগাছা এবং বাঁশের টেপা (নূতন অঙ্কুর) কাটিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগেই মগধান, চিনার, করলা প্রভৃতি তুলিতে আরম্ভ করে। আজকাল এসকল বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে, হয়ত ইতিপূর্ব্বে পয়সার দরকার ছিল না বলিয়া এই সকল ফসল বিক্রয় করিতে যাইত না। এই সকল ফসল এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, ইহারা নিজেদের ব্যবহারের অতিরিক্তগুলি বিক্রয় করিয়াও শেষ করিতে পারে না। চিনার এবং অন্যান্য অনেক জাতীয় তরকারী নিকটস্থ নালায় ফেলিয়া দেয়।

ভাদ্র মাসের শেষভাগে ধান্য কাটিতে আরম্ভ করে। তারপর ক্রমে ক্রমে তিল, কার্পাস প্রভৃতি ফসল তুলিয়া লয়।

চাউল, ডাউল, তরকারী, মসলা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র বয়নার্থ কার্পাস প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। এজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, ইহাদের পয়সার দরকার হয় না।

অগ্রহায়ণ মাসে বস্ত্রবয়ন ব্যাপার আরম্ভ হয়। একার্য্যের জন্য তাহাদের পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকে। অবিবাহিতা বালিকা এবং স্বামী-পরিত্যক্তা বা বিধবা স্ত্রীলোকেরাই সূতা তৈয়ার ও বস্ত্র বয়ন করে। সূতা তৈয়ারকার্য্যে বৃদ্ধারাও সাহায্য করে। শয়নার্থ পৈরী, পরিধানার্থ খেস্, ধড়া, মস্তকাবরণ ও মশারি বয়ন করে। ইহারা জুমে একপ্রকার নীল উৎপাদন করে, তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকের পরিধেয় খেস্ এবং পুরুষদিগের মস্তকাবরণ রঞ্জিত করিয়া লয়।

ইহারা সাধারণতঃ ছাতা ব্যবহার করে না। এই নীলবর্ণে রঞ্জিত মস্তকাবরণ মস্তকে বাঁধিয়া প্রবল রৌদ্র ও বারিপাতের অবস্থায় ছাতার কার্য্য করে। আজকাল বাঙ্গালীর অনুকরণে অনেকে ছাতা, কোট, কামিজ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু জুমের কার্য্যে যাইবার সময় নহে। জুমের কার্য্যে যাইবার সময় ধড়া ও খেস্ নির্ম্মিত এক প্রকার কোট এবং মস্তকাবরণই ব্যবহার করে। ঐ সকল খেস্ নির্ম্মিত কোটকে তাহাদের ভাষায় "কাকণী" কহে।

লবণের পরিবর্ত্তে ইহারা সময় সময় একপ্রকার কাষ্ঠাঙ্গারসিদ্ধ জল ব্যবহার করে, ইহাকে চাও্‌আল কহে। কাষ্ঠ পোড়াইয়া বহু পরিমাণ অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্ষারজলযোগে তরকারী পাক করে।

পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে ইহারা সমধিক পরিশ্রমী। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনান্তে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই চিরুণী হস্তে কেশ বিন্যাস করে, তারপর আহার করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাহারা তুলের কার্য্যে যায় তাহারা কিছু ভাত তরকারী সঙ্গে লইয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। কন্যার বয়স সাধারণতঃ ১৭।১৮ বৎসর হইলে মদের মজলিসে সুসজ্জিতা কন্যাকে যাইতে দেওয়া হয়। বিবাহার্থী যুবকগণের সাক্ষাতে কন্যার গুণের বিষয় বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করা হয়। তৎপর রূপ-গুণে মুগ্ধ যুবকদিগের মধ্যে কন্যাকর্ত্তা সাধারণতঃ একটা বাছনী করিয়া কন্যার অভিপ্রায় এবং অভিমত গ্রহণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট যুবককে জামাতারূপে মনোনয়ন করে। তারপর বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ের মধ্যে যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা হইলে, জামাই শ্বশুরগৃহে গমন করে। জামতার চারি বৎসরকাল শ্বশুরগৃহে খাটুনি খাটা ইহাদের রীতি। কিন্তু কন্যার রূপগুণের তারতম্যানুসারে খাটনীর হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জামাতার খাটুনী বড় দুরূহ ব্যাপার। প্রাতঃকালে রান্না করা, গুরুজনের পা ধোওয়ার জল দেওয়া এ দুইটী জামাতার প্রধান কার্য্য। তদ্ভিন্ন তুলের কার্য্য করা, উৎপন্ন দ্রব্যাদি দূরস্থানে বিক্রয় করা, এ সকল কার্য্য জামাইকে করিতে হয়। এ সময়ে কোনও বিবাহানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় না বটে, কিন্তু স্ত্রী স্বামী একত্রে শয়ন ও উপবেশন করিতে পায়। অনেক স্থলে এই চারি বৎসরের মধ্যে দুই একটী সন্তানোৎপাদিত হইতেও দেখা যায়। কঠিন পরিশ্রমে বা শ্বশুর কঠোর ব্যবহারে এই সময়ের মধ্যে জামাইকে শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও দেখা যায়। এরূপ স্থলে কন্যাকে অবিবাহিতা বলিয়া গণ্য করা হয়।

জামাই-উঠা ব্যতীত, কন্যা গৃহে লইয়া যাইবার রীতি ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেস্থলে খাটুনীর পরিবর্ত্তে ৪০৲ টাকা পণ দিবার নিয়ম, কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা কন্যার পণ বয়স ও রূপগুণের অনুপাতে ২০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা দিতে হয়।

ইহাদের সামাজিক শাসন বড়ই কঠোর। পুঞ্জীতে একজন সর্দ্দার থাকে, তাহাকে "গালিম" কহে। এই গালিম পুঞ্জীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাহার অধীনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন লোক থাকে, তাহাকে "পাছুর" কহে। ঐ গালিম ও পাছুর সম্মিলিত হইয়া যে ব্যবস্থা বা যে রীতি প্রচলন করিবে, পুঞ্জীর লোককে তাহাই মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

পরস্বাপহরণ ও পরদার এই দুইটী তাহাদের সমাজে গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। আমি নিজে একটী লম্পটের দণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিম্নে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটী লোক তাহার দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃবধূর নিকট কুপ্রস্তাব উপস্থিত করে। অপরাধ সপ্রমাণিত হইলে উক্ত কুপ্রস্তাবকারীকে গালিমের আদেশে হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া গৃহদ্বারে ফেলিয়া রাখা হয়। গৃহাভ্যন্তরে মদের মজলিস্ বসে। পুঞ্জীর অধিকাংশ লোকই ঐ মজলিসে উপস্থিত হয়। ইহারা ঐ মজলিস্-গৃহে আগমন ও নির্গমন সময়ে উক্ত অপরাধীর মুখে পদাঘাত করে। তৎপর ৬০৲ টাকা অর্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যে সমাজে এইরূপ কঠোর শাসনপ্রণালী, বর্ত্তমান সময়ে সে সমাজে তদ্রূপ অপরাধ যে অল্পই ঘটে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরামকুমার দেব কাননগু।

আমার সন্তান পালন।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

রাত্রির পর রাত্রি এই ভাবে চলিতে লাগিল। আর্থার কোন কোন রাত্রে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতেন,—তাহাতে আমি একটু ঘুমাইতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহার রাত জাগিলে চলিবে

কেন? সারাদিন আফিসের খাটুনির উপর সর্ব্বদা রাত জাগা চলে না। সুতরাং জাগিয়া জাগিয়া আমি ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ভোর বেলা—আমাদিগকে সারারাত্রি কষ্ট দিবার পর খোকা নিরুদ্বেগে ঘুমাইত।

তারপর তার দাঁত উঠিতে লাগিল। সে আরো খিটখিটে হইয়া উঠিল, রাত্রিকালে তাহার চীৎকারে বাড়ীতে থাকা দায় হইল। আর্থার এতদিন ধীরভাবে সহিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর সহিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "মেরী, খোকার একটা কিছু করিতে হইবে. আর না হয় আমার শোবার জন্য আর একটা ঘর ভাড়া করিতে হইবে। আমি আর একজন ডাক্তার ডাকিয়া খোকাকে দেখাই। আমার বোধ হয় আমাদের ডাক্তার ভগান শিশু-চিকিৎসায় তেমন দক্ষ নহেন।"

আমি। ডাঃ ভগান বলেন, ওর কোন অসুখ নাই, ওর মেজাজই এইরূপ।

আর্থার। না, আমার বোধ হয় না যে শুধু খারাপ মেজাজের জন্যই খোকা অমন করিয়া কাঁদে। আমার বোধ হয় ওর দাঁতে ব্যথা। ওর দাঁতের মাড়ি ঘসিয়া দিবার মত কিছু আছে কি?

আমি। না গো, কিছু ঘসিতে আমার বড় ভয় করে।

আর্থার। রেখে দেও তোমার ভয়। আমার বেশ মনে আছে আমার মা আমার ভাইবোনদের দাঁতের মাড়ি কি যেন দিয়া ঘসিয়া দিতেন। ধাত্রী অ্যাডাম কি সেই চলিয়া যাওয়ার পর তোমার কাছে আর আসে নাই? কি করিয়া এ চীৎকার থামাইতে হয় সে নিশ্চয় বলিয়া দিতে পারিত।

এই সময় খোকার চীৎকার এতই বাড়িয়া গেল যে তাহা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। আর্থার তখনই তাঁহার টুপি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। এত দিনের যন্ত্রণার সন্তানের প্রতি ভালবাসা আমার শুকাইয়া আসিয়াছিল, আর সহিতে না পারিয়া আমিও তাহাকে বেশ এক ঝাকুনি দিলাম। তাহাতে কান্না আরো বাড়িয়াই চলিল।

এমন সময় আমাদের চাকরাণী সুসান আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, একটী বুড়ো গিন্নী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

আমি খোকাকে নিয়া বিব্রত, ঘর দেখার সব অগোছান, পরনের কাপড় পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল,—আমি মনে করিয়াছিলাম নিশ্চয়ই কোন পেন্সার-পত্নী বুড়ী গল্প জুড়িতে আসিতেছেন, তাই বলিতে যাইতেছিলাম—'না, আমার এখন অবসর নাই'—কিন্তু দরজার দিকে চাহিয়া কি দেখিলাম!—দেখিলাম, অতি প্রিয়-দর্শন, অতি মিষ্টি একখানি মাতৃ-মুখ। এরূপ মধুমাখা চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। ৬০।৭০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। খোকা তখনও চীৎকার করিতেছে—তাহার ফিট হইবার উপক্রম।

বৃদ্ধা শান্তভাবে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে খোকাকে আমার কোল হইতে নিজের কোলে লইলেন:—

"আমার ছেলেপিলে মানুষ করে' অভ্যাস আছে মা, তোমার তা নাই। এই বাড়ীরই পাশের ঘরের ভাড়াটে আমার ছেলে। আমি আমার ছেলে ও বউমাকে দেখিয়া যাইবার জন্য কাল এখানে আসিয়াছি। কিন্তু সত্যি কথা বলিতে কি মা, কাল সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। পাশের ঘরেই আমি শুইয়াছিলাম। এসব বাড়ীর এক ঘরে কথা বলিলে পাশের ঘর হইতে সবই শোনা যায়, আর ছেলের কান্না ত শোনা যাবেই।"

আমি যে ভাবে খোকাকে কোলে করি তা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ধরণে, সুদক্ষ মায়ের মত তিনি খোকাকে লইলেন। দুই ঘোড়া যেমন উপযুক্ত সোওয়ার পাইলেই শান্ত হয়, আমার দুই খোকাও তেমনি বৃদ্ধা মহিলাটীর হাতে পড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চুপ করিল। কোলে লইয়াই তিনি তাঁর আঙ্গুল খোকার মুখে পুরিয়া দিলেন, সেও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁর আঙ্গুল ধরিয়া তাহা মুখেই পুরিয়া রাখিল।

তিনি বলিলেন, "বড় যে ভাবনার কথা মা, ছেলে যে এত কাঁদে, এতো কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। ডাক্তার কি কখনো তোমার ছেলের দাঁতের মাড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ?"

আমি। দু'মাস আগে তিনি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ছেলের মেজাজ খারাপ তাই এমন খিট্‌খিটে হইয়াছে।

বৃদ্ধা। কিন্তু খিট্‌খিটে মেজাজের হইলেই ত আর এমন চীৎকার করে না!

আমি। তারপর আর আমি ডাক্তার দেখাই নাই।

বৃদ্ধা। একটু ভাল মধু আনাইয়া দিতে পার মা ?—আচ্ছা আমি নিজেই নিয়া আসি।

একখানা কম্বলের একটা কোণ দিয়া খোকার মাথা ঢাকিয়া আস্তে আস্তে তিনি তাহাকে আর একখানি কম্বলের উপর শোওয়াইলেন। আমি বলিলাম, "খোকাকে বরং আমার কোলেই দিন্।"

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কখনই নয়। তুমি অনেকক্ষণ কোলে কোলে রাখিয়া বেচারাকে অনেক কষ্ট দিয়াছ। তোমার যদি দাঁতে খুব ব্যথা হয়, আর কেহ তোমাকে হাত পা গুটাইয়া একজায়গায় রাখিয়া দেয়, আর তোমার মাথাটী অমন করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া দেয় তবে তোমার কেমন লাগে ? তা'তে তোমার যেমন কষ্ট হইত, তোমার ছেলেরও এখন ঠিক তেমনি কষ্ট হইতেছে। তোমার ডাক্তারের নাম বলবে মা, আমি তা'হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া আসি যে তাঁকে এখানে একবার আসিতে হইবে।"

আমি তাঁকে আমাদের ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা দিলাম। তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অনেক দিন পর খোকাকে এমন শান্ত হইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া আমার হাড়ে যেন বাতাস লাগিল।

মিসেস্-কার্টার (বৃদ্ধার নাম) অল্পক্ষণ মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার বিকালে আসিবেন। ততক্ষণ আমাদের টেট্‌কা-টাট্‌কা দিয়াই ওকে শান্ত রাখিতে পারিব।"

খোকা তখনো শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এই শান্তি আমার নিকট যে কি অমৃত-সমান মনে হইয়াছিল, তা আর কি বলিব!

তারপর বৃদ্ধা আলাপ জুড়িয়া দিলেন, আমার অজ্ঞাতসারে কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তিনি আমার সন্তান-পালনের প্রণালী সবটা শুনিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, "সময়ে তুমি সব শিখিবে মা! এখন আমার উঠতে হবে। তোমার খোকা জাগিলে তাহাকে কোলে করিও না, বেশ করিয়া গরম কম্বল দিয়া জড়াইয়া রাখিবে। মাথা আমি যেমন ঢাকিয়া দিলাম, ঢাকিয়াই রাখিও। আর চায়ের চামচার এক চামচে ক্যাষ্টরওয়েল তাকে খাওয়াইয়া দিও। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে আর কিছু খাইতে দিও না।"

আমি। মধু দিয়া আমি কি করিব ?

বৃদ্ধা। আর কিছুই করিবে না। আমি তা কিরাইয়া নিয়া যাইতেছি। বিকাল বেলা ডাক্তার আসিবেন, খোকার দাঁতের মাড়ি একটু কাটিয়া দিতে হইবে। তোমাদের দোষেই বাছাকে এই কষ্টটুকু পাইতে হইবে। আমি এরূপ অস্ত্র করার পক্ষে নই; কিন্তু এখন এমন হইয়াছে যে একটু কাটিয়া না দিলে খোকাকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। যখন ডাক্তার আসিবেন তখন আমাকে খবর দিও, আমি আসিব। এর মধ্যে খোকাকে বিছানা থেকে উঠাইও না। বেশ গরম কাপড় দিয়া তাকে ঢাকিয়া রাখিও। ক্যাষ্টর-ওয়েল খাইলে হয়ত মাঝে মাঝে কাঁদিবে, কিন্তু তুমি তাকে বিছানা হইতে তুলিও না। বালিশের নীচে হাত দিয়া বালিশশুদ্ধ ওর মাথা একটু একটু তুলিয়া নাড়িও, কিন্তু গায়ের গরম কম্বল সরাইও না,—খাওয়াইবার সময়ও না। আমাকে বল, তুমি আমার কথা মত কাজ করিবে ?—

আমি। আপনাকে শত ধন্যবাদ! নিশ্চয় আমি আপনি যেমন বলিলেন ঠিক তেমনি করিব।

যেই তিনি চলিয়া যাইবেন অমনি খোকা ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল।—সে যেন বুঝিতে পারিল যে তাহার আরামদায়িনী চলিয়া যাইতেছেন। তাহার কান্না

দেখিয়া আমার মন তিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মিসেস কার্টার স্থির শান্তভাবে তাহার কাছে আসিয়া তাহার পাশ ফিরাইয়া দিলেন, অমনি সে চুপ করিল। তারপর তিনি একটু দুধের সঙ্গে ক্যাষ্টরওয়েল মিশাইয়া একটী ছোট শিশিতে পুরিয়া বালিশশুদ্ধ খোকার মাথা একটু তুলিয়া তাহাকে উহা খাওয়াইয়া দিলেন। প্রথমে সে কতকটা খাইয়া ফেলিল, তারপর খারাপ আস্বাদন বুঝিতে পারিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। কিন্তু তিনি থামিলেন না। যেই সে কান্না বন্ধ করিল, অমনি বাকীটুকু তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বমির চেষ্টা করিল ততক্ষণ মাথা উঁচু করিয়াই ধরিয়া রাখিলেন। একটু পরেই সে বেশ ঘুমাইয়া পড়িল। মিসেস কার্টার যাবার সময় বলিয়া গেলেন, "খোকা এখন বেশ আরামে আছে। ঘুম ভাঙ্গিলেও যা যা করিবার দরকার হইবে, বিছানা হইতে না তুলিয়াই তাহা করিবে।"

বাকী বেলাটুকু বড় আরামে কাটিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এমন আরাম পাই নাই। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,—আগে আমার কেন হুঁস হইল না। আমার দাঁতে যখন ব্যথা হইয়াছিল, কত সাবধানে থাকিতাম, সামান্য একটু কাপড়ের ঘসাও যেন পীড়িত স্থানে না লাগে তাহাই করিতাম। আর এই ক্ষুদ্র শিশুকে আমি না বুঝিয়া এই ক'দিন কত কষ্টই না দিয়াছি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তারকে নিয়া মিসেস কার্টার আসিলেন। আমার মনে যাতে ব্যথা না লাগে এই ভাবে হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বলিলেন,—

"দেখুন, আপনার চাইতে অভিজ্ঞ মা হইলে এইটুকু ঘটিত না। শিশুদের শুশ্রূষা অতি যত্নে করিতে হয়। তাদের পেট যাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, সর্ব্বদা সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। দাঁত বাহাতে নিজে নিজে বাহির হইতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হয়; তাহা না হইলে মাড়ি শক্ত হইয়া পড়িবে, ফুলিবে;—তাহাতে জ্বর ত হইবেই, বহুদিনের হওয়াও বিচিত্র নয়। শিশুদের কোলে কোলে রাখিতে নাই। তাহাদিগকে বেশ গরমে রাখিতে হইবে, নিয়মমত খাওয়াইতে হইবে,—একদিন এক সময়, অন্যদিন এক ঘণ্টা পরে বা আগে খাওয়াইলে চলিবে না। মাঝে মাঝে এক একদিন একটু ক্যাষ্টর-ওয়েল খাওয়াইতে হইবে।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার অস্ত্র বাহির করিয়া সেগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অস্ত্র দেখিয়াই আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কল্পনায় আমার বাছার কচি মুখে অস্ত্রোপচারের কথা ভাবিয়া আমি যেন তাহার মুখে মাড়ি-কাটার রক্ত দেখিতে পাইলাম। ভয়ে আমার মুখ সাদা হইয়া গেল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, "ঐ যাঃ! আমি যে ভুলে দরকারী অস্ত্রের ছোট ব্যাগটী নীচে রাখিয়া অন্যটা নিয়া আসিয়াছি। দেখুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া নীচের ঘর হইতে সেইটা নিয়া আসিবেন? মিসেস কার্টার বুড়ো মানুষ, নামা-উঠা করিতে তাঁর কষ্ট হইবে। আর আপনার খোকা কিটাকে পাঠাবেন না, হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া সে এখনি আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আপনিই যদি নিয়া আসেন!"

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া আমি নীচে চলিয়া গেলাম। ১৫।২০ মিনিট খুঁজিয়াও অস্ত্রের ব্যাগ পাইলাম না। সুলতান নীচে আসিয়া বলিল, ডাক্তার তাঁহার কোটের পকেটে দরকারী অস্ত্রের ব্যাগটা পাইয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখিলাম, ডাক্তার আমার সঙ্গে বেশ একটু চালাকি করিয়াছেন। আমার চেহারা দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, খোকার মাড়িতে অস্ত্রকরিবার সময় কাছে থাকিলে হয় ত আমার কিট হইবে, তাই আমাকে দূরে সরাইবার জন্য তিনি ঐ কন্দী করিয়াছিলেন। আমার অসাক্ষাতেই খোকার মাড়িতে অস্ত্র করা হইয়া গিয়াছে। সে জাগিয়া বেশ শান্তভাবেই আছে। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল যে সে আরামে আছে। আমি তাহাকে কোলে নিতে গেলাম। এমন সময় আমার স্বামী ঘরে ঢুকিয়াই ডাক্তার ও মিসেস কার্টারকে খোকার বিছানার কাছে

দেখিয়া ভয়ে চমকাইয়া উঠিলেন। খোকাকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহার ভয় অনেকটা যেন কমিল। ডাক্তার তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "আপনি কিছুমাত্র ভয় পাইবেন না। কাল থেকে দেখিবেন আপনার ছেলে কত ভাল হইয়া গিয়াছে—যদি তার মার কোলে নেওয়া হইতে তাকে রক্ষা করিতে পারেন। একদিকে তার অতিরিক্ত যত্ন করা হইয়াছে, অন্যদিকে যত্নের ত্রুটী হইয়াছে। যাক, এখন শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যাইবে আশা করি। খোকার খাট কোথায়? তাকে এখন সেখানে শোওয়াইয়া দিই।"

আমি বলিলাম, "খোকা আমাদের সঙ্গেই শোয়, পৃথক খাটে নয়।"

ডাক্তার। না—না, তা কখনো হবে না। আপনি বা মিঃ নর্টন (আমার স্বামীর নাম মিঃ আর্থার নর্টন) তা'হলে বিশ্রাম করিবেন কি করিয়া? ছেলের পক্ষেও তা ভাল নয়। ধাত্রী অ্যাডাম কখনো আপনাদের সহিত এক বিছানায় খোকাকে শুইতে দিয়াছে বলিয়া ত আমার বোধ হয় না!

স্বামী। না—না, ধাত্রী তা করিত না। আমার স্ত্রীই ধাত্রীর বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া খোকাকে আমাদের বিছানায় শোওয়াইতে অভ্যাস করিয়াছেন।

ডাক্তার। মাফ করবেন, স্ত্রীর নিন্দা করিতে আমরা সব পুরুষই মজবুত। যাক্, এমনো গুরুতর অনিষ্ট কিছু হয় নাই। আপনাদের খাটের পায়েই খোকার বিছানা করিবার মতন কোন ব্যবস্থা আপনাদের আছে?

স্বামী। তার আর দরকার কি? আমি অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করিতেছি।

ডাক্তার। না—তা কখনো করিবেন না। এখন হইতে খোকা বেশ শান্ত হইয়াই থাকিবে। আমি কাল আবার আসিব। মিসেস কার্টার খোকার শোবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়া দিতে পারিবেন—তা আমি জানি।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ধাত্রী অ্যাডাম যেমন করিয়া করিত, মিসেস কার্টার ঠিক তেমনি করিয়া দুখানি চেয়ার জোড়া দিয়া খোকার বিছানা তৈরী করিলেন। রাত্রে দুবার আমি খোকাকে খাওয়াইলাম। সারারাত সে বেশ ঘুমাইল। আমার স্বামী বেশ আরামে সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন। ভোর বেলা মিসেস কার্টার খোকাকে দেখিয়া বলিলেন, সে বেশ ভাল আছে। স্নান করাইবার সময় ও জামা পরাইবার সময় সে একটু কাঁদিল। আমি হাসিয়া মিসেস কার্টারকে বলিলাম, "আপনার গম্ভীর চাল চলতি দেখিয়া খোকাও বুঝি আপনাকে সম্মান করিতে শিখিয়াছে। তাই আর কাঁদে না।"

মিসেস কার্টার। তুমি যা বলছ, তা সত্যি, হাসির কথা নয়। যে মুহূর্ত্তে ছেলেরা আমাদের ভাবভঙ্গি বুঝিতে পারে, তখন হইতেই মায়ের কর্ত্তব্য যে তাহার চাল চলতি সন্তানকে বুঝাইয়া দেওয়া। কচি ছেলেদের সঙ্গে ঘাঁমখেয়ালি ব্যবহার—কখনো খুব আদর-উচ্ছ্বাস—আর একটু পরেই কর্কশ ব্যবহার, ধমক দেওয়া—ইত্যাদি কখনই উচিত নয়। আমরা যতটা মনে করি, শিশুরা তার চাইতে অনেক বেশী বুঝে।

আমি। কিন্তু বার মাস না হইলে কি শিশুরা এ সকল কিছু বুঝে? তার পূর্ব্বে কোনরূপ মানসিক শাসনের অর্থ তাহারা নিশ্চয়ই বুঝে না।

মিসেস কার্টার। এ তোমার ভুল মা! তিন মাস বয়স হইলেই শিশুরা যাকে তিনিতে পারে, তাহার খাবার কাছে আসিলে বুঝিতে পারে, আরো অনেক অনেক বিষয় তাহারা বুঝিতে পারে। যদি তুমি শান্তিতে বাস করিতে চাও,—আর জীবনব্যাপী সন্তানের ভালবাসা চাও, তবে এখন হইতে কোমল অথচ দৃঢ়-উচ্চারিত স্বরে সন্তানকে তোমার ইচ্ছার অনুগত করিতে চেষ্টা কর। যখন সে কথা বলিতে পারিবে তখন, কখনো যাহা একবার বলিবে, তাহার অনুনয় ক্রন্দনেও কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন করিও না। তাড়াতাড়ি অবিবেচনার সহিত কিছু বলিও না। কিন্তু একবার যাহা বলিবে তাহা হইতে একচুলও নড়িবে না। তোমার আদেশ দ্বিধাশূন্য ভাবে পালন করিতে অতি শৈশব হইতেই ইহাকে শিখাইবে। (ক্রমশঃ)

জলমগ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা।

[লুসিটানিয়া জাহাজডুবিতে জলমগ্ন একটি স্ত্রী যাত্রী বাঁচিয়া উঠিয়া তাঁহার সে সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর অলিভার লজকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার Raymond or Life & Death নামক গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আচার্য্যের পরলোকগত পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা ও জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে তত্ত্বসকল সন্নিবিষ্ট আছে। পত্রখানি ভাবার্থরূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল]

"যদি বলি যে যাত্রার আরম্ভ হইতেই আমি জানিতাম যে পরিণামে কি ঘটিবে, তবে সে কথা অলীক হইবে, কারণ আমার মনে যে ভাবটুকু আসিয়াছিল তাহাকে ঠিক জানা বলা যায় না। কিন্তু তখনই আমার চেতনার মধ্যে খুব একটা স্পষ্টরকম পূর্ব্বাভাস উদয় হইয়াছিল। যাত্রার আরম্ভে জল ও আকাশের মৃদুহাস্য ভাবেতেই যেন একটা কি প্রচণ্ড ঘটনার সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং মনের ভিতর সর্ব্বদা একটা প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়া থাকায়, যখন জাহাজটা আঘাতের ধাক্কায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল তখন আমি বড় একটা কিছু চমকিত হই নাই। সে সময়কার একমাত্র উগ্রভাব যাহা আমার মনে জাগিতেছে সে শুধু রাগ—যে এমন পাপ কাজও মানুষে করে! এই অদৃশ্য অথচ নিকটবর্ত্তী শত্রু আসিয়া পড়ায় মনে একটা স্বাভাবিক সংগ্রামের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার মনে হয়, অন্যান্য যাত্রীর মধ্যেও যে একটা প্রশান্ত দৃঢ়তা দেখা দিয়াছিল তাহার মূলেও ঐ একই স্পৃহা—মরি তো লড়িয়া মরিব। এই জাহাজডুবিটা তো দৈব-বিপাকে নয়, উহা মনুষ্যচেষ্টার ফল। আমার হাতের বইখানা রাখিয়া দিয়া আমি জাহাজের ওপাশে উঠিয়া গেলাম, সেখানে বোটগুলার চারিদিকে যাত্রীরা জটলা করিতেছিল। সেখানে অনেক কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম, কারণ জাহাজটা ক্রমশঃই বেশী রকম কাৎ হইতেছিল। কিন্তু ভয়ের হুড়াহুড়ি কোথায়ও কিছু দেখা গেল না। আমি আমার ক্যাবিনের মধ্যে গেলাম, জাহাজের একজন চাকর আমাকে একটা Life jacket (রক্ষা কবচ) পরাইয়া দিল এবং বলিল যে ভারি পশমের কোট (fur coat) ছাড়িয়া ফেলাই ভাল। আমি কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া ছাতে ফিরিলাম এবং সেখানে পূর্ব্ববৎ কষ্টে দাঁড়াইয়া একটি অল্প পরিচিত বুড়ো মানুষের সঙ্গে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা স্বাভাবিক সাধনা আছে যাহা আমাদিগকে পাগলের মত জীবন রক্ষার জন্যে লড়ালড়ি হইতে বিরত রাখে। এবং জীবনই হউক মৃত্যুই হউক যাহা আপনি আসিয়া পড়ে তাহার জন্যে প্রস্তুত থাকিতে দেখায়, যাহাতে করিয়া যে সকল প্রাণী ঝাঁকে ঝাঁকে ঠেলাঠেলি চেঁচামিচি করিতে করিতে জাহাজের নীচের তলা হইতে উপরে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে বল্গা দিয়াছে তাহাদের মত আমরা আত্মহারা হই না। মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে আমার পরপারে যাইবার সময় উপস্থিত—অন্ততঃ যতক্ষণ না আমি প্রশান্ত আকাশের নীচে প্রশান্ত সমুদ্রের জলে পড়িয়া সেই ভাসাচোরার, সেই দুঃখ কষ্টের দৃশ্য হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে ভাসিয়া গেলাম। যাহারা ডুবিয়া যাইতেছিল তাহাদের আর্ত্তনাদ, যে খালাসিরা জাহাজের Life Boat (জীবন-তরী) লইয়া জল হইতে লোক তুলিয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের দাঁড়ের ঝুপকাপ, তাহাদের হাঁকাহাঁকি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। আমাকে যে কেহ তুলিয়া লইবে এমন সম্ভাবনা মাত্র দেখা গেল না। তখন আমি নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম "দেখ, অত আশা ত্যাগ কর, সময় হয়েছে, পারে যাবার সময় এসেছে!" কিন্তু তবুও ভিতর হইতে ক্রন্দনরত কে যেন বলিতে লাগিল, "না, এখনও না।" পাংচিলের জল মাথার উপরে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে নীল সমুদ্রের রঙের ছায়া তাহাদের

সাদা পালকের উপর পড়িয়া কেমন দেখাইতেছিল। তাহাও আমি নজর করিতেছিলাম। তাহারা সুখে প্রাণের স্ফূর্তিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আমার মনে কেমন উদাসভাব আসিতে লাগিল। আমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি মন ধাবিত হইল, তাহারা আমার পথ চেয়ে বসিয়া আছে। তাহারা হয়তো এখন বাগানে বসিয়া চা খাইতেছে। যখন আমার জন্য তাহাদের শোকের কথা মনে হইল তখন সেটা অসহ্য হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। কত রকম বই এর নাম আমার মাথার ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল, বিশেষতঃ একটা—যাহার নাম "Where no fear is" —ঠিক আমার মনোভাবের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। আমার সে সময়কার ভাব 'উদাস' বলিতে পার—পরের শোকে কাতর বলিতে পার কিন্তু আমার মনে ভীতি ছিল না। আমার এই মনোভাব নিতান্তই সময়োচিত ও স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেমন করিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে হয় ঠিক তাহাই। তাহা হইবে না কেন, যেহেতু ভাবটা স্বাভাবিক। মনে হইতে লাগিল যে ওপারের কাহারও সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বেশ হইত, ভাবিতে লাগিলাম সেখানে এমন কি কেহ নাই যাহারা অচেনা অভ্যাগতকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিবে? উভয় লোকের মধ্যেকার সীমানার খুব কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় একটা দল-ছাড়া Life Boat নিঃশব্দে আমার পিছনদিক হইতে আসিয়া পড়িল, তাহার মধ্য হইতে দুইজন খালাসী ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া লইল! আশ্চর্য্য, আমার মৃতপ্রায় জীবন কত বেগে ফিরিয়া আসিতে লাগিল! বোটের মধ্যে সকলেই স্থির ও সংযত দেখিলাম, যদিও তাহাদের মধ্যে একজন মৃত ও একজন পাগল হইয়া গিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক চা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল—সে আকাঙ্ক্ষা অভাবনীয় রকমে শীঘ্রই পূর্ণ হইল, কারণ Queens Town হইতে একটি mine-বহা জাহাজ আসিয়া পড়িল। ঐ জাহাজটার নাম মনে নাই, কিন্তু তাহার লোকজনের দয়া ও সৌজন্য কখনও ভুলিতে পারিব না, তাহারা আমাকে শুকনো গরম কাপড় দিয়া সমূহ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া তুলিল।

কাল্পনিক কলমে বর্ণনা করিবার আমার বড় একটা ক্ষমতা নাই। পত্রপারের সীমার নিকটে গিয়া ফিরিয়া আসায়, এ সীমানা সর্ব্বদা আমাদের কত কাছে অনুভব করিতে পারায়, মনে আমার একটা বড় আনন্দ হইতেছে, দৈনিক কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় সেটা সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। আমার পক্ষে যে মৃত্যুর দ্বার বন্ধ ছিল, সেদিন তাহার মধ্যদিয়া অপর অনেকে চলিয়া গেল। আমার ধারণা তাহারা সে সময় মোটেই ভীত হয়নি, আমারই মত তাহাদেরও নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল যে যাহাই আসুক না কেন তাহা সুন্দর, তাহা পূর্ণজীবনের পরিণতি মাত্র। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অন্ততঃ রোগের অবস্থায় ব্যতীত পরপারে যাইবার কোন কষ্ট নাই। অনন্ত জীবনের সোপানে ইহা একটী ধাপ মাত্র। (ভারতবর্ষিনী)

শ্রীসংঘা দেবী।

পশুশালায় পশুচিকিৎসা।

সেদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এক বাঘের নখ কাটা হইয়াছিল। ছুরিতে লোকে যেরূপ শান প্রদান করে, বন্য অবস্থায় সিংহ ব্যাঘ্র সেইরূপ আপনাদের নখ গাছে অথবা পাথরে ঘসিয়া তীক্ষ্ণ করে ও সেই ঘর্ষণে নখ অধিক বৃদ্ধি হইতে পায় না। পশুশালায় আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা সে কাজ করিতে পারে না। সেজন্য তাহাদের নখ কেবল যে অধিক বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, কখন কখন বৃদ্ধি হইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। আলিপুরের ব্যাঘ্রটীর নখ মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সেজন্য তাহার ঘোরতর যন্ত্রণা হইয়াছিল। নখ না কাটিয়া দিলে ব্যাঘ্র বোধ হয় মরিয়া যাইত।

আলিপুরের বাগানে যে ঘরে এই ব্যাঘ্রটী বাস করে, তাহার নিকটে এক ছোট কামরা আছে। কৌশল করিয়া লোকে বাঘকে প্রথম এই ছোট কামরাতে লইয়া গেল। তাহার পর সেই কামরা তাহারা ক্লোরোফর্মের ধূমে পরিপূর্ণ করিল। ক্লোরোফর্মের ধূমে নিশ্বাস লইয়া বাঘ অচেতন হইয়া পড়িল। তখন ডাক্তার বাঘের পাঁড়িত পা রেলের ভিতর দিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। যে নখ মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। ব্যাঘ্র এক্ষণে সুস্থ হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে।

ইংলণ্ডে লণ্ডন নগরে এক বৃহৎ পশুশালা আছে। একবার এ স্থানেও এক ব্যাঘ্রের নখ বৃদ্ধি হইয়া মাংসের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল ও সে নখ কাটিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে অস্ত্রচিকিৎসার সময় ব্যাঘ্রকে অজ্ঞান করা হয় নাই। ফাঁস দ্বারা পা আবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরের বাহিরে তাহারা টানিয়া আনিয়াছিল। ব্যাঘ্র ভয়ে ও রাগে রেল কামড়াইতে লাগিল। সেজন্য দুই খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া রাখা হইল। নখ কাটিবার জন্য বৃহৎ এক অস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

লণ্ডনের পশুশালায় জম্বো নামক আফ্রিকা দেশীয় বৃহৎ এক হস্তী ছিল। বাল্যকালে জম্বো এ স্থানে আসিয়াছিল। লোকে দেখিল যে, অবরোধে তাহার চারিটী পা কৃশ হইয়া গিয়াছে। পশুশালার রক্ষকগণ প্রথম তাহার পায়ের চিকিৎসা করিলেন। বালক জম্বো সে বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করিল। সেজন্য তাহাকে প্রহার করিয়া মানুষের বশ করিতে হইয়াছিল।

কুড়ি বৎসর বয়সে জম্বো একটী উচ্চ বৃহৎ হস্তী হইল। বৎসরে একবার সে মত্ত বা পাগল হইত। তখন ঘর দ্বার সম্মুখে যাহা কিছু পাইত, বৃহৎ দন্ত দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিত। সে সময় স্কট নামক এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাহার নিকট যাইতে পারিত না। স্কটকে সে ভালবাসিত, তাহাকে কিছু বলিত না। একবার উন্মত্ত অবস্থায় জম্বো লৌহার পাতের উপর আপনার দাঁত মারিয়াছিল। তাহাতে তাহার দুইটী বড় দাঁতই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হস্তীদের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে পুনরায় বৃদ্ধি হয়। মানুষের যেরূপ নখ বৃদ্ধি হয়, জম্বোর ভগ্ন দুইটী দাঁতও সেইরূপ পশ্চাৎ হইতে বাড়িতেছিল। কিন্তু কপের পাশ দিয়া বাহির না হইয়া চক্ষুর নিম্নে মাংস ভেদ করিয়া তাহারা বাহির হইতে চেষ্টা করিল। তাহাতে মুখের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ ফোড়া হইল। হস্তীর ঘোরতর যন্ত্রণা হইল। রক্ষক হস্তীর নিকট যখন করিলে, কোথায় ব্যথা হইয়াছে, শুঁড় দিয়া সে তাহা দেখাইতে লাগিল। ফোড়া অস্ত্র করিবার নিমিত্ত রক্ষক বৃহৎ এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথমে একদিকের ফোড়া তিনি কাটিয়া দিলেন। তাহা হইতে দুর্গন্ধবিশিষ্ট একরাশি পূঁজ নির্গত হইল। হস্তী প্রথম চীৎকার করিয়া উঠিল ও ঘরের এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু রক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল না। পরদিন দ্বিতীয় ফোড়া কাটিবার সময় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ফোড়ার ক্ষত যখন ভাল হইয়া গেল, তখন দন্ত দুইটী সেই পথ দিয়া বাহির হইল, কপ দিয়া বাহির হইল না।

লণ্ডনের পশুশালায় অনেক গণ্ডার আছে। সচরাচর গণ্ডারের নাসিকার উপর একটী খড়্গ থাকে; কিন্তু আফ্রিকার এক জাতীয় গণ্ডার আছে, তাহাদের মস্তকে দুইটী খড়্গ হয়। গণ্ডার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পশু। ইংলণ্ডের শীত ইহারা সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য শীতকালে ইহাদিগকে উষ্ণ ঘরে লইয়া যাইতে হয়। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাওয়া বিপদের কথা। গণ্ডারের দুই দিকে লোকে দড়ি ধরিয়া থাকে। দক্ষিণ দিকে দৌড়িতে চেষ্টা করিলে বাম দিকের লোক তাহাকে টানিয়া রাখে। বাম দিকে ঝুঁকিলে দক্ষিণ দিকের লোক টানিয়া রাখেন। কিন্তু ইহাতেও বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। মানুষের বলকে অতিক্রম করিয়া গণ্ডার কখন কখন সম্মুখ দিকে ধাবিত হয়। তখন যে কেহ সম্মুখে পড়ে, তাহার প্রাণসংশয় হয়।

এই পশুশালায় দুই খড়্গবিশিষ্ট এক গণ্ডার সর্ব্বদা আপনার খড়্গ দ্বারা লৌহ রেলে আঘাত করিত। তাহাতে তাহার একটী খড়্গ ভগ্ন হইয়া মাংসের ভিতর

প্রবেশ করিতে লাগিল। রক্ষক দেখিলেন যে, সে খড়্গটী কাটিয়া না দিলে গণ্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সে খড়্গ কাটিয়া দেওয়া হইল।

গণ্ডারের ন্যায় জলহস্তীও বৃহৎ পশু। আফ্রিকার হ্রদ ও নদীতে ইহাদের বাস। রাত্রিকালে উপরে উঠিয়া অনেক স্থানে ইহারা মানুষের শস্য ভক্ষণ করে।

ইহার মুখ ব্যাদান করিলে ভয়ঙ্কর গহ্বরের ন্যায় দেখায়। লণ্ডনের পশুশালায় একবার জলহস্তীর দন্তরোগ হইয়াছিল। সাঁড়াশি দ্বারা রুগ্ন দন্তটী ধরিয়া রক্ষক টানাটানি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জলহস্তী মাঝে মাঝে মুখের কটকা মারিতে লাগিল ও রক্ষকের হাত হইতে সাঁড়াশি টানিয়া লইতে লাগিল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে রক্ষক অবশেষে দন্ত উৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী)

ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ।*

রাণী ভবানী আমাদের দেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী। দূর-অতীতের লোক তিনি নহেন, মাত্র দেড় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে এই ক্ষণজন্মা নারীর আবির্ভাবে বঙ্গমাতা ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যনামের আশ্রয়ে সংস্থাপিত যে বিদ্যালয়—তাঁহার ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ—আমার পক্ষে যেমন শ্লাঘার বিষয়—তেমনি সৌভাগ্যেরও কথা। যাঁহারা আজ আমাকে আহ্বান করিয়া এই সম্মানের আসন প্রদান করিয়াছেন,—তাঁহারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ আমার পক্ষে একেবারেই নূতন কার্য্য নহে। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেজদাদা মহাশয়ের বোম্বাই প্রবাসকালে আমি যখন তাঁহার নিকট গিয়া বাস করিতাম—তখন মাঝে মাঝে এরূপ কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতে হইত। কলিকাতাতেও ইতিপূর্ব্বে আমি দু'একবার প্রাইজ দিয়াছি। শিক্ষামন্দিরে, এইরূপ উৎসব অনুষ্ঠানের সহযোগীরূপে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতে হৃদয় কি অপূর্ব্ব আশা ও আনন্দে ভরিয়া উঠে! কারণ-ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র।

আজকাল শুনিয়া আসিতেছি, একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, বিদ্যায়, চরিত্রবলে, সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু আজি ইহা ইতিহাসের কথা, অতীতের গর্ব্ব, নিদ্রিতের স্বপ্ন। কিন্তু তথাপি সেই অতীতও বর্ত্তমানরূপে প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্ন সত্যের আকারেই বিভাসিত হইয়া উঠে, যখন ছোট ছোট মুখে—তাহাদের মনের ভবিষ্যৎ আশা-উৎসাহের প্রতিবিম্ব বিম্বাকাশে নক্ষত্ররাজিস্ফুরিত আলোকের মতই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে দেখি।

এই বালকেরা—যুবকেরা যে একদিন পুরাতন নূতন করিয়া তুলিবে, অনেকে বলেন, এ আশা আমাদের দুরাশা মাত্র; কিন্তু আমি বলিতেছি—সেদিন আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে। যে বাঙ্গালী কিছুদিন পূর্ব্বে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহারাই কি আজি সৈনিক বেশে বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে না? শিক্ষা, সুযোগ, অবসরের মাত্র অপেক্ষা। আশানুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই বালকগণই যে একদিন জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাঁহারা এই বালকদিগকে মানব গঠন করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের যত্ন পরিশ্রম কখনই বিফল হইবে না। ভগবান কল্পতরু, একান্ত মনে তাঁহার নিকট যাহাই ভিক্ষা কর—তাহাই তিনি প্রদান করেন। কেবল সাধনা,—একাগ্র সাধনা, প্রাণপণ সাধনাই চাই!

এই উপলক্ষে আর একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিলে, বিদ্বন্মণ্ডলী ক্ষমা করিবেন।

---

* কলিকাতা রাণীভবানী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিত।

বিদ্যামন্দির-যাত্রী পুরুষদিগের সহযাত্রী হইতে হইবে মহিলাদিগকে। শিক্ষাপ্রবুদ্ধ নারীগণ, মাতৃগণ যদি জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে পথ দেখাইয়া চলেন তবেই ত দেশব্যাপী উন্নতির পথ নির্ব্বিঘ্ন ও সুগম হইয়া উঠিবে।

অতীতের সে কি মোহন দৃশ্য! নরনারী একত্র তপোবনে, শিক্ষামন্দিরে, বিদ্যাসাধনা করিতেছেন। পিতা ভ্রাতা কন্যা পুত্র গুরু হইয়া সকলে মিলিয়া বেদ গান গাইতেছেন, শাস্ত্ররচনা করিতেছেন, স্তোত্র পাঠ করিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন, তপোবনে সেই পুণ্য মিলন-প্রীতিতে আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, আর স্মৃতিপটে অঙ্কিত সেই চিত্র দেখিয়া মানবনয়ন পুলকে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যদিকে রাজসভায় পণ্ডিতা নারী গার্গি সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া নির্ব্বাক্ করিয়া তুলিয়াছেন। বিদ্যাবতী প্রতিভাময়ী খনা স্বামীকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরাস্ত মানাইবার তরে আত্মত্যাগী; কিন্তু প্রাণদানে তিনি স্বামীর খ্যাতি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানি না;—এই ত্যাগ-মহিমায় তাঁহারই বিদ্যাগৌরব ভারতের কথায়, গাথায়, ইতিহাসে, উপাখ্যানে অক্ষয় অমর অক্ষরে কোদিত হইয়া গিয়াছে। আবার দেখ, শঙ্করাচার্য্য যখন মিশ্রের সহিত পাণ্ডিত্যবিচারে বিচারক মানিয়াছেন কাহাকে? না, তাঁহারই প্রতিদ্বন্দ্বীর পত্নীকে। নারীর প্রতি এ কি প্রগাঢ় সম্মান, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ সাধুতার প্রতিই বা কি অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

শিক্ষার দীক্ষায় পুরুষের সহিত নারীশক্তি যখন এইরূপ সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবে তখনই কলিযুগে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু এ আশা কি সত্যই দুরাশা? এ কল্পনা কি কেবলই স্বপ্নমাত্র? কখনও না। সেদিন বেশী দূরবর্ত্তী নহে, এই তরুণ যুগের সদ্য উদ্ভাসিত আলো-কণা তাহারই সূচনা মাত্র। তাই নব-রবিকরোজ্জ্বল সুপ্রভাতে মায়ের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণ এই আশ্বাস-গীতি গাহিয়া উঠিয়াছে;—

কেন মা এখনো রাশি, অশ্রু তোর দুনয়নে?
সমুদিত নবরবি হের গো গগন ঘনে!
তব কুসন্তান যত, অন্ধকার অন্তরত
এনেছে দুর্ভাগ্য যারা হীন স্বার্থ আচরণে,—
নাশিতে তাদের কর্ম্ম, লইয়া মহান ধর্ম্ম
শোভিছে তোমার অঙ্কে দেবাত্মা মহাত্মাগণে!
সেই যুধিষ্ঠির, রাম—কেবল নূতন নাম—
নবযুগ অভিরাম সত্য কলি সন্নিসনে!
বশিষ্ঠ ভাস্কর আর্য্য, করিছে বিশ্বয় কার্য্য,
বিতরিছে মহাজ্ঞান ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে!
মহত্বে নাহিক ভেদ, শূদ্র, নারী পায় বেদ,
মানবের অধিকার বর্দ্ধিত মানব মনে!
শচী লক্ষ্মী সরস্বতী, নারীরূপে মূর্ত্তিমতী
বাল্মীকি ও কালিদাস—পাশে বসে মুগ্ধ মনে!
চাহি তব ম্লান মুখে, ডাকিয়া বিদীর্ণ বুকে
পেয়েছি তাঁহার সাড়া এ মঙ্গল সুস্বপনে!
জানিনা ত এ মহিমা—হেরিতে রহিনু কি না?
সত্য তবু এ কল্পনা, তোমার কুমারী ভনে।

বৎসগণ, তোমরা আমাদের বর্ত্তমানের আনন্দ, ভবিষ্যতের আশা, ভগবান তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হউন,—বৃহস্পতি গুরুর শুভদৃষ্টি তোমাদের উপর পতিত দেখিতেছি, চিরদিন তিনি তোমাদের তুঙ্গে বিরাজিত থাকুন; তোমরা সৌভাগ্যশালী হও, দীর্ঘ-জীবন লাভ কর; এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে, জ্ঞানে ধর্ম্মে, কল্যাণ-কর্ম্মে ভারতের যশস্বী সন্তান হইয়া জন্মভূমির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য্য হও—ইহাই আজিকার দিনে আমার আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদী একজন পরিচিতা বা অপরিচিতা নারীর মৌখিক উক্তি মাত্র নহে। আজ আমি তোমাদের জননী জন্মভূমির প্রতিনিধিরূপে সমাগত হইয়া এই যে পারিতোষিক তোমাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছি—তাহা বাস্তবিকই ঐকান্তিক শুভকামনা পূর্ণ। এই কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত পারিতোষিক ভবিষ্য জীবনের তোমা-দের উচ্চতর আশা আকাঙ্ক্ষার পথ উন্মুক্ত ও প্রসা-রিত করিয়া তুলুক—সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ } আষাঢ়—শ্রাবণ, ১৩২৪। } ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা।

গত জানুয়ারী মাসে দীল্লি নগরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌সন্স) মহোদয়গণের এক আলোচনা সভা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই আলোচনা সভার (Conference) রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি এতদিনে এত সামান্য কেন হইল আলোচনা সভার সভ্যগণ প্রথমে তাহার আলোচনা করেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ কিরূপ, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, শিক্ষাধ্যক্ষগণ বলেন, কোন কোন প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বাস্তবিকই আগ্রহ জন্মিয়াছে। মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশে মেয়েদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার আগ্রহ বেশ দেখা যায়। মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটী ও মিশনারীদিগের বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে। পঞ্জাবেও ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। আসামে স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহ বেশ আছে, স্কুলের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে ছাত্রীসংখ্যা অনেক বাড়িবে। অনেক মেয়েই সামান্য কিছু শিখিয়াই স্কুলে আসা ছাড়িয়া দেয়। ইহাও মন্দ নয়। এই উপায়ে ক্রমে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হইবে। কতকগুলি প্রদেশের লোক স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি উদাসীন। মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) প্রাইমেরী শ্রেণীর উপরে মাত্র দুই

হাজার মেয়ে পড়ে। গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াও জনসাধারণের মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে পারিতেছেন না। যুক্তপ্রদেশেও (United Provinces) লোকে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন এবং ইহার গতি অতি মন্দ। ব্রহ্মদেশে অবরোধ প্রথা নাই, বালক বালিকা এক সঙ্গে এক স্কুলেই পড়ে, সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা বেশ বিস্তার লাভ করিতেছে। বিহার প্রদেশে বালকবালিকাদের এক স্কুলে পড়িতে দিতে আপত্তি দেখা যায়, কিন্তু ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় এরূপ আপত্তি প্রায় নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশে ভদ্রলোকগণ সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন। ছয় হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের মেয়েদের স্কুলে পড়িবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা দেখা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন অতি সামান্য। মুসলমান শিক্ষয়িত্রীদ্বারা পরিচালিত স্বতন্ত্র স্কুল না হইলে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িবে কিনা সন্দেহ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই বালক ও বালিকাদের পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদিগকে একই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বসিতে দেওয়া হয়, কারণ তাহাদের বর্ণমালা পৃথক পৃথক।

বালিকা বিদ্যালয়গুলির কর্ত্তৃত্বভার কাহার হাতে থাকা উচিত এবিষয়েরও আলোচনা হইয়াছিল। মান্দ্রাজের ডিরেক্টর মহোদয়ের মতে বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব লোকেল বোর্ডের হাতে দেওয়া ভাল। বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর বলেন, বোম্বাইয়ের যে যে স্থানে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কমিটীর উপর অর্পণ করিয়াছেন সেখানেই বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে দেখা গিয়াছে। যুক্ত প্রদেশেও এই অবস্থা। বঙ্গদেশের ডিরেক্টর মহোদয় গবর্ণমেণ্ট-বালিকাবিদ্যালয় বাড়াইবার পক্ষে নহেন। বোর্ডের হাতে ভার দেওয়াই তিনি ভাল মনে করেন। ব্রহ্মদেশে বালক-বালিকার শিক্ষা এক সঙ্গে জড়িত, স্থানীয় কমিটীর উপর ভার দিলে উভয়েরই ক্ষতি হইবে—ডিরেক্টর মহাশয়ের এই মত। মোটের উপর ইহাই স্থির হয় যে, সকল প্রদেশেই স্থানীয় কমিটীর উপর শুধু পরামর্শ দানের ভার রাখিয়া কর্ত্তৃত্বভার গবর্ণমেণ্টের হাতে রাখাই ভাল।

তারপর পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সাইন্স্-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে বোম্বাইয়ের শিক্ষাধ্যক্ষ বলেন, এদেশের মেয়েদিগকে গৃহধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম বিদ্যালয়ে শিখাইবার তেমন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিলাতের অবস্থা আর এদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে গৃহশিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যালয় গ্রহণ করিতেছে। এদেশে তাহা নহে। মোটের উপর ইহাই স্থির হয় যে, বালিকা বিদ্যালয়ে বালকদিগের স্কুলের ন্যায় সাধারণ শিক্ষাই দেওয়া উচিত, তবে তদপেক্ষা পাঠ্য একটু সোজা করা ভাল, এবং সাইন্স্ কর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে যৎসামান্য শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্ত্তে, স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর প্রচলন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষয়িত্রীর অভাবে সকল প্রদেশেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বাধা জন্মিতেছে, সকল শিক্ষাধ্যক্ষই এই মত প্রকাশ করেন।

শিক্ষাধ্যক্ষদিগের সভায় রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা।

উপরে শিক্ষাধ্যক্ষদিগের যে সভার কথা আলোচনা করা হইল রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সেই সভায় একটী প্রাথমিক বক্তৃতা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। আমরা সেই বক্তৃতার দুএকটী কথা এখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। রাজপ্রতিনিধি বলেন,—শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ ও সহানুভূতি নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডেও শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের নিতান্তই উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করা যায়, বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। ভারতবর্ষেও শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সাধারণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধি বলেন,—এদেশের সামাজিক রীতিনীতি স্ত্রীশিক্ষার কতটা বাধা জন্মায় আমা অপেক্ষা আপনারা তাহা বেশী জানেন। কিন্তু শিক্ষার পার্থক্য বশতঃ এদেশের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে অসমতা জন্মিতেছে তাহা ভয়ের কথা। যে দেশের স্ত্রীজাতি পুরুষগণ অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ে এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে সে দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। আমার বোধ হয়, এদেশের শিক্ষিত লোকগণও এ বিষয়ে আমার সহিত একমত। এ দেশের সামাজিক রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া যতটা পারা যায় স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে যত্নবান হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। ক্রমে ক্রমে লোকের মতও পরিবর্ত্তিত হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। এবিষয়ে এদেশের স্ত্রীজাতির সাহায্যও বিশেষ আবশ্যক। কারণ আসল কষ্টক কোথায় তাঁহারাই তাহা ভাল জানেন। শুধু পুরুষনির্দ্দিষ্ট পন্থায় সফলতা অসম্ভব।

ইংরেজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে রাজপ্রতিনিধি বলেন ;—বর্ত্তমান সময়ে আমরা ইংরেজীর সাহায্যে এদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করি। তাহার প্রধান কারণ ইংরেজী না জানিলে চাকরী পাওয়া যায় না ; আর এক কারণ দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় না। ইহার ফল সুস্পষ্ট। অতি কঠিন কঠিন বিষয় ছাত্রেরা বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করে ;—ভাষার অর্থই সব সময় তাহাদের নিকট পরিষ্কার হয় না, সুতরাং না বুঝিয়াই অনেক বিষয় মুখস্থ করে। আমরা এই মুখস্থ বিদ্যার নিন্দা করি. কিন্তু আমার ত মনে হয়, ছাত্রদের পক্ষে ইহা প্রশংসারই কথা। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাহারা এই কঠিন কার্য্য সাধন করে ;—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, এমন কি সমস্ত পুস্তকই মুখস্থ করিয়া ফেলে। সে দিন আমি এদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত এ-বিষয়ে কথা বলিতেছিলাম ; তিনি এবিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস পড়িবার সময় পুস্তকের ভাষা ভাল বুঝিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি সমস্ত পুস্তক খানাই মুখস্থ করিয়া ফেলেন। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময় এমন একটী প্রশ্ন আসিল যে, কোন্ খান হইতে যে উত্তর আরম্ভ করিতে হইবে পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া যে পৃষ্ঠায় ঐ বিষয়টী ছিল তাহার সমস্তই তিনি লিখিয়াছিলেন। ফলে নম্বর কম পাইলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পরীক্ষক শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, প্রয়োজনীয় উত্তরের বাহিরের অনেক কথা লেখা হইয়াছে, তাই নম্বর কম দেওয়া হইয়াছে। আপনারা এবং আমি সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছি,—নিজেদের কথা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব যে ভিন্ন দেশীয় ভাষার সাহায্যে যদি আমাদিগকে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইত তবে আমাদের কি অসুবিধাই না হইত ! হয়ত হতাশ হইয়া আমরা বিদ্যা উপার্জ্জনের চেষ্টাই ছাড়িয়া দিতাম। যে সকল বালক শিক্ষালাভের এই দুরতিক্রম্য বাধা দূর করিবার জন্য বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করে আমি তাহাদের প্রশংসা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই কুপ্রথা দমন করিবার জন্য এই দুইটীর মধ্যে একটী উপায় গ্রহণ করিতে হইবে—১ম—যতদূর পর্য্যন্ত পারা যায় দেশীয় ভাষায়ই শিক্ষা দিতে হইবে। দেশীয় ভাষায় যখন কুলাইবে না তখনই ইংরেজীর সাহায্য লইতে হইবে। ২য়—অথবা ভাল করিয়া ইংরেজী শিখাইবার জন্য অত্যধিক চেষ্টা করিতে হইবে। যুদ্ধনিবৃত্তির পর এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

নারীর ব্যবসায়াত্মিকা শিক্ষা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা মান্দ্রাজের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কুমারী ডিলাহের একটী বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম। এই বার নারীর ব্যবসায়াত্মিকা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিব।

তিনি বলেন—কতকগুলি মেয়েকে সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া শিক্ষাদানাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত

থাকিতেই হইবে। আমিও ঐ শ্রেণীরই একজন। আমি জানি, অনেকের সঙ্গে আমার মতের মিল হইবে না; আর আমার নিজেরও ব্যক্তিগত মত এই যে সুখজনক বিবাহ হইলে নারীগণ বিবাহিত জীবনে যেমন সুখী হইতে পারে অবিবাহিত থাকিয়া কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলে তেমন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে সকল মহিলা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহের পথ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাদান, চিকিৎসা, শুশ্রূষাকারিণীর কাজ প্রভৃতি অবলম্বন করে তাহারা অনেকটা স্বার্থত্যাগ করে। অনেক ভারত-নারীর এরূপ ত্যাগস্বীকারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এদেশের নারীদিগের সেবার জন্য এদেশীয় শিক্ষয়িত্রী, মেয়ে-ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীর বিশেষ আবশ্যক আছে। আর এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে অবিবাহিত থাকা আবশ্যক। নতুবা সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া এসকল কাজ করা যায় না। এই সকল ব্যবসায়ে প্রবেশার্থিনী নারীগণ পুরুষদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না, বিবাহিতা নারীগণ অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য করিতেছেন বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। নারীর কল্যাণসাধন-প্রয়াসিনী এই সকল নারীর ত্যাগস্বীকারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চক্ষে না দেখিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান করাই পুরুষদিগের কর্ত্তব্য।

ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ।

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজে ছাত্রদিগের এক বিতর্ক সভায় কয়েকটী কলেজের ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল। বাংলাদেশের মত মান্দ্রাজে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন নাই। কুমারী ডিলাহে বলেন, ছাত্রীরা সেই সভা হইতে ফিরিয়া গিয়া দুঃখ করিয়া তাঁহার নিকট বলিয়াছিল, যুবকেরা আমাদের অবস্থা বুঝে না, আমাদের অবস্থা না বুঝিয়াই তাহারা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা বড়মানুষী করিবার জন্য লেখাপড়া শিখি। তাহারা বুঝে না, যে আমাদের সম্মুখেও আদর্শ আছে, আমরাও স্বদেশ এবং স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি।

যুবকগণ যে তরুণীদিগের এই সকল আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝিতে পারে না তাহার কারণ,—এদেশে ভাইবোনের মধ্যে উচ্চ বিষয়ের কোন আলোচনা নাই। বোনটী বার বৎসরের হইলেই তাহার সঙ্গে ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা একপ্রকার শেষ হয়। তাহাদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান আর হয় না বলিলেই চলে। এই যখন অবস্থা তখন তরুণীদিগের মনের ভাব যুবকগণ যে বুঝিতে পারে না ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

নারীর অবস্থা—ইউরোপে ও ভারতবর্ষে।

সরোজিনী বলেন,—

রুষিয়ার দুইশত নারী রণবেশে বন্দুক স্কন্ধে করিয়া ভজনালয়ে সমাগত—"অপমান অপেক্ষা মরণ ভাল" "দেশদ্রোহীকে বিবাহ করিও না" ইত্যাদি কথা অঙ্কিত পতাকা তাদের মস্তকের উপর উড্ডীয়মান—বহুসহস্র নারী ও অযুত পুরুষ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য উপনীত—ধর্ম্মযাজক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "শরীরের রক্ত দিয়া, জন্মভূমির চরণে হৃদপিণ্ড অর্পণ করিয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা কর, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন।"

রক্ষণশীল রুষিয়ায় ইহা এক অভিনব ব্যাপার। নারী যুদ্ধ করিতে যাইবে, ইহা শুনিলে যে রুষিয়া ধর্ম্ম গেল সমাজ গেল বলিয়া শিহরিয়া উঠিত, সেই রুষিয়া নারীসৈন্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছে।

রুষিয়ায় আজ যাহা নূতন—বহু শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে তাহা সাধারণ ছিল। চাঁদবিবি, দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ এই ভারতক্ষেত্রে কি ভীষণ রণই করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী সদাকৌর প্রভৃতি নারী রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনাবেশে কি অদ্ভুত শৌর্য্যই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতের নারী বহু পূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন, রুষিয়ার আজ তাহাই হইতেছে, ইহা দেখিয়া জগতে চমক লাগিয়াছে।

সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের আলোক পূর্ব্বদেশেই প্রথমে উদিত হইয়াছিল, আজ পশ্চিমে তাহা নূতন দেখা

দিতেছে, তাহাত হইতে নিভিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে যদি এক সন্তান নারী মুছে যাওয়া দূরে থাকুক, রাজপথ দিয়া চলিয়া যান, বাঙ্গালী কম্পিত হৃদয়ে বলে "দেশের সর্ব্বনাশ হইল।" উপনিষদের যুগে যখন শিশুঘোষক শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়াছিল, জ্যোতিষ ও বীজগণিতের আসনে যখন শুভঙ্করী স্থান লাভ করিয়াছিল, তখন হইতে ভারতের মহাদুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে, ভারত-নারীর দুর্গতি হইয়াছে। নারীর দুর্গতি হওয়াতে পুরুষ অসত্যকে সত্য বলিয়া, পাপকে পুণ্য বলিয়া, কলঙ্ককে গৌরব বলিয়া বরণ করিয়াছে। ভারতের এই মহা দুর্গতির অবসান কবে হইবে?

সঙ্কট উপস্থিত না হইলে প্রকৃত বন্ধু চেনা যায় না। ফ্রান্সে মহা বিপদ। যুদ্ধে দেশ পুরুষশূন্য হইতেছে—নারীকে যাহারা আত্মাহীন জীব বা গৃহের চিত্রপট মনে করিত সুতরাং মানুষের সর্ব্ব প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিত, আজ তাহারা বুঝিয়াছে, নারী না হইলে যেমন গৃহস্থালীর কর্ম্ম চলে না, নারী না হইলে দেশরক্ষাও হয় না। ফরাসী দেশে নারীগণ চিরদিন নাবালক বলিয়া গণ্য। নাবালক যেমন কাহারও অভিভাবক বা সম্পত্তির রক্ষক হইতে পারে না, ফরাসী-নারী সেইরূপ নিজের সন্তানেরও অভিভাবিকা বা সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকা হইতে পারিতেন না। যুদ্ধে নারীর মহত্ত্ব ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া ফরাসীদের বহু কালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তাহারা নারীদিগকে বিশ্বাস করিয়া অভিভাবিকা ও সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ভারতবর্ষে নারীকে কখনও আত্মাহীন জীব বলিয়া অসম্মান করা হয় নাই। ভারতের নারী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, পুত্র-কন্যার অভিভাবিকা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। যদিও ইংরেজ আমলের কালে স্মৃতি-ব্যাখ্যাতাগণ শাস্ত্রের কূ অর্থ করিয়া পুত্র বিদ্যমানে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় অপুত্রা বিধবাকে সম্পত্তি হইতে চ্যুতা করিতে পারেন নাই। ভারতে নারীর প্রতি একদা এমনই সম্মান ছিল।

ইংলণ্ডের নারীগণ যুদ্ধসম্ভার নির্ম্মাণে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন। পুরুষের যাবতীয় কার্য্য আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। নারী যদি আজ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিত, তবে ইংলণ্ড বহুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইতেন। ইংলণ্ড নারীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যে সকল দেশের নারীজাতির দুর্গতি ছিল, তাহারা নব নব অধিকার লাভ করিতেছে, আর যে ভারতবর্ষের নারী স্মরণাতীত কালে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিনী, বিদ্যায় অতুলনীয়া, শৌর্য্যে অদ্বিতীয়া ও রাজনীতিতে বিচক্ষণা ছিলেন, আজ তাঁহারা দেশের কার্য্যে রত হইলেই লাঞ্ছিতা হইতেছেন। নারীর প্রতি ভারতবাসীর অবিশ্বাস ও অসম্মান দেখিয়া প্রাণ বিগলিত হয়। কে আছ এস, ভারতনারীকে তাহার প্রাচীন পূজ্য আসনে বসাইয়া জন্মভূমিকে শত দুর্গতি হইতে রক্ষা কর।

দাদাভাই নওরোজী।

ভারতের রাজনৈতিক নেতা দাদাভাই নওরোজী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ জীবনের প্রধান প্রধান কথাগুলি আমরা প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই মহাত্মা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর ৯ মাস ২৬ দিন হইয়াছিল। চতুর্থ জর্জ, চতুর্থ উইলিয়ম, ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জ, ইংলণ্ডের এই পাঁচ জন রাজা ও রাণীর রাজত্ব তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের কুড়িজন গবর্ণর জেনারেলের শাসনকাল তাঁহার জীবনের মধ্যে পড়িয়াছে। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। তাহার পর বেণ্টিঙ্ক, অক্‌ল্যাণ্ড, এলেনবরা, হার্ডিঞ্জ, ডালহাউসী, ক্যানিং, এল্‌গিন্, লরেন্স, মেয়ো, নর্থব্রুক্, লিটন, রিপন, ডফারিন, ল্যান্সডাউন্, এল্‌গিন (আগেকার এলগিনের পুত্র), কার্জ্জন, মিণ্টো, হার্ডিঞ্জ (আগেকার হার্ডিঞ্জের পৌত্র) এবং চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতশাসন করিতে আসেন। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি শেষ দশ বৎসর বিশ্রাম

করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়েও বয়ঃকনিষ্ঠেরা তাঁহার পরামর্শ, উৎসাহ, সহানুভূতি ও অনুপ্রাণনা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। একুশ বৎসর তাঁহার শিক্ষার সময়, এবং বাকী একষট্টি বৎসর ধরিয়া তিনি নানা প্রকারে নিঃস্বার্থভাবে, অকপটে ও সমুদয় শক্তির সহিত দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার বিধবা মাতা, ভ্রাতার সাহায্যে তাঁহাকে মানুষ করেন। দাদাভাই আত্মচরিতের যে এক অধ্যায় লিখিয়া প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন, তাহার শেষে মাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এই সূত্রান্তে একজনের কথা যদিও সর্ব্বশেষে বলিতেছি, তথাপি তিনি আমার জীবনে সকল সময়ে সকলের অপ্রগামীয়া ছিলেন—তিনি আমার মা। তিনি তাঁহার এক ভ্রাতার সাহায্য লইয়া, তাঁহার শিশুটীর জন্য খাটিতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং আমার প্রতি স্নেহে তাঁহার হৃদয়খন পূর্ণ ছিল; কিন্তু তিনি খুব বিবেচক ছিলেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদা শক্ত শাসনে রাখিতেন, কখনও আদর দিতেন না; আমার আশে পাশের সকল রকম কুপ্রভাব হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন। তিনি পাড়ার সকলের বিপদ্ সম্পদ্‌সাক্ষী ছিলেন। তৎকালীন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে সামাজিক সংস্কারের জন্য যেসব চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তিনি আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। আমি যাহা, তিনিই আমাকে তাহা করিয়াছেন। আমি তাঁহারই হাতের তৈরী।"

দাদাভাই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি যে-স্কুলে শিক্ষা পান, সেখানে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। এই শিক্ষার উল্লেখ করিয়া তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—

"তখন আজকালকার মত বেতন দিতে হইলে আমার মা কখনই তাহা দিতে পারিতেন না। এই ঘটনার জন্য আমি আজীবন সহিত অবৈতনিক শিক্ষার সমর্থন করিয়া থাকি, এবং আমার মত এই যে, দরিদ্রের ঘরের হউক বা ধনীর ঘরেরই হউক, প্রত্যেক শিশুকে, সে যতটা শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ, ততটা শিক্ষা পাইবার সুযোগ দেওয়া উচিত।"

কি করা উচিত বা কিরূপ হওয়া উচিত, এই বোধ ও আকাঙ্ক্ষা যখন মানুষের জন্মে, তখন সে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করে ও দ্বি-জ হয়; তাহার আগে সে অন্যান্য প্রাণীর মত প্রাণী মাত্র থাকে। দাদাভাই লিখিয়াছেন, তাঁহার আত্মার এই আগরণ পনের বৎসর বয়সের সময় ঘটে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ঠিক্ যেন কলাকার ঘটবার মত আমার মনে পড়ে, কোন্ রাস্তার কোন্ খানে আমি, কখনও অন্যায় অসত্য ভাষা ব্যবহার করিব না, বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলাম। তখন হইতে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমি, ইহা করিব, ইহা করিব না, এইরূপ মানসী প্রতিজ্ঞা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়াছিলাম, বলিতে পারি।"

গুজরাটী ও ইংরেজী স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া তিনি এলফিনষ্টোন কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি বলেন, "এক্ষেত্রেও আমার ভাগ্য ভাল ছিল। স্কুলগুলির মত এখানেও বেতন ছিল না। অবস্থাটা বরং তাহার বিপরীতই ছিল। যাহারা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিত, তাহারাই কলেজে ভর্ত্তি হইতে পাইত, সৌভাগ্যক্রমে আমি একটী বৃত্তি পাইয়াছিলাম।" এই সময়ে তিনি জরথুস্ত্র-মতাবলম্বীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ হইতে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে শুচিতা-রক্ষা-সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করেন। এই উপদেশ তাঁহার জীবনে পালিত হইয়াছিল।

"শিক্ষার মত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমার চিন্তাও ক্রমশি মানাদিকে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আমি উপলব্ধি করিলাম, যে, আমি দরিদ্র লোকদের প্রদত্ত অর্থে শিক্ষা পাইতেছি। এই চিন্তা আমার মনে বিকশিত হইল, শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রসূত সমুদয় উপকার ও সুবিধা যখন দেশবাসীদের সাহায্যেই আমি পাইয়াছি, তখন, আমার যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা আছে, তাহা দেশবাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করা আমার কর্ত্তব্য। আমাকে স্বদেশীয়দিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেই হইবে। এই চিন্তা যখন আমার মনে দৃঢ়তর আকার ধারণ করিতেছিল, তখন "দাদা ব্যবসায়" সম্বন্ধে ব্রার্কসনের বহি এবং নরহিতৈষী হাওয়ার্ডের জীবনচরিত আমার হাতে পড়িল। তখন আর কোন দ্বিধা রহিল না। এই আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনের নিয়ামক ইচ্ছায় পরিণত হইল, যে, যখন যেভাবে সুযোগ পাইব দেশবাসীদের সেবা করিব।"

দাদাভাই জীবনে নানাপ্রকারে দেশের সেবা করিয়াছেন। অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়াও বাদ পড়ে নাই। কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া যখন তিনি সংসারে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কয়েক বৎসর বোম্বাইয়ে তাঁহার পাড়ার ছেলেদিগকে স্বেচ্ছায় এবং কোনও বেতন না লইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৮৫৫ সালে তিনি ও তাঁহার দুই বন্ধু বিলাতে গিয়া "কামা এণ্ড কোং" নাম দিয়া লণ্ডনে একটি ব্যবসা

খুলেন। বিলাতে ভারতবাসীদের এই প্রথম কারবার। এই ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সচ্চরিত্র ও সাধু কারবারী বলিয়া তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল।

বিলাতে ব্যবসা করিতে যাইবার আগেকার ছয় সাত বৎসর তিনি নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিকসম্মিলন ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক সভায় পুরুষদের সহিত নারীদেরও যোগদান, শিশুশিক্ষালয় স্থাপন, ছাত্রদের জন্য নানাস্থানে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা স্থাপন, দেশভাষার প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তারিণী সভা স্থাপন, পার্সীদের মধ্যে সংস্কার, বালবিবাহের উচ্ছেদ-সাধন, হিন্দু-বিধবাদের পুনর্বিবাহদান, পার্সীদের ধর্ম্মের সংস্কার, প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি এই সময়ে মন দিয়াছিলেন। কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক যুবক এই-সব কাজে তাঁহার সহায় ছিল। প্রধানদের নিকটও তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে উৎসাহ পাইয়াছিলেন। দাদাভাই নওরোজীই বেম্বাইয়ে সর্ব্বপ্রথমে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা এই সকল বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে শিক্ষকতা করিতেন। ষ্টুডেন্টস্ লিটারেরী সিসেলেনী নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজ যেমন প্রধান সরকারী কলেজ, বোম্বাইয়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজ তদ্রূপ। দাদাভাই নওরোজী এই কলেজে গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে সরকারী কলেজে কোন ভারতবাসী অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। বিলাত যাইবার পর তিনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে গুজরাটীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিলাতেও তিনিই এই-প্রকারে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সংস্কারক দার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের তাঁহার অন্যতম ছাত্র। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের বয়স এখন ৮০ বৎসর।

অন্যান্য অনেক কার্য্যক্ষেত্রের ন্যায় সংবাদপত্র পরিচালনেও তিনি বোম্বাইয়ে একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি "রাস্ত্ গোফ্তার" বা "সত্যবাদী" নামক গুজরাটী খবরের কাগজ স্থাপন ও দুই বৎসর সম্পাদন করেন। এখন আর উহার ঐ নামের সার্থকতা নাই। শ্রীযুক্ত মালাবারীর সহযোগিতায় তিনি "ভয়েস্ অব্ ইণ্ডিয়া"ও স্থাপন করেন। ইহা এখন লুপ্ত হইয়াছে।

মদ্যপান নিবারণ কার্য্যেও তিনি একজন নেতা ছিলেন। সামুয়েল স্মিথ ও কেন্ সাহেব যাঁহাদের সাহায্যে এংলোইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন স্থাপন করেন, দাদাভাই তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহাদের সমাজে মদ্যপান বোধ হয় বেশী প্রচলিত ছিল। তিনি রাত্রে আহারের পূর্ব্বে একটু মদ খাইতেন। এক দিন বাড়ীতে মদ না থাকায় তিনি নিকটবর্ত্তী মদের দোকানে পানার্থ প্রেরিত হন। সেখানে গিয়া তথাকার দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার এমন লজ্জা বোধ হয় এবং মাথা হেঁট হয় যে, তিনি তাহা জন্মেও ভুলিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যের এই ঘটনার পর তিনি আর কখনও মদ্যপান করেন নাই।

গত (ঊনবিংশ) শতাব্দী যখন ষাটের কোঠায় তখন তিনি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের হিতার্থ লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী স্থাপন করেন। তিনিই বদরুদ্দিন তৈয়াবজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতা, প্রভৃতিকে সার্ব্বজনিক কাজে প্রবৃত্ত করেন। বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ঔচিত্য সম্বন্ধে বিলাতে আন্দোলন তিনিই প্রথমে করেন। আরও যত কাজ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা দেওয়াও এখানে অসম্ভব। তিনি যখন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। তাঁহার খুব টাকার দরকার ছিল; কিন্তু তিনি এই উপহারের প্রত্যেকটি টাকা সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি, কর্ত্তব্যবোধে, মহারাও গাইকবারের রাজত্বকালের শেষ সময়ে বড়োদার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই কাজ তিনি বেশীদিন

করেন নাই। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই, পুরাতন অত্যাচারী ঘুষখোর কর্ম্মচারীদের বাধা ও চক্রান্ত এবং ইংরেজ রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেরারের সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও, তিনি বড়োদার শাসনসংক্রান্ত নানা ব্যবস্থার ও প্রণালীর বিস্তর উন্নতিসাধন করেন। বড়োদার প্রধান মন্ত্রীর পদের বেতন ছিল বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। কিন্তু দাদাভাই যখন দেখিলেন যে বড়োদার তদানীন্তন মহারাজা শাসনপ্রণালীর সংস্কার অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন, তখন কার্য্য ত্যাগ করিলেন। তাহার পর জুনাগড়ের নবাব তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দাদাভাই যাইতে রাজী হন নাই।

ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে পার্লেমেণ্টের সভ্য হন। তিনি তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার সমুদয় কার্য্যের কেবলমাত্র একটি তালিকা দেওয়াও অসম্ভব। ভারতবর্ষের অর্থনীতি- ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কাজ দুটি। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের ঘোর দারিদ্র্য প্রমাণ করেন, এবং প্রদর্শন করেন যে তাহার একটি প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ হইতে নানা আকারে প্রতি বৎসর অনেক কোটি টাকা বা তুল্যমূল্য দ্রব্য বিলাতে রপ্তানী, যাহার কোন প্রতিদান আমরা পাই না। তাঁহার "পভার্টি এণ্ড আন্-ব্রিটিশ রুল্ ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে স্বরাজের আদর্শ পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করেন এবং স্বরাজের দাবী করেন।

দাদাভাই নওরোজীর জীবন হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে, দেশের কল্যাণ করিতে হইলে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই উন্নতির চেষ্টার প্রয়োজন। সকল রকমের সংস্কারকার্য্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার বিনা রাজনৈতিক সংস্কার দুঃসাধ্য; আবার দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকিলে শিক্ষার সম্যক্ বিস্তার এবং উন্নতিও সম্ভবপর নহে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে আমরা শিক্ষার উন্নততর দেশের সমকক্ষ হইতে পারি না; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতিও শিক্ষা সাপেক্ষ। দেশের ধনবৃদ্ধি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; কিন্তু শিক্ষার বিস্তারও অর্থসাপেক্ষ। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইজন্য প্রকৃত সংস্কারক যিনি, তিনি জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সংস্কারের চেষ্টা করিতে না পারিলেও, সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার সমর্থন তিনি নিশ্চয় করিবেন, যদিও কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে।

মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও তিনি পৃথিবীর সার্ব্বজনিক সংবাদ জানিতে ব্যগ্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেও চারিদিন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা-বশতঃ তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, খবর জানিতে চাহিতেন। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত দাদীনা এবং তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ তাঁহাকে খবরের কাগজ হইতে প্রধান প্রধান সংবাদ পড়িয়া শুনাইতেন। হোমরুল সম্পর্কীয় সংবাদ তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতেন।

দাদাভাই নওরোজী অন্তরে বাহিরে খাঁটি সাধু ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যে গৃহীত পবিত্র জীবন-যাপনের ব্রত তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া গিয়াছেন। মধ্যবয়সে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয়। তখন একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্যের এরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন, যে, তাঁহার শরীরের কোন যন্ত্রে ঘুণ ধরে নাই, তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন। দাদাভাই নওরোজীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, সার্ব্বজনিক কাজের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক কি? তজ্জন্য আমাদের দেশের (এবং অন্য দেশেরও) রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এমন মানুষ দেখা গিয়াছে এবং এখনও যায়, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইবার আশঙ্কা হয়, এবং যাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। দাদাভাই নওরোজীকে দেখিলে ও স্পর্শ করিলে লোকে 'ধন্য হইলাম' মনে করিত।

নবীনের আহ্বান।

"কাশ্মীর" ছেলের দলের মত আমরা যৌবনের দল আজ "আদ্দিকালের বুড়ো"র সন্ধানে বার হয়েছি। তাঁকে খুঁজে বের করে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করব, এই আমাদের ইচ্ছা। কিন্তু এই আদ্দিকালের বুড়োটী যদিও আদ্দিকাল থেকেই আছেন এবং অনন্ত কাল ধরে থাকবেন তবু তিনি বুড়ো নন্। নবীন যে, মন যার পাকে নি, তার কাছে তিনি চির নবীন। দিনে দিনে, যুগে যুগে তিনি বিচিত্রতার মণ্ডিত হয়ে আপনাকে নবীন ভাবেই প্রকাশ করছেন। এই সন্ধান যে কি বিরাট ব্যাপার—কি কঠিন, কি আয়াসসাধ্য তা আজ এই পথচলার মুখে বেশ স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করতে পারছি। আদর্শ যে চলিষ্ণু, তিনি স্থির হয়ে এক যায়গায় বসে নাই, যে এই পথ দিয়ে ছুটে চলে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছাব। আমরাও চলছি, তিনিও চলছেন। চলার তাই আর বিরাম নাই। তার উপর তিনি বিচিত্র এবং বহুমুখী। আজ আমিই তাঁকে যে বেশে দেখছি, তাঁর যে মুখ আমার কাছে ফুটে উঠছে কাল যে ঠিক তাঁকে সেই বেশেই দেখেছিলাম এবং তাঁর সেই মুখখানিই ফুটে উঠেছিল তা নয় এবং পরেও যে ঠিক সেই বেশে দেখব, সেই মুখখানিই যে ফুটে উঠবে তা নয়। আর আমি তাঁকে যে দিক দিয়ে দেখছি, তুমি আর সে-ও যে তাঁকে সেই দিক থেকে দেখবে তাও নয়। তাই এই সন্ধান বড় কঠিন, বড় আয়াসসাধ্য। কিন্তু আয়াসসাধ্য আর কঠিন বলে আমরা পিছোব না, আমরা তাকে খুঁজে টেনে বার করব, সে জন্য আমাদের যতই কঠিন এবং বন্ধুর পথ দিয়েই যেতে হউক না কেন, যতই বৈচিত্র্য, যতই বহুর মধ্যে তাঁকে খুঁজতে হউক না কেন। আমাদের প্রতিদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে, আশ্চর্য্য বিবর্ত্তনের মধ্যে যেমন আমার আমিত্ব টুকুকে আমি ধরে রেখেছি, তেমনি তাঁর এই বৈচিত্র্য এবং বহুত্বের মধ্যে তাঁর একত্ব, তাঁর সামঞ্জস্যকে আমরা ধরব, খুঁজে বার করব এবং ধরে রাখব।

আমার আদর্শের সঙ্গে তোমার বা তার আদর্শ মিলছে না বলে আমরা ঝগড়া করব না বরং এই অমিলের মধ্যে মিল কোথায়, তাই খুঁজে বার করব। দুটো আপাত প্রতীয়মান পরস্পর-বিরোধী আদর্শের মিলনে পূর্ণতর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করব—যেমন ধারা আদর্শের প্রতিষ্ঠা হবে আশা করা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে, জড়বাদী আর অধ্যাত্মবাদীর মিলনে।

তুমি আমি এক সমাজে প্রতিপালিত সুতরাং তোমার এবং আমার সামাজিক সহজজ্ঞান একই—কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সহজজ্ঞান দিয়ে তাকে রঙিয়ে তুলেছি; আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব মিশিয়ে তাকে একটু ভিন্ন করে তুলেছি, তারও মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে ফেলেছি; জগতকে আমরা ঠিক এক চখে দেখছি না, আদর্শ সম্বন্ধেও আমরা সকলে ঠিক একমত প্রকাশ করছি না; আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষত্বের স্বতন্ত্র রং টুকু তাতে ফলিয়ে তুলছি। তুললামই বা, নাইবা মিলল দুইজনের মত, তাই বলে আজ জোর গলায় বলব না যে, আমার আদর্শটাই খাঁটি আর সত্য, তোমারটা কিছু নয়, অতএব তুমি আমার পিছু পিছু চল। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের দেবার আছে, পরস্পরের কাছ থেকে নেবার আছে, আজ তাই আমরা পরস্পরকে বলব, "আমি তাই এই সত্য আমার জীবনে পেয়েছি, এসো তাকে তোমার জীবনের সত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবি।"

আমার প্রতি চিন্তায়, প্রতি কাজে, আমার উদ্দীপনায়, কর্ম্মোৎসাহে, আমার শ্রান্তিজড়তায়, আমার সুখে দুখে, আনন্দে বিষাদে, আমার তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সংগ্রাম এবং শান্তিতে কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল না

থাকলেও যেমন আমার সেই একই আদর্শকেই বহুর মধ্য দিয়ে একই করে ফুটিয়ে তুলেছি, তেমনি করে তোমার এবং আমার বিভিন্নতার মধ্যে মিল না থাকলেও সেই এককেই ফুটিয়ে তুলব। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করব, পরস্পরের মতকে সম্মান দেবো, সকলের মধ্যে সেই একেরই বিচিত্র প্রকাশকে মেনে নেবো, সেই জন্য সকলে একত্র হয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করব।

আমি বলছি, মিষ্টভাষী হওয়াই জীবনের আদর্শ, তাই আমার ক্রোধকে সংযত করে, বাক্যকে সংহত করে চলছি। তুমি বলছ রোগীর সেবা করাই হচ্ছে আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা, তুমি তাই ছুটে যাচ্ছ যেখানে রোগী; তোমার সেবায় কল্যাণ-হস্ত তুমি সেখানেই কাজে নিযুক্ত রাখছ। কেহ বলছেন অজ্ঞতার সঙ্গে সংগ্রাম কর, কেও বা বলছেন দারিদ্র্যদুঃখ মোচন কর, আদর্শের সন্ধান সেই খানেই মিলবে। তাঁরা তাই চলেছেন জ্ঞানালোক বিতরণ করতে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করতে। নারী বলছেন স্নেহ প্রেমের মধ্যে আদর্শ, পুরুষ বলছেন সাহস এবং পৌরুষের মধ্যেই আদর্শ। বিশ্বমানবের আদর্শ এই সকল আদর্শের মধ্যে খণ্ডভাবে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত; সকলকে মিলিয়ে এক করলে তার পূর্ণরূপের সন্ধান মিলবে।

কিন্তু তার সন্ধান মিল্‌লেই কি তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে? সে যে আরও কঠিন কাজ। আমার নিজের মধ্যে আমি সন্ধান করে আদর্শের যে রূপ দেখতে পেয়েছি তারই যে প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি, আমার শক্তিতে কুলায় নি। আমার অর্থ, আমার বুদ্ধি, আমার শক্তি এবং সময় সবই যে অত্যন্ত পরিমিত এবং তার উপর আমার চতুর্দ্দিকের আবেষ্টন যে সব সময়েই যতরকম ভাবে তাদের উপর দাবী বসাচ্ছে, আমি তাই নিজের আদর্শকে সব সময়ে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হতে দিতে পারছি না; সামাজিক আদর্শ বা বিশ্বমানবের আদর্শকে কি করে তা হলে ফুটিয়ে তুলব? আমার কথাগুলো নিরাশার কথার মত শোনাচ্ছে, আমি কিন্তু নিরাশার কথা বলছি না, আমি আশাহীন নই। আমি জানি যে আমার পরিমিত শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়ে আমার আদর্শকে পূর্ণরূপে কখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না, কারণ সেই আদর্শ যে আমার জীবনে তার পুরাতন বেশ বদলিয়ে ফেলে ফেলে নিত্য নূতনরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে আমি নিশ্চেষ্ট বসে নই, আমি আমার প্রতিদিনের কাজে আর চিন্তায় প্রতিদিনের সংগ্রামের মধ্যে তাকেই ফুটিয়ে তুলছি এবং তুলতে থাকব। এই জীবনে আশা আমার অনন্ত এবং অবিনশ্বর, সে ক্রমাগতই আমার এই আদর্শ—যা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হতে পারছে না, তাকে প্রতিদিনই ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করছে এবং সেই চেষ্টাতেই আনন্দ পাচ্ছে। সামাজিক আদর্শ এবং বিশ্বমানবের আদর্শও আমার মধ্যে, সমাজের মধ্যে এবং বিশ্বমানবের মধ্যে এমন করে ফুটে উঠবে। তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা বিশ্বমানবের মধ্যে কোনও দিন হয়ত সম্ভবপর হবে,—সীমাবদ্ধ জিনিষ যে সে নয়। তার আত্মপ্রকাশ যে প্রতিদিনই নূতন ভাবে হতে থাকবে, কাজেই আমরা তাকে খণ্ড ভাবে অপূর্ণ ভাবে পেতে থাকব। আমরা তাই প্রতিদিন অন্তর থেকে তারই পিছনে তাকে প্রকাশ দেবার জন্য ছুটতে থাকব, সেই আমাদের কাজ, তাতেই আমাদের আনন্দ।

বৈচিত্র্যহীন, চিরস্থায়ী, পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালের বুকে পরিতৃপ্তির পরম অবসাদের মধ্যে আমরা যেন ডুবে না যাই; এই অতৃপ্তি, এই চঞ্চলতা যে জীবনের পরিচয় দিচ্ছে। নূতনের সন্ধানে যেতে হচ্ছে বলে যেন আমরা নিরাশ না হই, অতীতের পাওয়াটাই যে বর্ত্তমানের পাওয়া হয়ে যাচ্ছে না, আমায় নূতন করে খুঁজতে হচ্ছে বলে সব পরিশ্রম বিফল হয়ে গেল মনে করে যেন ভ্রিয়মাণ হয়ে না পড়ি, মনে যেন রাখি যে, বিফলতার তিক্ত আভাস সফলতার মধুর সম্ভাবনাকে বুকে ধরে আছে। প্রতি মুহূর্ত্তের

ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন যে সে চলে যাক্, এবং আমাদের প্রাণ নূতনের পথ চেয়ে থাকুক, আশান্বিত হয়েই চেয়ে থাকুক। এই পুরাতনকে ফেলে যাওয়া এবং নূতনকে চাওয়াতেই আমাদের সন্ধানের সার্থকতা।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলি।

শ্যামনগরের জমিদার।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অবলাবাবু উকীলের কথা।

অবলাবাবু। মহাশয়, আমাদের সকল চেষ্টাই বোধ হয় বৃথা হইল। যে ব্যক্তি বলিতেছে যে সে কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় সে প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণপদ। আমার নিজের ব্যক্তিগত মতের কথা যদি বলেন তাহা হইলে আমাকে শপথ করিয়া বলিতে হয় যে ঐ ব্যক্তি কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিশ্বনাথ। আপনি কি সেইরূপ সাক্ষ্য দিবেন মনস্থ করিয়াছেন নাকি? আপনার ধর্ম্ম-জ্ঞান দিন দিন খুব প্রবল হইতেছে দেখিতেছি।

অবলাবাবু। না, না, তা বলিতেছি না। আপনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। আমি যখন কমিশন সমক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষ সমর্থন করিতেছি তখন কি আর আমি অন্যরূপ করিতে পারি, না আমার সাক্ষ্য গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে? আপনার নিকট আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। আর কেহ ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিবে না।

বিশ্বনাথ। ধরুন, যদি কমিশনের কোন সভ্য আপনার জবানবন্দী লইবার মত প্রকাশ করেন এবং আপনাকে কৃষ্ণপদ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আপনি কি বলিবেন?

অবলাবাবু। আমি কি বলিব! আমি বলিব যে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণপদ সাজিয়াছে সে জাল। সে কখনই কৃষ্ণপদ হইতে পারে না।

বিশ্বনাথ। শুনিয়া সুখী হইলাম।

অবলাবাবু। আমি বলিতেছিলাম কি, যে ব্যক্তি কৃষ্ণপদ সাজিয়া আসিয়াছে সে যে প্রকৃত কৃষ্ণপদ তাহা যেন ক্রমশঃ প্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

বিশ্বনাথ। কেমন করিয়া?

অবলাবাবু। ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার ঘোষাল, মিঃ হ্যারিসন প্রভৃতির কথায়, বিশেষতঃ মিঃ হ্যারিসনের কথায় কমিশনের সভ্যেরা কি আস্থা স্থাপন করিবেন না? কয়দ রাজ্যের দেওয়ান বিনয় বাবুর কথার কি কোন মূল্য নাই? প্রেসিডেন্সি-কলেজের অধ্যক্ষ কি ভুল করিয়াছেন? প্রেমচাঁদরায় চাঁদবৃত্তি পরীক্ষায় কৃষ্ণপদ কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিল তা পর্য্যন্ত যখন বর্ত্তমান কৃষ্ণপদ বলিতেছে, তখন যে সে প্রকৃত কৃষ্ণপদ, জাল নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে অনেকেরই যেন প্রবৃত্তি হইবে।

বিশ্বনাথ। এমনও ত হইতে পারে যে কোন ছুরা-চোর প্রকৃত কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাহার জীবনের সকল বিবরণ জানিয়া লইয়া কোন রকমে তাহাকে ইহলোক হইতে সরাইয়া কিম্বা স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মৃত্যু হইতে দেখিয়া, তাহার আকারের সহিত নিজের আকারের সৌসাদৃশ্যের সুবিধা লইয়া বিষ্ণুপদ বাবুর পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির লোভে এই কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছে। আমাদের পক্ষ হইতে কমিশন সমক্ষে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদের পক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টার মিঃ মেরিম্যানের সহিত আমার মতের মিল হইয়াছে।

অবলাবাবু। কিন্তু একটা কথা হইতেছে এই যে, প্রকৃত কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অতি সামান্য বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত এই জাল-কৃষ্ণপদ জানিবে কেমন করিয়া?

বিশ্বনাথ। আসল কৃষ্ণপদ অতিশয় বুদ্ধিমান ছিল। তাহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। এমন হইতে পারে যে, সে এবং এই জাল ব্যক্তি জাহাজ ডুবী

গিয়াছিল, শোণিত শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন নিষ্প্রভ, অধর নির্ব্বাক্ ও হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া জড়বৎ পাষাণ হইয়া গিয়াছিল! তিনি কেবল রুদ্ধকণ্ঠে নিষ্কম্পনেত্রে পত্নীর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন! ইহাই তাঁহার অনন্তের পথে মহাযাত্রা! এ পথেও তিনি কোন সহযাত্রীর আশা করেন নাই! কিন্তু তাঁহার মর্ত্ত্যবাসের জীবনে যিনি তাঁহার পূর্ণস্বামিনী হইয়াছিলেন।

মধুসূদন চিকিৎসালয়ে আনীত হইলে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত চিকিৎসক ডাক্তার পামার তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। যাহাতে মধুসূদনের পরিচর্য্যার ব্যাঘাত না হয়, এই নিমিত্ত শুশ্রূষাকারিণীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। মহানুভব মধুসূদন তাঁহাদের পরিচর্য্যায় এতদূর সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক পূর্ব্বতন মুন্সী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"আহা, ইহাদের শুশ্রূষার অন্ত নাই। আমি যদি পূর্ব্বে এখানে আনীত হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিতাম!"

মধুসূদন যে কয়দিন হাসপাতালে জীবিত ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ-প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সদুপদেশ দিতেন। যে সময় একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবজাত সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন। তাঁহার অবস্থানে সেই নিরানন্দ রোগী-নিবাস ক্ষণেকের তরে প্রফুল্ল শ্রী ধারণ করিয়াছিল! কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন; "হাসপাতালের লোকেরা বলিয়াছিল—'এখানে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয় না; কিন্তু ইঁহার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি; কারণ এখানে এই কয়দিন মাত্র থাকিয়া ইনি আমাদিগকে বড়ই আমোদে রাখিয়াছিলেন; ইনি মধ্যে-মধ্যে এরূপ চমৎকার কথোপকথন করিতেন, যাহাতে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতাম। কারণ সেই শোচনীয় শারীরিক অবস্থাতেও ওরূপ আনন্দে ও মধুর প্রকৃতিতে থাকা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।'

হাসপাতালে আসিয়া মধুসূদন প্রথম দুই চারি দিন একটু ভাল ছিলেন; প্রত্যেক দর্শনার্থীকেই তিনি ধীরে ধীরে অতি মধুর বচনে আপ্যায়িত করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার পরিচিত এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া করিয়া নার্স ও ইংরাজ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলেন, "এখানে আমার চিকিৎসার কোন অসুবিধাই হইতেছে না, তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" মধুসূদন স্বীকার না করাতে ব্রাহ্মণ বড়ই গোলযোগ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মধুসূদন গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলেন, "তুমি এখানে ওরূপ বালকের ন্যায় ক্রন্দন ও গোলযোগ করিও না! এ সাহেবদিগের হাসপাতাল; তোমার গোলমালে তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিলে, তাঁহারা বিরক্ত হইতে পারেন। তুমি স্থির হও।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে ইঙ্গিত করিলেন।

চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণীরা মধুসূদনের মধুর কথায় ও মধুর ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অপরিসীম যত্ন করিতেন। তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে না পারিয়া, দানশৌণ্ড মধুসূদন এতই ব্যাকুল হন যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ এক-একটি টাকা পুরস্কার দিতে মনোমোহন ঘোষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এদিকে ত মধুসূদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়াপুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যবাস পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারের চির অশান্ত মধুসূদনের নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অবতীর্ণা হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসূদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান নাই।

তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত জে, লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী (J. Lewis and Co. Undertakers) তাঁহাদের শববাহী শকটে দোরার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রকন্যা, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় ও কুটুম্বগণ, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ দেশীয় ও য়ুরোপীয় বন্ধুগণ ধীরে-ধীরে সাশ্রুনয়নে শবাধারবাহী শকটের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং সমাধির সময়ে মধুসূদনের চিরক্লেশভাগিনী দুহিতার জন্য শেষাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পতিপরায়ণার আদর্শ, রমণীরত্ন এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লিখিত হইলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, এমন নিত্য অভাবপূর্ণ সংসারের গৃহিণী হইয়াও, তিনি পতিগতপ্রাণা হিন্দু রমণীর ন্যায় পতির সঙ্গে চিরসুখ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। অম্লান বদনে সংসারের সকল জ্বালাই সহ্য করিয়াছিলেন। একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কখনও ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। মধুসূদনের দুরন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহার যাবতীয় যৌতুক দ্রব্য, বহু মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার সকলই অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নিজে একটি দিনের জন্যও সুখের প্রত্যাশী ছিলেন না। কি করিলে মধুসূদন শান্তচিত্তে জীবন-যাপন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। নিজের পীড়া, নিজের চিকিৎসা ও নিজের মৃত্যু গণনার মধ্যেই আনেন নাই! নিজে মৃত্যুশয্যাশায়িনী হইয়াও স্বামীর জীবন যাহাতে রক্ষা পায়, সেই দুর্ভাবনায় তিনি অধীরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন! এ হেন সতীসাধ্বী ললনার স্বামী-বিরহ কে ঘটাইতে পারে? স্বয়ং মহাকালও তাঁহার ভয়ে ভীত। মধুসূদনের নানা ক্লেশে তিনি ইহলোকে চিরজীবন উদ্বিগ্না ছিলেন। পাছে মধুসূদন পরলোকেও বিপন্ন হন, এই নিদারুণ উদ্বেগে চিরভীতা সতী স্বামীর মহাযাত্রার প্রাক্কালে ত্বরিত গতিতে অগ্রগামিনী হইয়া, 'সুবর্ণ ষ্টেউটী' হস্তে স্বর্গের পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আবার এ দিকে স্বয়ং বিধাতার বিধানে পৃথিবীতলে একই সমাধিগর্ভে তাঁহার শবদেহ পতিপার্শ্বশায়িনী হইয়া বহু যন্ত্রণার পর সুখ-বিশ্রামে চিরশায়িত হইয়া রহিয়াছে।

হেমরিয়েটার সমাধির পর সন্ধ্যার সময় আষাঢ়ের প্রাবৃট-প্রকৃতি ঘনঘোর হইয়া উঠিল! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! অবিরাম বৃষ্টির ধারা মেদিনী শীতল করিতে লাগিল! যেন মহা-জ্বালা-নির্ব্বাণের পর মহাশান্তি আসিয়া সতীকুলরাণীকে শান্ত তৃপ্তি দান করিল। সেই নিবিড় সান্ধ্য অন্ধকারে মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, "জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" এই শোক-সংঘাতেই মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল! যিনি পৃথিবীতে সকল দুঃখেই হিমালয়ের ন্যায় অটল ছিলেন, পত্নীবিয়োগরূপ বজ্রাঘাতে তিনি একেবারে বালুকাস্তূপে ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন!

সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুইজন বন্ধু ও জামাতাকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। জামাতা বাবু বলিয়াছিলেন যে, "সেই রজনীর শুষ্ক, গম্ভীর এবং শোকাবহ দৃশ্যাবলী তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ঘোর অন্ধকারে ধরিত্রী সমাচ্ছন্না! চন্দ্রতারকাশূন্যা প্রকৃতির বিষাদ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, ভয়ঙ্করী ভৈরবীর ন্যায় নিবিড় কুন্তল-জালে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া ফেলিয়াছে। অন্ধকার বিগুণ ঘনীভূত করিয়া, চক্ষু ধাঁধিয়া বিদ্যুৎরশ্মি মুহুর্মুহু জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে—আবার ক্ষণে-ক্ষণে সুতীব্র ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে। মনোমোহন ঘোষ দেখিলেন—চারিদিক নীরব, গম্ভীর ও জনশূন্য; প্রখর বাত্যায় চিকিৎসালয়ের কোন-কোন কক্ষের লণ্ঠনের ক্ষীণ বর্ত্তিকালোক নিবিয়া গিয়াছে; কোন-কোন কক্ষের ল্যাম্প স্তিমিত মৃদুরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। দুর্ব্বল আতুর এলায়িত দেহে সুপ্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন;

কেহ বা শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছেন; কাহাকেও মাতৃস্নেহময়ী শুশ্রূষাকারিণী ঔষধ সেবন করাইতেছেন; কাহাকেও বা ব্যজন করিতেছেন।—আবার কোন কোন কক্ষে শোকাবহ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! কেহ বা বেদনা-যন্ত্রণায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন—কোন রোগীর অন্তিম অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আত্মজন নীরবে শোকাশ্রু মুছিতেছেন! কোন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মযাজক পাদ্রী তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া স্বর্গের আশ্বাস দিতেছেন! মনোমোহন ঘোষ, ফিরিয়া উঠিয়া মধুসূদনের কক্ষাভিমুখে গমন করিতে করিতে সহযাত্রীকে বলিলেন, "একজনকে ত সমাধিস্থ করিয়া আসিলাম, কে জানে আবার কখন আর একজনকে সমাধিভূমে লইয়া যাইতে হয়! কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!"

তাঁহারা ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদ্রিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন! তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত শাস্ত্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? কে কে উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র, ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে—কোন ত্রুটিই হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎ কাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন! পরে মনোমোহনকে বলিলেন, "তুমি ত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছ,—সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি?" মধুসূদন,—"লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলেন? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোনও কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।" এই বলিয়াই তিনি ম্যাক্‌বেথের • • উক্তিগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন;— • • • •

মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ সকল কথায় কাজ নাই, আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন, "ডাক্তার পামার অদ্য যখন আমার প্লীহা যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্জ্জলাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর ২।৩ দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। ("You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered.") এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্রদুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত-মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" ("If you have one bread, you must divide it between yourself and my children; if you say, you will, I depart with consolation.") প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলেন:— "Certainly,—I assure you, so long as my children have bread to eat, they shall divide it with yours."—অর্থাৎ 'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।' এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "God bless you, my boy." (ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন)। তৎপরে তাঁহারা সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমেই মধুসূদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার পীড়া-সমূহের আর উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। মধুসূদন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার পৃথিবীর সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমা দরিদ্রতার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না। তিনি এজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে নীরবে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মধুসূদনের বহুদিন হইতে বিশেষ বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধুসূদনের

উত্তরপাড়ায় অবস্থিতি কালে চন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। মধুসূদন যে কয়দিন জেনারেল হাসপাতালে ছিলেন, রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন।* পূর্ব্বে মধুসূদনের সহিত চন্দ্রনাথের সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ হইত; কিন্তু চিকিৎসালয়ে মধুসূদন তাঁহার সহিত কেবলই ধর্ম্মালাপ, ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মহাকবির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিকশিত করিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রনাথ! জীবনে বহু সাধারণ-হিতকর সৎকার্য্য করিয়া যাইবার আমার অভিপ্রায় ছিল; সুযোগ-সুবিধা এবং শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বহু বিড়ম্বনার অধীন হইয়া আমার জীবনের বহু সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিয়া গেল!" রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ মধুসূদনের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্টীয় সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের কিছু পর হইতে তাঁহার সমগ্র জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি 'চর্চ্চ অব ইংলণ্ডে'র অধীন ওল্ড মিশন চর্চ্চ ধর্ম্মমন্দিরে বাপ্তাইজ হন। এমন কি সে গির্জ্জারও সহিত তাঁহার কোন সংস্রব না থাকায়, অনেক খ্রীষ্টান ও পাদরী মহাশয়েরা তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া মহা হলুস্থুল বাধিয়াছিল, কয়েকটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক—মধুসূদনের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে ইহা ভাবিয়া ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, (তাঁহার বন্ধু) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনকে বলিলেন, "তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি।" ইহা শুনিয়া তেজস্বী মধুসূদন বলিলেন, "আমি মনুষ্য-নির্ম্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন! ('I am going to rest in my Lord: He will hide me in his best resting place!') আমাকে তোমরা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কিম্বা কোন তরুতলেই হউক। কেবল আমার এইমাত্র শেষ অনুরোধ রাখিবে, যেন আমার দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়! পৃথিবীতলে শ্যামশষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে।"

যদিও এই প্রকার অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বন্ধুর মধ্যস্থতায় তাৎকালিক লর্ড বিশপ রাইট রেভারেণ্ড রবার্ট মিলম্যান্ D. D. মহোদয় মধুসূদনের প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল! মধুসূদনের স্মৃতিশক্তি ও বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা যখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মধুসূদন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময়ে আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলিতে পারিলেন না; সেই কথাই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত শেষ কথা হইল। সেই দিনই—সেই

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা শুশ্রূষাকারিণী-পরিবেষ্টিত শ্রীমধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল! তাঁহার অমর আত্মা জীর্ণ দেহাস্থিপঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে গমন করিল! মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া জাগতিক দুঃখকষ্টবিক্ষুব্ধ অলৌকিক জীবনলীলার চিরাবসানে শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিবসে (রবিবারে) শান্তির সুপ্তনীড়ে চিরবিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন।

বঙ্গ-লক্ষ্মী।

(১)

বঙ্গ-সাগর-মথন-ধন নন্দন-বন-মালিকা,
ধনী নির্ধন, স্নেহবন্ধন, শত সন্তানপালিকা;
উজ্জ্বল-চির-নূপুরনিকরে
হেমধারারাশি শতধা ঝরে,
পুণ্য-চরণ করে বন্দন অযুত ক্ষুদ্র যুথিকা—
বঙ্গ-সাগর-মথন-ধন নন্দন-বন-মালিকা।

(২)

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে বহিয়া সুধার দান,
সন্ধ্যা পরায় তোমার গলায় জোছনাবালা খানি;
শুভ্র তোমার চিত্ত মাঝে,
বিশ্বদেবতা নিয়ত রাজে,
অযুত পাপিয়া বন্দনা গায় মুখরি বকুলকুঞ্জ,
চরণে তোমার অর্ঘ্য ঢালিছে সিন্ধু-উরমিপুঞ্জ।

(৩)

হিমাচলশিরে করে ঝলমল তোমার কিরীটখানি,
জাহ্নবী বুকে ঝঙ্কারি উঠে তোমারি কীর্ত্তিবাণী;
সাগরে তোমার শঙ্খ বাজিছে,
'অভয়' তোমার বিভয় ঘোষিছে,
ভৈরবী তুমি, কীর্ত্তিনাশায় দেখেছি তোমার মূর্ত্তি,
পদ্মার বুকে হেরেছি তোমার রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি।

(৪)

বৈশাখে তব শান্ত আননে দেখেছি দীপ্ত হাসি,
বরষার মাঝে হেরেছি তোমার শুধুই চিকুররাশি;—
শত শত বেশ ধরণ করিয়া
স্নেহনির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া,
তৃষিত চাতক ধরণে মত্ত দাদুরী আপনাহারা,
উদ্ধত-ভীম-উত্তর বায়ু পুলকে পাগলপারা।

(৫)

শুভ্র শরতে আসে দশভুজা, শিউলি বিতরে গন্ধ,
অযুত কণ্ঠে উচ্ছ্বসি উঠে বন্দন-গীত-ছন্দ;
ওলরি উঠে শতেক কুল,
মঞ্জরীপরা তরুর অঙ্গ;—
কাননে কাননে কুলের পাথার জ্যোতিরূপে পরকাশি—
নিখে বুঝিবা লক্ষ্মী আসেন ঢালিতে সুষমারাশি।

(৬)

কার্ত্তিকে তব কুন্তলভোরণ রঞ্জিত ফুলহীরে,
পৌষে তোমার অঞ্চল ভরা নবীন ধান্যের ভারে;—
মাঘে, মা তোমার বক্ষ মাঝে
মহাতারতীর ঝঙ্কার বাজে;
নব বসন্তে নব আনন্দে করে গো সুধার বারি,
উছলিয়া পড়ে আকাশে বাতাসে রঙের রসের ঝারি।
তোমার চরণ করিয়া শরণ, তুচ্ছ করিয়া দুঃখ,—
মৃত্যুবিজয়ী সন্তান তব লভিল পরম মোক্ষ;
জগত কবির প্রথম গান
তোমার করণে করিল দান;—
হস্তে তোমার জ্ঞানের প্রদীপ, চরণে অমিয়াধার—
হে আমার চির চিত-বাঞ্ছিতা তোমারে নমস্কার।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্তমধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি।
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি!

বন্ধুবর যোগীন্দ্রনাথ কবিভূষণ ও সমবেত সভ্যবৃন্দ, যে মহাকবির স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি,

শুধু বঙ্গের নহে, তিনি সমগ্র ভারবর্ষের বরণীয়, ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্র-দিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্ন রক্ষিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য বাঙ্গালার শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা যে, অতিবড় নীরস পাষাণের এখানে নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই,

"পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে"

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহণীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লী-প্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দরে শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়,—এই বাঙ্গালার পল্লী-কুঞ্জে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা আবার ভাগ্যবান্, বিধাতার অনুগ্রহ যাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাঁহারা ঐ ভাবাবেশ আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হন, নর-জীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লী পার্শ্ব-বাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকায় পথিকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্ত্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সান্ধ্য-সমীরণে যেন কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন, সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা আপনিই অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চির-প্রসন্নমুখের দিকে মুগ্ধিত নেত্রে চাহিয়া বলে—

"মধুর-মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"

(সারদামঙ্গল)

তখন সে মুক্তকরে তাহার আদরিণী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনো ধ্যান করে, কখনো আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধরিতে যায়, সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনো শোকাশ্রুতে ধরণী ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখনো বা মরভূমি অমরধামে পরিণত করে,—তখন তার—

"সে শোক-সঙ্গীত কথা,
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উতরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি,
গদগদ আদি-কবি,
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া যায়।"

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতি নিশ্বাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সাধক কবি তখন বুঝিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি কি কহিতেছেন, কি গাহিতেছেন? তাঁহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের "মা নিষাদ" গীতিকা যে জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতে পান না। কবি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে অনিমেষে চাহিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে বলেন,—

"এস মা করুণা-রাণী,
ও বিধু-বদন খানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি, হেরি গো আবার;

শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ বাণি-জন-তপোবনে আর।"

(সারদামঙ্গল)

কবির তখনকার সেই উদ্বোধন-সঙ্গীত যে, কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না। এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি-কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদি-কবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে নর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়, এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কথায় মহাকবি কীটসের হৃদয় শতধা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল! হায়, অকালে জ্বররোগে তাঁহাকে প্রাণ করিয়াছিল!!

বঙ্গের কবিতাসুন্দরীর রাতুল-চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্ত দেবতার দুর্দ্দশায় ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাঁদিতে কাঁদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—

"বড়ই নিঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা পড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষরূপ বেড়ি, কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহফাঁদে!"

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগলপারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দামভাবে বিচরণ করিতে চায়. তাহার সম্বন্ধে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, এক অতি মনোরম নবীনভাব সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

এই কবিবাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা হয়ে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন,—আপনার ইহকাল পরকাল, সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ্-পুত্র-কলত্র,—সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্তগ্রহের ন্যায়" দিগ্ বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, কবিতাসুন্দরীর প্রেমে আকুই হইয়া ছুটিয়াছিলেন,—একাগ্রহৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্ত-পরতন্ত্র" ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ধূর্ত্ত সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণ-পদ্ম, পদ্ম-বাসিনি! ভারতি!
কব পরিমল-ময় এ হিয়া-সরোজে—
তুমি যেন বিজে, মা গো, এ ঘোর মিনতি।"

তাঁহার মিনতি সফল হইয়াছে। শুধু "হিয়া" নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ মন সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার "রাঙা চরণে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি" দেখিয়া, মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা উপরিধৃত কয় পংক্তি হইতেই যেন বুঝা যায়। আমি যাঁর সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কামন প্রাণের প্রতিকৃতিরূপে করিয়া যাঁহাকে ডাকিব,—আমার সমস্ত গৌরভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার যাকে মা বলিয়া ডাকিবে,—আমার তখন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি মা মা বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ-নিগড় মুক্ত করিতে

না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি, কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজলনয়নে বলিলেন,—

ছিল নাকি তাব-ধন কহ লো লগনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুদ্ধ ভূষণে!
কি কাজ রতনে রাজিংকমলের দলে;
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!

গৌড়িক ভাষার অনুষ্টুপ্‌ছন্দের প্রবর্ত্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যত দিন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, তত দিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর ঝিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর মধুসূদনের তরঙ্গিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"

(নবীনচন্দ্র)

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে, তাঁহার চিরপ্রিয় গৌড়জনকে এমন সুধাপান করাইবেন, যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন; এখন জাগ্রত করিতে হইবে; তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত। তাহাতে বিদেশীর মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই। জাতীয়তার বিসর্জ্জন দেন নাই, পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ ভাসে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপরন্তই কালে শুকাইয়া যায়, মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোণা কথায় ইউরোপের নানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস। মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের অমিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মসালসার পরিবর্ত্তে বীর্য্যবন্তার সুধায় বিভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক-প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও, অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অল্পভাবে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। মধুসূদনের যে কয়খানা বঙ্গসাহিত্যগগন মুখরিত, তাহার এক তৃতীয়াংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতার খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। শুধু তাঁহার স্মরণের মহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনো একভাবে, একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন, তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু; কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধু-বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। সর্ব্বপ্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন,

পাঠ করি, দেখি, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছাপ্ যেন স্বতই লাগিয়া আছে। বঙ্গকাব্যকাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি কহিল, যে পথে চলিয়াছি, ইহাতে কোথায় কত দূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব, যে পাথেয় আছে, তাহাতে কুলাইবে কি না, এই সব ঐহিক হিসাব-নিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই

"নিয়তি-কৃত-নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী,
অনন্ত-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা" ছিল।

(কাব্যপ্রকাশ)।

মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনাসাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দোজ্জ্বল-নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, "মোড় করি কর, গৌড়সুজনে" কহিতেন; "শুন হে গৌড়চূড়ামণি"—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্য স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা?"

এই কবিবাক্যে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদি-কবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।" তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল, সেই উন্মাদনার অঙ্গুলিসঙ্কেতে কবিবর দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন। অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই, ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবারজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ-কবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাবে ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেকখানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পংক্তির মধ্যে সাতাইশ পংক্তি কেবল বঙ্গ-কবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্লভ প্রেমরসে তাঁহার হৃদয় বিগলিত করিয়াছিলেন, অপার্থিব কবিত্ব-সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। কখনো তিনি ভারতসাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুকুতা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখন আবার

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল কেমনে,
নাশিনা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেবদৈত্য নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র নন্দনে";—

কখন বা—

"কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে"

গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই "বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণকণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের বীণায় বিরহসঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর মহাসাগর পার হইয়া দেশবিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত-সাগরে," অন্য সাগরে নহে। পাশ্চাত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিজীবনের দুইটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্ব্বকাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তথায় যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্বকালে গ্রথিত, আর হেক্টর-বধ, মায়াকানন এবং কবিতাবালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি "পূর্ব্বে ভারতসাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারতসাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির

তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভারসেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেটটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণ বাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতাপুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

"পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায় মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।"

বাস্তবতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়াদশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী, খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীতে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায়, সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেলেসে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর-সাগর-দাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাঙ্গলার মূল, বাঙ্গালার ফলে, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" তাঁহার অন্তর বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীতে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো, এবে তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা, মুকুতার কমরূপ ধরি?"

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল, বঙ্গের কবিকুল মধু-হীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। "শ্যামা" বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

"মধুহীন করো নাক তব মনঃকোকনদে।"

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে। সত্যবৃদ্ধ, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব, মুকুন্দরাম, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাসের দেশে, মধুসূদনের জন্ম, যে দেশে নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানীতে শ্যামাদোয়েলের সঙ্গীত, সুনীলতটিনীতে দাড়িমাবিদের সারিগান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম, যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল বালক—

"হরি বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে"

বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়, মধুর সেই দেশে জন্ম,—তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে, কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থায়, অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতা-মাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ, বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত;

রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বিনিময়ে যে রত্নের লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিরত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে?

শুভক্ষণে মধুসূদন ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

" . . . মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনাগ্রে (পদ্মাসনে যেন)।
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর, সতি!
———তব বরে চোর রত্নাকর,
কাব্য-রত্নাকর কবি!
উর তবে, উর, দয়াময়ি!
গাইব, মা! বীররসে ভাসি
মহাগীত, উরি দাসে, দেহ পদ-ছায়া।"

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পারিয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদ্দেশবাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষায় দিবাকরকল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবারজনী আনন্দে মধু পান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে "কাঞ্চন-কঙ্কণ-বিভায়" বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বঙ্গ-কবিতা-সাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্‌জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ভাবে বুঝি বা ততোধিকরূপে বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত কি ভাঙ্গিবে, গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্বপ্রতিভার জ্যোতিঃ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আদি বলিয়া, আমরাও ধন্য হইতেছি।

আহা!

বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড় জন, সে কবি মধুসূদন
গিয়াছে,—বঙ্গের মধু, বঙ্গ পরিহরি।
যাও তবে কবিবর, কীর্ত্তিরথে চড়ি!
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
রাজিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।
যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়জন-মধুকরে,
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।

(নবীনচন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

দীপ্তিময়ী।*

এমিলিয়া এথেন্সের এক রাজ প্রাসাদে বাস করিতেন। তাঁহার ভগ্নী হিপলিটা স্ত্রীযোদ্ধাদিগের রাণী ছিলেন এবং নিজেই তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেন। এমিলিয়া কিন্তু এই সকল যুদ্ধে যোগদান করিতেন না। এথেন্সের রাজা থিসিয়াস হিপলিটাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিজ বৃত্তে লইয়া গেলেন এবং বন্দিনী না করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই সময় এমিলিয়াও তাঁহাদের সঙ্গে এথেন্সে গমন

* গত ২৯শে জুন কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত কবির সমাধিস্থানে বার্ষিক স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

* চসার আদি ইংরাজকবি। কেন্টারবারি কাহিনী তাঁহার রচিত মহাকাব্য। বর্ত্তমান গল্প সেই মহাকাব্যের সারাংশ লইয়া লিখিত।

করেন। রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। রাজপ্রাসাদ তাঁহার নিকট নিজ বাড়ীর মতই ছিল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এমিলিয়ার সৌন্দর্য্য বাড়িতে লাগিল। তাঁহার লাবণ্য ছিল—প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলটির মত। তাঁহার গণ্ডদেশের রক্তিমা ছিল, গোলাপের পাপড়ির রংএর চেয়েও কোমল, তাঁহার ঘন স্বর্ণাভ কেশরাশি একটী প্রকাণ্ড বেণী-নিবদ্ধ হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতে থাকিত। এই স্বর্ণাভ উন্মুক্ত কেশদামে সময় সময় আলোকরশ্মি পতিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইত, এবং তাহা দেখিয়া দর্শকগণ মোহিত হইতেন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল "দীপ্তিময়ী" এমিলিয়া।

উষার শিশিরবিন্দুতে মুখমণ্ডল সিক্ত করিবার নিমিত্ত, এমিলিয়া একদিন বসন্তের প্রভাতে উদ্যানে গিয়াছিলেন। তখন ঈষৎ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত হইয়া সমস্ত ধূসরবর্ণ দেখাইতেছিল। কারা-দুর্গের ছায়া সমস্ত বাগান ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এমিলিয়া সে দিকে তাকাইয়া সেখানে আবদ্ধ রাজকুমারদ্বয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। রাজা থিসিয়াস ইঁহাদিগকে থিবস্ হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাদের মুক্তির জন্য মণিমুক্তা ও স্বর্ণাদি দিতে চাহিলেও তিনি ইঁহাদিগকে মুক্ত করেন নাই। এমন ক্ষমতাশালী রাজকুমারগণ তাঁহার দুর্গে বন্দী আছেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিতেন। থিবস্ রাজবংশের এই দুই রাজকুমার সম্পর্কে ভাই ছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম ছিল প্যালামন, অপরের নাম আরকাইট।

প্রভাতের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে এমিলিয়া মনেমনে রাজকুমারদের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সঙ্কীর্ণ কারাগারের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোন সুখ নাই। তাঁহার নিজের জীবন এত আনন্দময়, তাঁহাদের জীবন কিনা এত কষ্টকর! এই ভাবিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি উদ্যানের এদিক ওদিক ঘুরিয়া কেশগুচ্ছে পরিবার জন্য শ্বেত এবং লাল গোলাপ সংগ্রহ করিতেছিলেন; এমন সময় সূর্য্যরশ্মি কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া বাগান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। এমিলিয়া পুনর্ব্বার দুর্গের দিকে চোখ ফিরাইলেন। কিন্তু এবার তিনি দুর্গ নিরীক্ষণ না করিয়া, সূর্য্যালোকে আলোকিত মেঘদলের দিকে তাকাইলেন। পূর্ব্বাকাশের সূর্য্যালোক এমিলিয়ার উপরে পতিত হইল। তাঁহার কেশগুচ্ছ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইল। ঠিক এই সময় প্যালামন্ কারা-দুর্গের জানালার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, প্রভাতকিরণ এথেন্সের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও শস্যক্ষেত্রের উপর পড়িয়াছে। এমন সময় এমিলিয়ার প্রফুল্ল হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত সঙ্গীত-লহরী তাঁহার কাছে ভাসিয়া আসিল। তিনি নিম্নে তাকাইয়া দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে সূর্য্যরশ্মি-স্নাত এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

এমিলিয়াকে তাঁহার নিকট যেন সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি একে একে পূর্ব্বজীবনের সমস্ত আনন্দ, স্ফূর্ত্তি এবং স্বাধীনতার কথা ভাবিতে লাগিলেন। এসকল তিনি আর কখনও ভোগ করিতে পারিবেন না ভাবিয়া জানালা হইতে হঠাৎ সরিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্দী ভ্রাতা আরকাইট শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, কিসে তোমাকে এত কষ্ট দিতেছে? ধৈর্য্যের সহিত এই কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য কর। ইহা কষ্টকর বটে, কিন্তু সহ্য ত করতেই হবে। আমাদের আর কি করবার আছে?" প্যালামন উত্তর করিল, "তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই। বন্দী হইয়াছি বলিয়া নূতন মর্ম্মবেদনা হয় নাই। একটী তীক্ষ্ণ তীর নয়নযুগল দিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। তাই আমি ব্যথিত হইয়াছি। ঐ যে উদ্যানে রমণীটী ভ্রমণ করিতেছেন, মনে হয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আমার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা আবদ্ধ হইয়া আছে। তিনি দেবী না মানবী আমি জানি না, কিন্তু এই টুকু জানি যে দেবীই বল আর মানবীই বল, কেউ এর চাইতে সুন্দরী

নয়।" তিনি এমিলিয়াকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, তুমি যদি দীপ্তিমতী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছ, তবে আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণা প্রদর্শন কর।" আরকাইট অগ্রসর হইয়া প্যালামনের কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁদের জানালাটা ছিল—একটী সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত। কাজেই আরকাইট এমিলিয়াকে দেখিতে পাইলেন না। এমিলিয়ার চেহারার একটু মাত্র আভাস পাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা কি আশ্চর্য্য সুন্দরী! উহার মনস্তুষ্টির জন্য আমি যে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারি!"

এই কথা শুনিয়া প্যালামন উদাস ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঠাট্টা করিয়া কিসব বলিতেছ?" আরকাইট বলিলেন, "এখন আমার ঠাট্টা করিবার সময় নয়; আমি সত্য কথাই বলিতেছি।" প্যালামন তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমার কি আত্মসম্মান বোধ নাই? তুমি কি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ? আমি যাকে ভালবাসিয়াছি তুমি তাকে ভালবাসতে চাও?" আরকাইট ঘৃণার সহিত বলিতে লাগিলেন, "বরং তোমারই আত্মসম্মান বোধ নাই। একটু আগে তুমি জানতে না ইনি মানবী না দেবী! আমিত তাঁহাকে মানবী বলিয়াই ভালবাসিয়াছি এবং তুমি আমার ভাই বলিয়া তোমাকে তাহা বলিয়াছি। আর যদিই বা তুমি তাঁকে আগে ভালবাসিয়া থাক কেবল সে জন্যই কি আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণীকে ভালবাসব না? আর আমাদের ঝগড়া করেই বা কি ফল? তুমি খুব ভাল করেই জান যে তুমি কিংবা আমি কেহই উহার মন মুগ্ধ করতে পারব না। যেমন একটা গল্পে আছে—দুইটা কুকুর একটুকরা হাড় লইয়া ঝগড়া করিতেছিল কিন্তু কোথা হইতে একটা ঈগল পাখী আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহা লইয়া গেল, তেমনি আমরাও বৃথা ঝগড়া করিতেছি। তুমি যদি ঐ রমণীকে ভালবাসিতে চাও তবে ভালবাস।"

কারাগার তাঁদের কাছে আগেও অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইত, এখন যেন সেই কষ্ট শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। এখন পৃথিবী বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল—কেননা সেই সুন্দরী রমণী যে সেখানে বাস করেন!—যে ভ্রাতৃপ্রেম তাঁহাদিগকে এই কারাগারের সমুদয় দুঃখ বিপদের মধ্যেও আনন্দ দিত—তাহাতেও ভাঙ্গন ধরিল। তাই এই কারাগার এখন অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন রাজা থিসিয়াসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে এথেন্সে আসিলেন। বিবাদে থাকিতে আরকাইটের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, এবং আরকাইটকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আরকাইটকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি থিসিয়াসকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রিয় বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার এই সুযোগ পাইয়া থিসিয়াস যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি বন্ধুকে লইয়া কারাগারে গেলেন। আরকাইট ও সেই বন্ধু পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরকাইটের হৃদয় আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজা থিসিয়াসের আজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে একেবারে দমিয়া গেল। রাজা বলিলেন, "আরকাইট, আমার বন্ধুর ইচ্ছানুসারে, আমি আজ এই কড়ারে তোমার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতেছি, যে তুমি এই রাজ্য হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইবে। যদি কখনও এই রাজ্যের সর্ব্বশেষ প্রান্তেও তোমাকে দেখিতে পাওয়া যায় তবে জানিও সেই মুহূর্ত্তই তোমার শেষ মুহূর্ত্ত হইবে—তরবারির আঘাতে তোমাকে সেখানে বিনাশ করা হইবে।" বিষণ্ণ হৃদয়ে আরকাইট বলিতে লাগিলেন, "কি কুক্ষণেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম! আমার কি দুর্ভাগ্য যে থিসিয়াসের বন্ধুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল! তিনি যদি আমাকে না জানিতেন তাহা হইলে দুর্গের ঐ জানালা হইতে এখনও আমি প্রতিদিন এমিলিয়ার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিতাম। প্যালামন! তুমিই জিতিয়া গেলে! তুমিত এখনও দিনের পর দিন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া

থাকিবে। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে হয়ত তুমি স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে এবং তার ভালবাসাও লাভ করিবে। আর আমি কেবল নির্ব্বাসন যন্ত্রণাই ভোগ করিব।"

এদিকে আরকাইট অতি-কষ্টে দিবসে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি কেবলই একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেন আর মনে মনে দুঃখ করিতেন। খাদ্য দ্রব্যের প্রতি তাঁহার অরুচি হইল। নিদ্রা পলায়ন করিল। দিন দিন তাহার শরীর শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর কর্কশ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যখন দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত এমন সময় এক রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। অতি সুন্দর এক যুবক, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দুইটী পক্ষ এবং মস্তকে সোণালী কোঁকড়ান চুল। তিনি আরকাইটকে আদেশ করিলেন, "তুমি এথেন্সে যাও, সেইখানে তোমার সব দুঃখের অবসান হইবে।" আরকাইট জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ এথেন্সে আমার প্রিয়ার কাছেই আমি যাব। উহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করা বরং সহস্রগুণে ভাল।" তিনি একখানি আরশী তুলিয়া লইলেন। বহুদিন নিজের চেহারা দেখিতে তাঁহার কোনই ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু এখন তিনি তাঁহার প্রিয়ার কাছে যাইতেছেন, তাই তিনি পূর্ব্বের মত সুন্দর আছেন কিনা, দেখিতে ইচ্ছা হইল। মুখ-মণ্ডলের ভয়ানক চেহারা দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, "আমি যদি পরিচয় না দেই তবে বৎসরের পর বৎসর অপরিচিত লোকের ন্যায় এথেন্সে বাস করিতে পারিব।"

তৎক্ষণাৎ এক বৃদ্ধ বিশ্বাসী ভৃত্যকে ডাকিয়া তিনি তাহাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন, এবং তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন সে যেন আরকাইটের নাম গোপন রাখে এবং নিজের কিংবা তার প্রভুর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই উত্তর না দেয়। এথেন্স দেশের সাধারণ লোকেরা যেরূপ কাপড় পরে আরকাইট সেইরূপ বেশভূষা করিয়া এথেন্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এথেন্সে এই দুইটি গরিব লোকের প্রতি কেহ বিশেষ দৃষ্টিপাত করিল না।

ছদ্মবেশে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এমিলিয়ার সর্ব্বপ্রধান ভৃত্যের নিকট গিয়া আরকাইট তাহাকে বলিলেন, "আমাকে তোমার অধীনে একটী চাকরী দেও। আমি সর্ব্বপ্রকার নীচ কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।" ফিলস্ট্রেট্ নামে পরিচিত হইয়া রাজ-প্রাসাদের যে অংশে এমিলিয়া বাস করিতেন, সেই অংশে তিনি ভৃত্যবেশে প্রবেশ করিলেন। তিনি খুব ভাল করিয়াই সর্ব্বপ্রকার ছোট কাজ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বপ্রধান ভৃত্য দেখিতে পাইল যে, যে কাজেই তাহাকে দেওয়া যায় সেই কাজই সর্ব্বদা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। এই জন্য সে আরকাইটকে এমিলিয়ার প্রিয়ভৃত্য রূপে নিযুক্ত করিল। রাজপ্রাসাদের ভদ্রমহিলাগণ শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে আরকাইট একজন কোমলহৃদয় দয়ালু ভৃত্য। তাঁহারা রাজা থিসিয়াসকে বলিলেন যে, যাহাতে সে পৌরুষোচিত কার্য্যে তাঁহার সৎস্বভাব এবং সাহস প্রদর্শন করিতে পারে, ইহার ব্যবস্থা করা উচিত। থিসিয়াস আরকাইটকে নিজের প্রিয় সহচরদের মধ্যে স্থান দিলেন।

সাত বৎসর পরে প্যালামন তাহার এক বন্ধুর সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। রাতারাতি যতদূর সাধ্য ততদূর গমন করিলেন। কিন্তু যখন প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল, তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি একটী ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, পুনর্ব্বার যখন রাত্রি হইবে তখন তিনি দিবসে পলায়ন করিবেন এবং সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এথেন্স আক্রমণ করিবেন। হয় তিনি এমিলিয়াকে লাভ করিবেন নচেৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। যদি এমিলিয়াকে জীবন-সঙ্গিনী করিতে না পারেন তবে বাঁচিয়া কি লাভ?

জঙ্গলের মধ্যে একটী ঝোপের ধারে তিনি বসিয়া আছেন। ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু পড়িয়াছে। সূর্য্যকিরণে তাহা একে একে শুকাইয়া যাইতেছে। ভরত-পক্ষী তাহার আনন্দময় সঙ্গীতে উষাদেবীকে অভ্যর্থনা করিতেছে। তাহারই মিষ্টগানে

রাজপ্রাসাদে আরকাইটের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এখন রাজা থিসিয়াসের সর্ব্বপ্রধান অনুচর। সেদিন প্রভাতে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া উষ্ণিনী পৃথিবীর শ্যামল শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনে হইল প্রকৃতি যেন তাঁহাকে বাহিরে আহ্বান করিতেছে। আস্তাবল হইতে ঘোড়াটী লইয়া তিনি দ্রুতবেগে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী কোপের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘোড়াটীকে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিবার জন্য তিনি বন্যরাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্প সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি গান করিতে লাগিলেন। প্যালামন এই কোপের মধ্যে এক জলাশয়ের ধারে বসিয়াছিলেন। আরকাইটের গান শুনিয়া ভয়ে তাঁহার রক্ত জমিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন আরকাইটই গান গাহিতেছে। তিনি ভয়ে মাটিতে শুইয়া পড়িলেন—পাছে তাহাকে দেখিয়া আবার কারাগারে লইয়া যায়। আরকাইটের এত গান এত আনন্দ হঠাৎ কেন যেন থামিয়া গেল—তিনি বিষাদে অভিভূত হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি মাটিতে প্যালামনের অনতিদূরে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, বিবদ রাজবংশের কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য যে নিজের বিখ্যাত নামে পরিচিত হইতে আমি অক্ষম! কিলসট্রেট —এই নগণ্য নামেই কি চিরকাল পরিচিত থাকিব? আমাদের রাজবংশের কেবল দুইজন মাত্র বাঁচিয়া আছি, প্যালামন আর আমি। প্যালামনকে ত থিসিয়াস তিল তিল করে কারাগারেই বধ করিতেছেন। আর আমি—যদিও স্বাধীন তবুও একেবারে নিরুপায়—থিসিয়াসের একজন ভৃত্য মাত্র। আমার বাঁচিয়াই বা কি লাভ? এই সকল কথা শুনিয়া প্যালামন রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন—গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া একেবারে আরকাইটের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, তুমি সত্য সত্যই ধরা পড়িয়াছ, তুমি রাজা থিসিয়াসের সঙ্গে ছলনা করিয়াছ, তোমার নাম বদলাইয়াছ। এখন যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হয় তোমাকে, না হয় আমাকে মরিতে হইবে। আমার প্রিয়াকে অন্য কেউ ভালবাসিবে—তা, আমি কখনও হতে দিব না। জানিও আরকাইট, প্যালামন তোমার পরম শত্রু। কাল রাত্রে মাত্র আমি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছি; তাই আমার হাতে অস্ত্র নাই বটে, তবুও তোমাকে আমি ভয় করি না। হয় তুমি মরিবে, না হয় তুমি এমিলিয়াকে ভালবাসিবে না—এর কোনটা তুমি চাও?" আরকাইট দাঁড়াইয়া ওরোয়াল বাহির করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি দুঃখে পাগলের মত না হইয়া পড়িতে এবং যদি তোমার হাতে কোন অস্ত্র থাকিত তাহা হইলে তুমি এখান থেকে এক পাও নড়িতে পারিতে না।

আমার এক কথা শুন—তুমি অত্যন্ত সাহসী এবং ভদ্র বলিয়াই তোমাকে এ কথা বলিতেছি। কাল আর কাহাকেও না জানাইয়া আমি এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। উভয়ের জন্য আমি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আসিব। আমি নিজে সজ্জিত হইবার আগেই তুমি নিজের জন্য অস্ত্র শস্ত্র বাছিয়া লইও। আজ রাত্রে এই বনে তোমার জন্য খাবার আনিয়া দিব। যদি তুমি আমাকে কাল বধ করিতে পার তাহা হইলে তুমি এমিলিয়াকে পাইতে পারিবে।"

প্যালামন বলিলেন, "আচ্ছা তাই হউক।"

পরদিন আরকাইট একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া সেই জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। কেহ একটী কথাও বলিলেন না, আদর অভ্যর্থনাও করিলেন না। নিঃশব্দে একে অন্যকে সজ্জিত করিতে সাহায্য করিলেন। যখন দুজনেরই বর্ম্ম পরা শেষ হইল তখন তাঁহাদের হৃদয় হর্ষ ও বিষাদে আন্দোলিত হইতেছিল। তাঁহারা জানিতেন যে একজনের জন্য এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা এমন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহাদিগকে দুইটা হিংস্র জন্তু বলিয়া বোধ হইতেছিল। সিংহবিক্রমে প্যালামন আরকাইটের উপর লাফাইয়া

পড়িলেন। কিন্তু আরকাইট দমিয়া গিয়া একটা ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের ন্যায় প্যালামনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় তাঁহারা ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন—এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই রাজার শিকারীর দল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা থিসিয়াস তরবারি উত্তোলন করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "থাম থাম, তা না হলে তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা কে এখানে এমন করিয়া যুদ্ধ করিতেছ?"

তাঁহারা থিসিয়াসকে সেখানে দেখিয়া একটুকুও ভীত হইলেন না। এমিলিয়া এবং হিপলিটা রাজার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। আরকাইটের আগেই প্যালামন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "বেশী কথা বলিয়া কি দরকার? আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমরা দুজন বড়ই অভাগা—জীবন আমাদের ভার স্বরূপ। আপনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। আপনি জানেন না যে ফিপলট্রেট ছদ্মবেশে আপনার পরম শত্রু। এ আরকাইট—আপনি ইহাকেই নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এমিলিয়াকে সে ভালবাসে, আমিও এমিলিয়াকে ভালবাসি।—আমার নাম প্যালামন, আপনার চিরশত্রু। কারাগার ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছি। সুন্দরী এমিলিয়ার সম্মুখে উভয়কেই মারিয়া ফেলুন।" থিসিয়াস উত্তর করিলেন, "তা সহজেই করা যাবে—তোমরা নিজেরাই ত এ ব্যবস্থা করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া হিপলিটা এবং এমিলিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। এই দুইটী রাজপুত্র এত অল্প বয়সে কেবল এমিলিয়ার জন্য প্রাণত্যাগ করিবেন,—এই কথা ভাবিয়া তাঁহারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য হিপলিটা থিসিয়াসের নিকট অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা থিবসে নির্ভয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতে। কিন্তু ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া এখানে আসিয়াছ—এখানে তোমরা আমার ক্ষমতার অধীন—আর আমি হচ্ছি তোমাদের পরম শত্রু। রাণী হিপলিটা এবং সুন্দরী এমিলিয়ার জন্য তোমাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখনও যুদ্ধ বিবাদ করিবে না। এখন থেকে চিরদিনের জন্য তোমরা আমার বন্ধু হও।" রাজকুমারদ্বয় প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তৎপর থিসিয়াস বলিলেন, "তোমরা দুজনই বীরপুরুষ। তোমরা না হয় একজনে এমিলিয়াকে বিবাহ করিতে পার—কিন্তু সে ত আর দুজনকে বিবাহ করিতে পারে না। কে বিবাহ করিবে ইহা স্থির করিবার জন্য আগামী বৎসর এই দিনে এই স্থানে একটী মল্ল যুদ্ধ হউক। সেই দিন তোমরা এখানে আসিবে। ইচ্ছা করিলে, তোমরা প্রত্যেকে এক শত বীরপুরুষ সঙ্গে আনিতে পার। যে জয় লাভ করিবে সেই এমিলিয়াকে বিবাহ করিবে।" এই কথা শুনিয়া আরকাইট ও প্যালামন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং হৃষ্ট চিত্তে থিবসে প্রত্যাগমন করিলেন। অবশেষে মল্ল যুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। সেই কোপের পাশে সমতল ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করা হইল। মধ্যস্থানে যে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা ছিল সেই স্থানেই যুদ্ধ হইবে স্থির ছিল। এই আঙ্গিনার দুই প্রান্তে দুইটী শ্বেত প্রস্তরের সিংহদ্বার ছিল। এই যুদ্ধের জন্য এত জাঁকজমক হইয়াছিল যে সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে উৎসুক ছিলেন। সকলেই সেদিন আমোদ করিতেছিলেন—কিন্তু এমিলিয়া দুঃখিত ভাবে তাঁহার সহচরিগণের কাছে বলিতে লাগিলেন, "আমার বিবাহ না হলেই কি ভাল নয়? বনে বনে স্বাধীন ভাবে বেড়াইতেই যে আমি অত্যন্ত ভালবাসি! শিকার করিতে, ঘোড়ায় চড়িতে ও ঘুরিয়া বেড়াতেই ত আমার অত্যন্ত ভাল লাগে! আরকাইট ও প্যালামন কেন পূর্ব্বের মত পরস্পরকে ভালবাসিতে পারেন না? আমাকে নিয়ে কেন তাঁরা এত ব্যস্ত?"

যুদ্ধ ভালরূপ দেখিবার জন্য রাজা থিসিয়াস এবং রাণী হিপলিটা এমিলিয়াকে কাছে লইয়া একটী উঁচু জায়গায় বসিলেন। বাঁশী বাজান হইল। আরকাইট পশ্চিম দ্বার দিয়া তাঁহার বীরপুরুষগণকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ

করিলেন। ঠিক সেই সময়েই প্যালামনও পুরস্কার দিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দলেও একশত বীরপুরুষ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল. কিছু কাল যুদ্ধের পর প্যালামন ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন আরকাইট তাঁহাকে বন্দী করিলেন। আবার বাঁশী বাজিল—চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইল। তখন থিসিয়াস বলিলেন, "আর কেন? আরকাইট এমিলিয়াকে বিবাহ করিবে।" উপস্থিত ব্যক্তিগণ আকাশভেদী চীৎকারে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে এই দুই যোদ্ধার প্রতি এমিলিয়ার একটু অনুরাগ জন্মিল। আরকাইট যখন ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার কাছে আসিতেছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া এমিলিয়ার মনে কেমন একটা আনন্দ হইল। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এমিলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কিন্তু আসিতে আসিতে আরকাইটের ঘোড়াটী ভয়ে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং আরকাইট মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এই আঘাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যু কালে তিনি প্যালামন এবং এমিলিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "এমিলিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে যে আমার কি কষ্ট হইতেছে তাহা আমি কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। হায়! মৃত্যু আমাকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিল! এমিলিয়া, আমার চির-বাঞ্ছিতা, আমাকে বিদায় দাও! তোমাকে পাইবার জন্য আমি দীর্ঘকাল প্যালামনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি সত্য—কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি যে প্যালামনের মত মানুষ আমি আর কখনও দেখি নাই। সে তোমাকে ভালবাসিয়াছে এবং চিরজীবন ভালবাসিবে। যদি তুমি কখনও বিবাহ কর তাহা হইলে প্যালামনকেই করিও।" ক্রমে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, 'এমিলিয়া' এই নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি পরলোকগমন করিলেন। এই সাহসী বীরপুরুষের জন্য এমিলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। প্যালামনেরও বাল্যকালের কথা মনে হওয়াতে, চোখে জল আসিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমস্ত গ্রীসবাসী সে শোক ভুলিল, কিন্তু প্যালামন তাঁহার জন্য শোক করিতে লাগিলেন।

দুই বৎসর পর থিসিয়াস একদিন প্যালামন এবং এমিলিয়াকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। প্যালামন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পোষাক পরিয়া আসিলেন কিন্তু এমিলিয়া সাদা কাপড় পরিয়া আসিয়াছিলেন। বহুবৎসর পূর্ব্বে একদিন বসন্তের প্রভাতে যে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া এমিলিয়া বাগানে দাঁড়াইয়াছিলেন—আজও সেই সাদা কাপড় পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। প্যালামন এখন আর আরকাইটের জন্য শোক করেন না—তিনি ও এমিলিয়া উভয়েই পূর্ব্ব প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছেন। এমিলিয়াকে দেখিয়া আবেগে প্যালামনের শ্বাস রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই যে আরকাইটের মৃত্যুর সময় দেখা—তার পর এই সাক্ষাৎ! থিসিয়াস বলিলেন, "এমিলিয়া, আমার ইচ্ছা যে তুমি এখন এই সাহসী বীর প্যালামনকে পতিত্বে বরণ কর। অনেক দিন ধরিয়া ইনি তোমার প্রতি অনুরক্ত,—ইহাকে গ্রহণ কর।" তৎপর প্যালামনকে বলিলেন, "এবিবাহে তোমার সম্মতি আছে, তা আমি জানি, এখন তোমার প্রিয়তমাকে গ্রহণ কর।" মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

সেইদিনই এমিলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে প্যালামনকে দুর্গের সেই জানালা দেখাইয়া বলিলেন, "একদিন প্রভাত কালে এই দুর্গের দিকে চাহিয়া আমি মনে মনে তোমাদের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম।" প্যালামনও বলিলেন, সেই দিনই তিনিও এমিলিয়াকে প্রথম দেখিয়াছিলেন।

শ্রীকমলা বসু।

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ } ভাদ্র, ১৩২৪। { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে তিব্বতীয় বিশ্বকোষ তেঙ্গ্যুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ কালে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তির যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদোক্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চীনগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিয়াঙ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিয়াঙ জাতি যাযাবর ও মেষপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৩০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও যাযাবরত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিরাত জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জ্জিলিঙে যখন গবর্ণমেণ্ট প্রেসের অংশবিশেষের (Tibetan Section) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটী তিব্বতীয় ও কিরাত-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রতিগমন অথবা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে কিছুতেই সম্মত হইত না। অথচ তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন সুন্দরভাবে কার্য্য

করিত, রাধাবাড়ি করিয়া সমস্ত দিন কাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য্য হইত না। চাকরি যাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—যদি তোমরা নিয়মমত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা ক্ষণকাল কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য্য করিতেছে। দৈনিক ৸০ (চারি আনা) উপার্জ্জন হইলেই তাহারা আর কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মদ্য ও রুটী কিনিয়া মনের সুখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্ব্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়। "গ্র-ঠি-চন্-পো (স্বচ্ছাসনবীর) নামক জনৈক ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায় লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছিবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছিবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। ৮।৯০ বৎসর পূর্ব্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় "Persian affinities of the Lichhavis" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারদিকবংশসম্ভূত। তিব্বতদেশের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্য-বংশসম্ভূত। তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon (বন) ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করেন। তাঁহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে "ল্হা—থো—থো—রি" নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে "Zamatog" (কারণব্যূহ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত হয়। এই গ্রন্থে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ নামক ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। "নাম্—রি—স্রোঙ্—চেন্" নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে "স্রোঙ্—চেন্—গম্—পো" নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা স্বয়ং নেপাল-রাজ-দুহিতা ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই দুই পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা স্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম থোন্-মি-সম্ভোট। তিনি অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্যাসিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত সুম্-ভাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহূত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে উৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমনীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে। তিনি যখন বিহারে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহূত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। ত্সেথোঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে যাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্ব্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পালক শান্তরক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি যহোর। তিনিও তিব্বতে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠি-সোঙ-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ অধ্যক্ষ। বিক্রমশিলা বিহার খলিজির খিলিজি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন্ নামক পণ্ডিত দুইখানি বিশ্বকোষ সঙ্কলন করেন। তাহারই একখানির নাম তেঙ্গ্যুর। সঙ্কলনকর্ত্তা বুতোন্ স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শাল্ নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

যুদ্ধের কথা।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণ তিনটী বৎসর অতীত হইয়া গেল পৃথিবীব্যাপী কাল-সমরের অবসান হইল না। অবসানের কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের কথা আমরা যতই ভাবি দুঃখ ও লজ্জায় আমাদের চিত্ত ততই ম্রিয়মান হয়। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যুদ্ধে নিহত হইতেছে, দিবানিশি মানুষ বধ করিবার চিন্তা ও চেষ্টায় কোটী কোটী মানুষ পশুস্বভাব লাভ করিতেছে, দয়া প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া হিংসার চিন্তকে ভরিয়া তুলিতেছে, তথাপি মানুষের চৈতন্য হয় না। কি এক মদিরার ন্যায় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা যেন দিনের পর দিন মানুষকে গিলিয়া ফেলিতেছে। সভ্যতার কি শোচনীয় পরিণাম! ধর্ম্মের কি অধোগতি!

এক সময়ে পুস্তক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাইতাম, স্ত্রীজাতি যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ রহিত হইবে। কিন্তু কই, পৃথিবীর নারীজাতি যুদ্ধ রহিত করিবার কোন চেষ্টাইত করিতেছেন না! যখন সবল দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করে, তখন সেই সবল ধর্ম্মের দোহাই, প্রেমের দোহাই না মানিলে শারীরিক বলের সাহায্যে তাহাকে দমন করিতে হয় এ কথা মানিয়া লইলেও মহাসমর সম্বন্ধে সে কথা এখন আর বলা চলে না। সন্ধি স্থাপন এখন অসম্ভব নয়। রোমের পোপ সন্ধি স্থাপনের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতেছেন, এখন যুদ্ধনিযুক্ত শক্তিগুলি ইচ্ছা করিলেই যুদ্ধের অবসান হইতে পারে, কিন্তু মিত্র পক্ষই এখন সন্ধিস্থাপনের বিরোধী, দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন, জার্ম্মানীকে পদদলিত না করিয়া কিছুতেই তাঁহারা সন্ধি করিবেন না।

ধর্ম্মপ্রচারকগণ যুদ্ধ নিবারণের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহারাও নিজ নিজ পক্ষের জয়লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেই ব্যস্ত। ধর্ম্মবিশ্বাস যখন মানুষের প্রকৃতির অধীন হয় তখন এইরূপই হয়। সম্প্রতি কলিকাতার লর্ড বিশপ বা প্রধান খ্রীষ্টীয় পুরোহিত যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর আরম্ভ হইবার দিনে যে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহার সরল ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যুদ্ধনিযুক্ত

দেশবাসীর সকল ধর্ম্মযাজকই যদি এরূপ ধর্ম্মকামী হইতেন তবে যুদ্ধের অবসানকাল অনেক নিকট হইত। আমরা নিম্নে লর্ড বিশপের উক্তির প্রধান প্রধান অংশগুলি হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তিন বৎসর যুদ্ধের পর আমরা পুনরায় ঈশ্বরের সম্মুখে সমবেত হইয়াছি। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই পরিবর্ত্তন গত বৎসর হইতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের পর যখন আমরা অতীত ঘটনা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন কোন্ ঘটনা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? বহুবিধ অভূতপূর্ব্ব এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিজয়লক্ষ্মী আমাদের করতলগত হইবার উপক্রম করিয়াও দূরে সরিয়া যাইতেছেন। যেদিন দারদেরো ধ্বংসকারী শত্রুপক্ষ আমাদের প্রবল পরাক্রমশালী নৌবাহিনীর গোলাবর্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইতে সহসা কড় বৃষ্টির জন্য পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া যেদিন ফুটল্যাণ্ডের যুদ্ধে আমরা অন্ধকারের জন্য জয়লাভের সুযোগ পাইয়াও জয়ী হইতে পারি নাই, সেই দিন পর্য্যন্ত, আমাদের নৌবাহিনীর অদৃষ্টকে শুভাদৃষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি না। যুদ্ধ-যুদ্ধেও সন্ধে ও আংক্রের সমরে যে সময় আমাদের জয়লাভ সকলে অবধারিত বলিয়া মনে করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কড় বৃষ্টির জন্য আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই। এ সকল ব্যাপার এখন আর কাহারও নিকট অবিদিত নাই। এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া ঈশ্বর আমাদের ইংরাজ জাতিকে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কি বলিয়া আসিতেছেন? ঈশ্বর বারংবার বলিতেছেন—"তোমাদের সংশোধন আবশ্যক, তোমাদের সংশোধন আবশ্যক, সংশোধনের পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে জয় দিতে পারি না।" "তোমাদের সংশোধন আবশ্যক" এই কথা তিনি আমাদের সমগ্র জাতিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে বলিতেছেন। রাষ্ট্রগত হিসাবে আমরা, কোন কোন বিষয়ের সংশোধন করিয়াছি এবং আরো কোন কোন বিষয়ের সংশোধন করিবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু এখনও ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন—"তোমাদের সংশোধন আবশ্যক।" ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সকলেই আশা করিয়াছিল যে এই বৎসরে মিত্রশক্তি নিশ্চিত সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইবে, ইংলণ্ডের প্রত্যেক অধিবাসীর চিত্ত আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। কিন্তু আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাইলাম যে অন্তর্বিপ্লবে রুষিয়া নিষ্পন্দ হইয়া পড়িল, ফলে ইউরোপীয় মহাসমরের পরিসমাপ্তি সুদূর পরাহত হইল। এই ঘটনাবলীর পর একবার সন্ধির কথাও উঠিয়াছিল, কিন্তু সে সন্ধি মিত্রশক্তির অনুকূল হইত না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল—আমেরিকার যুক্তরাজ্য আমাদের সহিত যোগদান করিলেন, ফলে যুদ্ধের স্থিতিকাল অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। এইরূপে আমরা আত্মসংশোধনের জন্য পুনরায় সুযোগ পাইলাম—ভগবানের সেই আদেশ পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইল—"তোমাদের সংশোধন আবশ্যক—সংশোধনের পূর্ব্বে আমি কিছুতেই তোমাদিগকে জয় দিতে পারি না।" এস, আজ আমরা রাষ্ট্রগত এবং ব্যক্তিগত ভাবে আত্মাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করি, এস সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন করুন এবং সেই পরিবর্ত্তিত চিত্তে নূতন ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য আমাদিগকে আন্তরিক আগ্রহ প্রদান করুন।"

অনন্তর বিশপ মহোদয় বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে "আমাদের লক্ষ্য" সম্বন্ধে বলিলেন—

"আমাদের লক্ষ্য প্রথমে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। আমাদের লক্ষ্য ন্যায়বিচার, দয়া, বিশ্বাস এবং স্বাধীনতা। একটি রাজ্য অন্য একটি রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অপর একটি রাজ্যের অস্তিত্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে 'বাহুবলের জয়' এই নীতি প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্যই আমরা এখনও যুদ্ধ করিতেছি।

কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সমরকালেও আমরা যে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি তাহার

লক্ষণও পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি যে এই যুদ্ধে যদি জার্ম্মানির জয় হয় তাহা হইলে যুদ্ধকালে জার্ম্মানি ইচ্ছা পূর্ব্বক যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছে, সেই সকল কার্য্য যুদ্ধের অঙ্গবিশেষ বলিয়া সমগ্র পৃথিবীকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ গত বৎসরে, কি পার্লামেণ্ট মহাসভাতে আর কি সংবাদ-পত্রে সকলে মহা আগ্রহের সহিত এই কথা বলিয়াছে যে জার্ম্মানদিগের প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার করিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিশোধ লওয়া হউক। আমরা যদি তাহা করি, তবে ত যুদ্ধকালে ঐরূপ পৈশাচিক কার্য্যে আমাদেরও সমর্থন করা হইবে। যদি আমরা সভ্যতানুমোদিত যুদ্ধের রীতিনীতি রক্ষা করিয়া না চলি, তবে কে তাহা রক্ষা করিবে? আমাদিগকে সকল বিষয়েই সরল এবং উদার হইতে হইবে। যদি আমরা কোন অন্যায়, নিষ্ঠুর অথবা অসম্মানসূচক কার্য্য করি অথবা আমাদের সৈন্যের ঐরূপ কার্য্যের সমর্থন করি, তাহা হইলে আমরা যে ন্যায়, দয়া ও সাধু বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ করিতেছি এ কথা বলিবারও অধিকার আমাদের থাকিবে না। তবেই আজ আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য যে সমবেত হইয়াছি তাহা ভণ্ডামিতে পরিণত হইবে।

আমরা যে কেবল জার্ম্মানদিগের সমরনীতির বিরোধী বলিয়া যুদ্ধ করিতেছি তাহা নহে। জার্ম্মানদিগের মত এই যে, শক্তিশালী জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিজিত জাতিকে দাসত্বে নিয়োগ করুক; আমরা জার্ম্মানির এই মতের বিরোধী বলিয়া যুদ্ধ করিতেছি। যদি জার্ম্মানির এই মত সকলে গ্রহণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধের কখনই শেষ হইবে না এবং শক্তিশালী জাতি যখনই কোন দুর্ব্বল জাতিকে আক্রমণ করিবে, তখনই জার্ম্মানির দোহাই দিয়া বলিবে তাহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার প্রচার উদ্দেশ্যেই দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ঈশ্বর যে জাতিকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই জাতি বড়ই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক, নিজ নিজ প্রকৃতি লইয়াই বিদ্যমান থাকুক এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমরা সমর্থন করি। এই বিষয়েও আমাদিগকে মনে জ্ঞানে নির্দ্দোষ থাকিতে হইবে। আমরা ভারতীয় সৈন্য ও ভারতের মিত্ররাজ্যের সাহায্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছি। ভারতবাসী বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্তর্বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল বলিয়াই আমরা ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি। এখন আমাদের অনুসৃত সমরনীতির দিক হইতে ভারতে সম্রাটরূপে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এই যে ভারতবাসী যাহাতে তাহাদের প্রকৃতির অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে! যদি আমরা এই দেশে আমাদের উল্লিখিত লক্ষ্য প্রচারে বিমুখ হই তাহা হইলে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—আমরা স্বাধীনতার পক্ষপাতী বলিয়া যুদ্ধ করিতেছি—এই কথা বলা ভণ্ডামি।

কিন্তু যদিও আমরা এ কথা স্বীকার করিতেছি যে যুদ্ধের প্রথমাবধি আমাদের লক্ষ্য স্থির আছে, তথাপি নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশে উহার নূতন অর্থ হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য আমাদের পক্ষে যোগদান করাতে এবং রুষিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব হওয়াতে, আমরা যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি এই ধারণা বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে। এতদিন আমরা, একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা পাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম, এখন আমরা বুঝিতেছি যে আমরা প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিতরে প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করিতেছি। আমরা প্রজাশক্তির বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করিতেছি।

যুদ্ধের আরম্ভ কাল অপেক্ষা এখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু সমধিক উন্মীলিত হইয়াছে, আমাদের হৃদয় সমধিক উন্নত হইয়াছে, এখন এস আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করি, যেন আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর যোগ্যতা লাভ করি।"

অনন্তর বক্তৃতার তৃতীয় অংশে মিঃ পল মহোদয় শত্রু-মিত্র সকলের কল্যাণ-কামনা করেন এবং চতুর্থ অংশে ঈশ্বরের গুণবাদ করেন।

চীন-রমণীর আত্মকাহিনী।

কলিকাতায় চীন রমণী অধিক দেখিতে পাই না, যাহারা আছে, তাহারা ঘর হইতে বড় বাহির হয় না। চীন বালিকাদের পদবন্ধনের প্রথা এখানে নাই। তাহাদের দেশেও এ প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। বাল্যকালে পা দুইখানি বাঁধিয়া চিরকালের জন্য পঙ্গু না করিলে চীনদিগের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইত না। পা দুইখানি সামান্য দুইটি মাংসপিণ্ডের ন্যায় হইলে, লোকে বলিত, ইা সুন্দরী বটে! যখন পা বাঁধা হইত, তখন প্রায় এক মাস বালিকারা যাতনায় উচ্চৈঃস্বরে রাত্রিদিন চীৎকার করিত। তখন লোকে বলিত যে, "ও কিছু নয়। টিউর মেয়ের পা বাঁধা হইয়াছে সেই জন্য চীৎকার করিতেছে।"

চীন দেশের ভদ্রমহিলাদের কথা বড় কেহ জানে না। ঘর হইতে তাহারা প্রায় বাহির হয় না। ঘরে বসিয়া তাহারা শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে, সংসার-ধর্ম্মের কাজ কর্ম্ম করে। কিন্তু ক্রমে তাহাদের চক্ষু ফুটিতেছে। স্বামী বিদেশে গমন করিলে অনেকে এখন তাঁহাকে চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে। বড় ঘরের এক চীন-রমণী তাঁহার স্বামীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকখানি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমি নিম্নে প্রদান করিলাম। পত্রলিখন সুবন্ধের আচার ব্যবহার ইহাতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম পত্র—বিরহ।

প্রিয়তম! তুমি বিদেশে গমন করিয়াছ। আমাদের সুখ এখন প্রাণশূন্য হইয়াছে। বৈকালবেলা আমি ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াই। রক্তবর্ণের সোনাকার সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন দেখিতে পাই। কিন্তু সে সব দেখিয়া আমার সুখ হয় না। দুই জনে একসঙ্গে যে সুখভোগ করি, তাহাই সুখ। আমার ঘরে যে আসনে বসিয়া তুমি ধূম পান করিতে, মিকি তাহা বাহিরে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহা আমি করিতে দেই নাই। চক্ষু বুজিয়া মনে মনে ভাবি, তুমি যেন সেই আসনে বসিয়া আছ। পূর্ব্বে সেই বামন গাছটী দেখিতে ভাল বাসিতাম। কিন্তু এখন বোধ হয় যে, ভগবান্ যে গাছকে দীর্ঘ ও বড় করিয়াছেন, তাহাকে আঁধার ও পানীয় জল না দিয়া, ভাঙ্গিয়া ও বাঁকাইয়া এরূপ বামন গাছে পরিণত করা মানুষের উচিত হয় নাই। তুমি আমাকে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিতে বলিয়া গিয়াছ। কিন্তু তোমার পূজনীয়া মাতা বলেন,—"আমাদের কালে পতি-পত্নীতে এরূপ পত্র লেখার রীতি ছিল না। এখনকার স্ত্রীলোকেরা অতি বেহায়া হইয়াছে।"

দ্বিতীয় পত্র—নব বিবাহিতা বধূ।

প্রিয়তম! এক সপ্তাহ হইল তুমি বিদেশে গমন করিয়াছ। প্রথম প্রথম আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল, এখন সেই কষ্ট আমার হৃদয়ের গভীর দেশে প্রবেশ করিয়াছে। তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী আমাকে চাউলের ঘরের চাবি দিয়াছেন। ইহাতে আমার সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় এখন তিনি আর আমাকে বুদ্ধিহীনা সামান্য বালিকা বলিয়া মনে করেন না। যে দিন প্রথম আমি তোমাদের বাটীতে আসিয়াছিলাম, সে দিন এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমার মাতা পিতা আমাকে শুধু হাতে পাঠান নাই। জিনিষ পত্র লইয়া অনেক লোক আসিয়াছিল। অনেকগুলি রেশমি বিছানার চাদর ছিল। বেশ বাহির হইতে তাহাদের সোনারূপার কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ভাবে তাহাদিগকে ভাঁজ করা হইয়াছিল। নানা বর্ণের লাক্ষা দ্বারা অলঙ্কৃত পাত্রে সেই রেশমি চাদরগুলি ছিল। তাহার পর আমার বাপ মা আমার সঙ্গে নানারূপ বাসন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তরকারি রাখিবার পাত্র ও চুবড়ি, আমার পরিচ্ছদ রাখিবার কর্পূরকাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স, শত শত এইরূপ দ্রব্য আসিয়াছিল। পথে আমাকে পার করিয়া ভারবাহকগণ যখন অগ্রে গমন করিল, তখন আমি মনে মনে বলিলাম,—"যাও, তোমরা আগে যাও, দ্রব্যাদি দেখিয়া পতিগৃহে যেন সকলে আমাকে আদর করেন।" তাহার পর গান বাজনা করিয়া নিশান উড়াইয়া এক দল লোক আসিল।

আমি রক্তবর্ণে রঞ্জিত পাল্কিতে বসিয়াছিলাম। সেই বস্ত্র কাপড় দ্বারা এত ঘনভাবে আবৃত ছিল যে, আমি সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম না।"

পাল্‌কি হইতে যখন সকলে আমাকে নামাইল, তখন মাটিতে আমি পা রাখিতে পারিতেছিলাম না, ভয়ে আমার হাত কাঁপিতেছিল। আমি রক্তবর্ণের কাপড় পরিধান করিয়াছিলাম, আমার কেশরাশি মুক্তায় অলঙ্কৃত ছিল, আমার দুইহস্তে ভারি বালা ও চুড়ি ছিল, আমার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল। বাপ মায়ের নিকট হইতে আমার এই প্রথম ছাড়াছাড়ি। অপরিচিত লোকের বাড়ী আসিয়াছি। মনে ভাবিলাম যে, যদি এখানে আমি আদর না পাই তাহা হইলে আমার ভাতের থালা চক্ষের জলে পরিপূর্ণ হইবে। প্রথম তোমার পিতৃপুরুষদিগের বেদিতে গিয়া নমস্কার করিলাম। তারপর তোমার পূজনীয়া মাতার সম্মুখে তুমি ও আমি হাঁটু পাড়িয়া বসিলাম। সেই সময় প্রথম আমি তোমাকে দেখিলাম। তোমার কি মনে পড়ে, যখন তুমি আমার ঘোমটা খুলিলে, আমি মুখ অবনত করিলাম। আমি ভাবিলাম—"ইনি কি আমাকে সুন্দরী দেখিলেন?" যেন তাহাই হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া আমি দয়াদেবী কোয়ানয়িনকে ডাকিতে লাগিলাম। একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম; দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। অনেক কন্যার মুখ আমি শুনিয়াছিলাম যে, তাহাদের স্বামীকে প্রথম দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কারণ তাহাদের স্বামী বৃদ্ধ ও কদাকার। আমি মনের মত স্বামী পাইয়াছি। সে জন্য দয়াদেবীর প্রতিমার সম্মুখে এখনও প্রতি সন্ধ্যাবেলা বাতি প্রজ্বলিত করি।

প্রতিদিন প্রত্যূষে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি। সামান্য ভাবে চুল বাঁধিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া তোমার পূজনীয়া মাতার নিকট গমন করিয়া প্রণাম করি। তাহার পর রন্ধনশালায় দেবতাকে চাউল ও জল প্রদান করি ও তাঁহার সম্মুখে ধূপ প্রজ্বলিত করি। তাহার পর সেদিন কি রন্ধন হইবে, সে বিষয়ে পাচিকার সহিত পরামর্শ করি ও চাকরগণ বাজার-দ্রব্যাদি যথামূল্যে ক্রয় করিয়াছে কি না, সে বিষয়ে তত্ত্ব করি। ঘরে যেভাবে ফুল সজ্জিত হইবে সে সম্বন্ধে ঝিকে উপদেশ প্রদান করি। চাবির গোলো লইয়া এ ঘর হইতে ও-ঘরে যখন গমন করি, তখন আমার আহ্লাদ ধরে না। আমি ভাবি যে, এখন আমি এই বাটীর গৃহিণী হইয়াছি। সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে তোমার ভগিনী ও আমি ছাদে বসিয়া রেশমের উপর পুষ্পের কাজ করি। ইত্যাদি।

তৃতীয় পত্র—সুন্দরী লিটি।

প্রিয়তম! আজ এক নূতন সংবাদ তোমাকে প্রদান করিতেছি তোমার ভ্রাতা চিংএর শীঘ্র বিবাহ হইবে। চিলির শাসনকর্ত্তার কন্যা লিটির সহিত তাহার পরিণয় হইবে। শুনিতেছি লিটি পরমাসুন্দরী, আর লেখা পড়া জানে। তোমার মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকের আবার লেখা পড়া কি!

আমাদের বাটীতে আর একটী দাসী আসিয়াছে। তোমার পূজনীয়া মাতা কেন এই বালিকাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা জানি না। ইহারা উত্তর চীনের কৃষক। সে স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। অপরিচিত লোক অনাহারে মরিয়াছে। সুযোগ পাইয়া দাসব্যবসায়ীরা বালিকা ক্রয় করিবার নিমিত্ত সে স্থানে গিয়াছিল। কিন্তু এই বালিকার মা কিছুতেই ইহাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। তাহার পর ইহারা ভিক্ষা করিতে করিতে আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তোমার মাতা তাহার পিতার নিকট বালিকাকে ক্রয় করিলেন। পরদিন সকলে দেখিল যে, এক স্ত্রীলোক আলু থালু বেশে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। বালিকা আমাকে বলিল, "ঐ স্ত্রীলোকটী আমার মা।"

চতুর্থ পত্র—দেবতাদিগের বসিবার ভার।

প্রিয়তম! তোমার ভ্রাতৃবধূ লিটি আমাদের বাটীতে অনেক দাস দাসী জিনিস পত্র আনিয়াছে। আমাদের ঘরে স্থান হয় না। তোমার মাতা বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। লিটি সুন্দরী বটে, কিন্তু বড় বাচাল। আপনার বেশ ভূষা লইয়া অনেক সময় অতিবাহিত করে। তোমার মা'র তিরস্কার ইহাকে বহু সহ্য করিতে হইবে।

লিটি অনেক শাস্ত্রকথা জানে। সে আমাকে বলিল যে, শয়নের খাট যথাস্থানে না রাখিলে রাত্রিকালে ভূত আসিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির জীবাত্মা চুরি করিয়া লইয়া যায়। পর্দ্দা ভালরূপে খাটাইলে ভূতগণ সেই পর্দ্দার উপর পতিত হয়, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

আমাদের রান্নাঘরে সে এক নূতন দেবতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা আমি করিতে দিই নাই। তোমার মাতা আমাকে বলিলেন, "লিটির পিতার সহিত সাক্ষাৎ একবার হইলে হয়! তাহাকে আমি বলিব যে, কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতে লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছ, কিন্তু কন্যাকে সুশিক্ষা দিতে যদি দশ হাজার টাকা খরচ করিতে, তাহা হইলে ভাল হইত।" তোমার ভগিনীও লিটির সঙ্গী, দুই জনে সমস্ত দিন হাসি তামাসা লইয়া থাকে। সে জন্য তোমার মাতার এক দিন রাগ হইয়াছিল।

প্রাতঃকালে লিটি আরসি সম্মুখে রাখিয়া সাজ করিতে থাকে। দুই জন দাসী তাহার নিকটে থাকে। একজন জলের গামলা ধরিয়া থাকে। অন্য জন সাজের দ্রব্যাদি একে একে দিতে থাকে। উষ্ণ জলে মুখ ধুইয়া মুখ অল্প উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহার উপর লিটি সুগন্ধ বিশিষ্ট মধু লেপন করে। মুখে শুভ্র তণ্ডুলচূর্ণ, গণ্ডদেশ দুইটী ও অধর রক্তবর্ণে, ও ভ্রূদ্বয় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে। তাহার চুল অতি সুন্দর। মণি মুক্তায় কেশরাশি অলঙ্কৃত করে। তাহার পিতা তাহাকে অনেক মূল্যবান গহনা দিয়াছেন। সেই সকল গহনায় সে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করে। তোমার মাতা এত সাজ গোজ ভালবাসেন না। তিনি বলেন,—"সুন্দর মুখশ্রী অপেক্ষা পবিত্র হৃদয় ভাল।" তাহাকে ও তোমার ভগিনীকে কনফিসিয়স লিখিত নীতিশাস্ত্রের প্রতিদিন এক একটী শ্লোক মুখস্থ করিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন।

আমাদের বাড়ীর নিকট যে মঠ আছে, তাহার মহান্ত বড় বিপদে পড়িয়াছেন। কোথা হইতে এক প্রকার মানুষ আসিয়া বরাবর বহুদূর পর্য্যন্ত উচ্চ উচ্চ থাম বা খোঁটা পুতিতেছে। তাহার উপর তাহারা তার বসাইতেছে। শুনিয়াছি যে, এই তার-পথে তাহারা সংবাদ প্রেরণ করিবে। মহান্ত রাজকর্ম্মচারীর নিকট নালিশ করিলেন যে,—"মন্দিরে ঠাকুরদের যখন পূজা হইবে, তখন কাঁসর ও ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা নামিয়া আসিবেন। কিন্তু সম্মুখে তার দেখিয়া তাঁহারা সেই তারের উপর বসিবেন। তারের উপর কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহারা স্বর্গে ফিরিয়া যাইবেন। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিবেন না।" রাজকর্ম্মচারী ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম পত্র—সহস্রহস্তা দেবী।

প্রিয়তম! সহস্রহস্তা দেবীর মন্দিরে আমরা পূজা দিতে গিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে কত কি দেখিলাম। কোথাও মহিষ পরিচালিত জল তুলিবার চাকা ঘুরিতেছে, কোনস্থানে স্ত্রীলোকেরা মাছ ধুইবার নিমিত্ত নদীতীর হইতে জল সংগ্রহ করিতেছিল। বাঁশবনের ভিতর লুক্কায়িত কত গ্রাম দেখিলাম। নদীতীরে নৌকার উপর পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বাস করে এরূপ অনেক পরিবার, ছেলেদের নৌকাগুলিতে মাছ ধরিবার নিমিত্ত বহু পোষা মাছরাঙ্গা পাখী বসিয়াছিল। তা ছাড়া আরও শত শত ছোট বড় নৌকা যাইতেছিল। পৃথিবীতে যে এত নৌকা আছে তাহা আমি জানিতাম না। নৌকা হইতে নামিয়া আমরা মন্দিরের দিকে যাইতে লাগিলাম। সেদিন মেয়েদের পার্ব্বণ ছিল। পথের দুই ধারে বসিয়া সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক দেবতাকে ডাকিতে ছিল। মনে হইল যেন পৃথিবীর সমস্ত রমণী আজ দেবীর পূজা দিতে আসিয়াছে। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দেবতাদিগকে ভুলাইবার নিমিত্ত কাগজের টাকা আগুনে ফেলিয়া দিলাম। ধূম আকারে সেই টাকা স্বর্গের দিকে উঠিতে লাগিল। তাহার পর বহুহস্তা দেবীকে ও ধ্যানে মগ্ন বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রধান আরাধ্যা দয়া দেবী কোয়ান-ইন। তিনি আমার দয়াময়ী মা। অতি ভক্তি ভাবে তাঁহাকে আমি পূজা করিলাম।

আমার প্রিয়তম পতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, সেজন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম। তাহার পর আমরা লাল মাছের মঠে গমন করিলাম। ছোট একটী জলাশয় রক্তবর্ণের মৎস্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। পিষ্টক চূর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া আমরা জলে ফেলিতে ছিলাম। ঠেলা-ঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া মাছেরা আসিয়া তাহা খাইতে লাগিল। এইরূপ নানা বিষয় দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা আমরা গৃহে ফিরিলাম। (বঙ্গবাসী)

স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা।

শুনিতে পাই বঙ্গদেশে নাকি স্ত্রীশিক্ষার আদর হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা নাকি অভিভাবক-কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচিত হইয়াছে। সত্যই কি তাই? কিন্তু এখনও ত দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ব্যক্তির অভাব নাই। অনেক সুবিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া থাকেন,—আমাদের শিক্ষা পুরুষের অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। আবার কেহ কেহ ভারত-নারীর সহিত ইংলণ্ডের তুলনাও দিয়া থাকেন। যে দেশে আজও হাজারে মাত্র চারিজন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে সে জাতির এখনও এবিষয় মীমাংসার সময় আসে নাই। মেয়েদের সহিত আমাদের এখন তুলনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। শিক্ষার অর্থ কি? নাটক নভেল পড়িতে পারিলেই বা ধোপা দুধের হিসাব রাখিতে পারিলেই কিংবা সাবান এসেন্স মাখিতে জানিলেই কি শিক্ষিত হওয়া যায়? শিক্ষার অর্থ ত তাহা নহে। যে শিক্ষাতে আত্মজ্ঞান এবং চিন্তাশক্তিকে ফোটাইয়া তোলে, যে শিক্ষাতে স্বাধীনতার বোধ জন্মায়, যার শক্তিতে সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া বক্ষ বিশাল করে তাহাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে। এখনও আমাদের দেশের লোকের ধারণা, মেয়েদের লেখাপড়া ততটুকু শেখা দরকার যতটুকু না হইলে তাদের বর পাইতে মুস্কিল হয়। সংসারের শত প্রকার কাজ করিয়া যদি সময় পাইল তবেই লেখাপড়া শিখিবে। সংসারের কাজ সর্ব্বাগ্রে, লেখাপড়া পরে। পিতামাতা ছেলেদের জন্য তবুও দুপয়সা খরচ করিতে রাজী কিন্তু মেয়েটীর জন্য এক পাইয়ের স্থানে দুইটী পাই খরচ করিতে নারাজ। ইহাই কি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধির চিহ্ন? আমি কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মূলগুলির যেন মা বাপ নাই। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ইহার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন না, খোঁজ খবরই লন না। কস্মিনকালেও বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন না। আমাদের নারীভক্ত গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন কিন্তু দেশীয় লোক উদাসীন হইলে কিরূপে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইতে পারে? মেয়েদের সেলাই শিখিবার সুচ সুতা কাপড়ের টাকাও গবর্ণমেণ্ট দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? স্থানীয় গণ্য মান্য ভদ্রলোকের মেয়েরাই ঐসব বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। তাহারা সুচ সুতা কিনিতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইতেছে ইহা যখন ভাবি তখন লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। মেয়েগুলির কিন্তু কেমন পড়াশুনা করিবার উৎসাহ দেখিয়াছি। এত টুকটুকে মেয়েগুলি বাড়ীতে কত প্রতিকূল ঘটনার মধ্যদিয়া আসিয়া স্কুলে উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। যখন মনে হইয়াছে, এই সুন্দর রুচি মেয়েগুলিকে অনতি-বিলম্বে এই পাট তুলিতে হইবে, বিবাহরূপ নাগপাশে আবদ্ধ হইতে হইবে, তখন প্রাণে অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ৬।৭।৮ বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাহা খতম্ করিলে শিক্ষা কতটুকু হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ৫।৬ বৎসরও যদি পিতামাতার ঘরের আশ্রয়ে পড়িতে পাইত তবুও হইত। তাহাও ত নয়। তবেই দেখা যাইতেছে, মেয়েদের শিক্ষা বলিতে যাহা তাহার কিছুই হইতেছে না। এক আধটু পড়িতে শিখিয়া ভবিষ্যতে নাটক নভেল পড়িয়াই তাহার সদ্গতি করিতেছে। কারণ সৎপুস্তকের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার মত শক্তি তাহাদের জন্মায় নাই। "কথামালা" পড়িয়া যাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হয় এবং শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জননী হইতে হয়, তারা গল্প আখ্যায়িকা কথা ব্যতীত আর বেশী কি বুঝিবে? অপ্রাপ্তবয়সে সন্তানের জননী হইয়া এবং ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হইয়া যাইতেছে যে ইহা গুরুতর চিন্তার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। চারাগাছকে হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিলে চারা যেমন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তেমনি আমাদের বঙ্গনারীরা হাঁড়ি চাপা অবস্থায় থাকিয়া দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। প্রায় প্রত্যেক হিন্দুগৃহেই দেখিতে

পাওয়া যায় মাতারা সূতিকা নামক রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহাদের মুখ শুষ্ক এবং মলিন। আমাদের দেশে কথায় কথায় বলে "কুড়ি হলেই বুড়ী।" তা হবেইবা না কেন? ১৪ বৎসর বয়সে ছেলে হইতে আরম্ভ করিয়া যদি প্রত্যেক বৎসরে একটী করিয়া হয় তা হলে কুড়ি বৎসরে বুড়ী না হওয়াই ত আশ্চর্য্যের কথা। এইরূপ নিস্তেজ, রুগ্ন স্ত্রী লইয়া পুরুষেরা যে কি সুখে সংসার করেন বলিতে পারি না। অসুস্থ শরীর লইয়া না পারেন ইঁহারা সুসুশৃঙ্খলরূপে গৃহকার্য্য করিতে, না পারেন তাঁরা ঠিক মত সন্তান পালন করিতে। ফল এই হয় যে সংসার দুঃখময় হইয়া উঠে। রুগ্ন মাতার রুগ্ন সন্তান লইয়া সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাহারও মত এই যে "গৃহের সমস্ত সুখদুঃখ অভাব অভিযোগ সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিবার শিক্ষা যিনি পাইয়াছেন তিনি উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য।" "গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে।" প্রথম কথার উত্তর এই, যিনি ঐরূপে গৃহের পরিপাট্য এবং সুসুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ তিনি ত নিশ্চয়ই সুশিক্ষিতা। কিন্তু একটী ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে যেরূপ শিক্ষা পাইয়া স্বামীগৃহে গমন করে তাদের কি ঐরূপ সামর্থ্য আছে? থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, কেবল গৃহের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিলেই কি স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল মনে করিতে হইবে? কখনই না। কেবলমাত্র ঘরকন্না করিতে পারিলেই তাহাকে সুগৃহিণী বলা যাইতে পারে না। উচ্চশিক্ষিত স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে, নতুবা গৃহ কখনও সুখের আগার হইবে না। গৃহে গৃহে এই অশান্তি বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়াই গৃহে গৃহে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে।" পূর্ব্বে ঠাকুরমা দাদামহাশয়েরা প্রায় একরূপই শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের চিন্তা প্রায় একরূপই ছিল, তাই তাঁদের মধ্যে মিল ছিল, কিন্তু এখন কি দাঁড়াইয়াছে? ইংরাজীশিক্ষিত যুবক নানা আশা ভরসা ও উচ্চ আদর্শ লইয়া সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী কিছুতেই তাঁর উচ্চভাব আয়ত্ত করিতে পারেন না দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্না অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে অন্য দশজন শিক্ষিত বন্ধুর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হাসিয়া খেলিয়া সময় কাটাইতে শুরু করেন। কেন গৃহ তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না? এইরূপে এই সকল উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ দেশের বিশেষ কোনও উপকার হইতেছে না। ছাত্রাবস্থায় তাঁদের যেরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সৎকার্য্যে উৎসাহ, মনের উদারতা দেখা যায়—কেন বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল সদ্‌গুণ বিলীন হইয়া যায়? গৃহে পায় না পাওয়াতেই দেশের লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। অতএব নারীকে সুগৃহিণী করিতে হইলে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিয়া তাহাকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার দ্বিতীয় অন্তরায় অবরোধ প্রথা। পুঁথি-গত বিদ্যা যতই হোক না কেন তাহা ততদিন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকে যতদিন মানুষ দশজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত মিশিয়া ভাব এবং চিন্তার আদান প্রদান না করে। আমার যাহা নাই তাহা অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব এবং আমার যাহা আছে তাহা অন্যে পাইয়া লাভবান হইবে, এইরূপ আদান প্রদান না থাকিলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। অবরোধ প্রথা বিদ্যমান থাকিতে এশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে না। পুরুষ এবং নারীর স্বভাবে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। সংসারের বহু প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইবে বলিয়া পুরুষের দেহ এবং মন কঠিন; আবার নারী জননী, ধরণী গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী হইবে বলিয়া ভগবান তাহাকে প্রেমময়ী কোমলা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুরুষ এবং প্রকৃতির ভাব ও চিন্তার যত আদান প্রদান হইবে ততই পুরুষ প্রকৃত পুরুষত্ব এবং নারী প্রকৃত নারীত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের দেশে ইহা হয় না বলিয়াই আমাদের দেশ এবং সমাজের এইরূপ হীনাবস্থা। কতকগুলি হৃদয়বিহীন কঠোরপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও কতকগুলি নিস্তেজ অনুপিতবৎ

নারী লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছে। জানি না ভগবান কবে এ দেশের উন্নতিসাধন করিবেন।

সর্ব্বদা পাত্রী পাত্রী করিয়া ঘাতায়াত করা সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চল বাদ্যগায়। অনেক স্থলে পাত্রী পাওয়াই যায় না; এরূপ অবস্থায় মেয়েদের হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়ার রীতি হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক জায়গায় দেখিয়াছি মেয়ে ১২ বৎসরের হইয়াছে কিন্তু তখনও বর পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু তাহার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে; কারণ এতবড় মেয়ে কিরূপে স্কুলে যাবে? সে বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে তবুও স্কুলে যাইবে না। পিতামাতারা ইহা বোঝে না, যে এত বড় মেয়ে বাড়ীতে থাকিয়া অন্য দশজন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে মিশিয়া কিরূপ অকালপক্ক হইয়া পড়ে। সেই জন্য ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টান সমাজের একটী ১২ বৎসরের মেয়ে ও হিন্দু সমাজের একটী ১২ বৎসরের মেয়েতে অনেক প্রভেদ। প্রথমটী অকালপক্ক, দ্বিতীয়টী ফুলের মত কোমল।

হিন্দুসমাজকে যে কত সমস্যার পূরণ করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না। অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যাকে সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থের মধ্যে না রাখিলে পরিণাম ভাল হইবে না। ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া পয়সা আনিবে এই ধারণায় আমরা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, এরূপ কয়জনে ভাবিয়া থাকি? মেয়েরা যখন পয়সা আনিবে না বরং পয়সা ব্যয় করিবে তখন এই কথা উপলব্ধি করিতে জানী পিতামাতার প্রয়োজন। আর একটী বিষয় আমাদিগকে বিশেষরূপে ভাবিতে হইবে। শিক্ষিতা বয়স্কা মেয়ের বিবাহ তাহার মতামত জানিয়া দিতে হইবে। মেয়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলে পিতামাতার পছন্দকেই মানিয়া লইতে পারে কিন্তু যে মেয়ের মতামত, পছন্দ-অপছন্দ জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাকে তাহার মতামত না লইয়া বিবাহ দেওয়া কদাচ উচিত নহে। এইরূপ বিবাহের ফল বিষময় হইতে পারে। মেয়েকে একরূপ শিক্ষা দিয়া অন্য প্রকার ঘরে বিবাহ দিলে বিধীহ কখনও সুখের হয় না। মেয়েকে উদার ভাবে শিক্ষা দিয়া অনুদার গৃহে বিবাহ দিলে মেয়ের সুখ কখনও হইতে পারে না। অতএব পিতামাতাকে এই সব দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন "মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া কি হবে? তারা কি চাকুরী করে খাবে?" কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মেয়ে চাকুরী করিয়া খাইতে পারিলেই বোধ হয় সেই অবস্থায় ভাল হইত। বিধবা যখন ৩৪ টী শিশু লইয়া অসহায় অবস্থায় অন্যের গলগ্রহ হয় তখন তাহার কি যন্ত্রণাই সহ্য করিতে হয়। তিনি যদি সুশিক্ষিতা হইতেন এবং সমাজ যদি তাঁর ধনোপার্জ্জনের উপায় বিধান করিয়া দিতেন তবে কি তাঁর অবস্থা শতগুণ ভাল হইত না? অন্যের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা সদুপায়ে অর্জ্জিত ধনে সৎ, স্বাধীন জীবন যাপন করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, সুশিক্ষিতা অর্থহীনা বিধবা চাকুরী করিয়া সন্তানগুলিকে মানুষ করিয়াছেন। শিক্ষিতা কন্যা পুত্রের কাজ করিতেছেন, নির্ধন, রুগ্ন পিতার সাহায্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভাইবোনগুলিকে মানুষ করিয়া এক একটী সংসার তুলিয়া ধরিতেছেন। শিক্ষিতা নারী রোগগ্রস্ত, উপায়হীন স্বামীর একমাত্র আশা এবং ভরসাস্থল হইয়া তাঁহার প্রাণে সাধ্যমত শান্তিধারা বর্ষণ করিতেছেন।

এইত গেল কুমারী কন্যার সমস্যা। তারপর বালবিধবা কন্যার সমস্যা সমাজকে পূরণ করিতে হইবে। যে কন্যার অজ্ঞানাবস্থায় বৈধব্য ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে? যে সমাজ পিতামাতাকে গৌরীদানের ফল দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিয়াছে, যে সমাজ জাতি নাশের ভয় দেখাইয়া আকুল করিয়াছে সেই সমাজকে অবশ্যই ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। বালবিধবার দীর্ঘনিশ্বাসে সমাজও মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোককে বলিতে শুনিয়াছি "কেন, বিধবাদের দুঃখ কি?" "ব্রহ্মচর্য্য করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত" ইত্যাদি ইত্যাদি। "ব্রহ্মচর্য্য" কথাটীত বড়

সহজ কথা নয়। শুনিতে এবং বলিতে যেমন কিন্তু জীবনে পালন করা বড় কঠিন। যদি গোবর খাওয়া কি গঙ্গাস্নানের মত একটা সোজা কাজ হইত তা'হলে ভাবনার কথা ছিল না। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কত মহর্ষি আজীবন ধ্যান ধারণা তপস্যা করিয়াও ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হন নাই। যে কচি মেয়েটী জীবনে স্বামী কি তাহাই জানিল না, স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাহাকে সমুদয় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে, তার সম্বন্ধে সমাজ এই ব্যবস্থা করিলেন। আর তারই বাপ ভাইকে সে দেখিল তৃতীয় চতুর্থ পক্ষে তারই সমবয়স্কা মেয়ে ঘরে আনিতে; তখন সে কেন সমাজকে ধিক্কার দিবে না? সে কেন ব্রহ্মচর্য্য করিতে রাজি হইবে? এই প্রকার সমাজ কোন্ সাহসে বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য করিতে উপদেশ দেয়? এমন হৃদয়হীন সমাজ জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সেদিন দুইটী কচি বিধবা মেয়ে দেখিলাম। তাহাদিগকে যোগিনী সাজান হইয়াছে। তাহারা নিরাভরণা, তাহাদের মুখ শুষ্ক, চুল রুক্ষ। আমি একটীর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটীকে বেশ করিয়া লেখাপড়া শেখান না কেন?" তার উত্তরে তিনি বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিবার ইহার সময় কোথায়? ঘর কন্নার কাজ সারিতেই সময়ে কুলায় না।" আমি বুঝিলাম ইহার মাথার উপর কাজের বোঝা চাপাইয়া ইহাকে ভুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু যে জীবনে আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, আছে কেবল তুচ্ছ তাচ্ছল্য ও নির্য্যাতন সে জীবন টানিয়া লইয়া চলা কি ভয়ানক। এমন কি অমৃতধারা জীবনে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, যার ফলে সে এই আশা-ভরসাহীন নীরস জীবনটীকে সরস করিয়া তুলিতে পারিবে? গৃহে তাহার জন্য এরূপ কি আয়োজন করা হইয়াছে? কিছুই ত নয়। গৃহের আর দশজন খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে আর সে ক্ষুদ্র প্রাণী কিসের বলে সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিবে? এই কারণেই কত বালবিধবা প্রবৃত্তির তাড়নায় কূলে কালি দিয়া চিরদিনের মত অকূল সাগরে ভাসিতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? তাহাদের দোষ কি? যে সকল জীবনের চতুর্দ্দিকে সদ্ভাব বিরল, পরন্তু প্রলোভন বিস্তর তা'রা কি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? যে মেয়েটী কুলত্যাগ করিয়া গেল তাহার ভবিষ্যতে অনুতাপ অনুশোচনা হইলেও সমাজ তাহাকে আর গ্রহণ করিবে না, কিন্তু যে পুরুষ তাহাকে কূলের বাহির করিল সে আজীবন কলুষিত চরিত্র লইয়া সমাজে আদর প্রাপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা সমাজের আর কি একদেশদর্শী বিচার হইতে পারে? শাস্ত্রকার পুরুষ বলিয়াই ত এরূপ সব ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরুষের সাতখুন মাপ কিন্তু মেয়ের বেলা বিষম শাসনদণ্ড। আজও ইংরাজী-শিক্ষিত যুবা শ্বশুরকে ভয় দেখায় "আর একটা বিয়ে করব।" সেই ভয়ে অস্থির হইয়া পাষণ্ড জামাইয়ের কাছেও কন্যাকে পাঠাইতে হয়। একটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থার পূর্ব্বে মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে বলিয়া দেশের মেয়ে এরূপ অবাধ্য হয়ে পড়েছে। মেয়ে জন্মিলেই পিতামাতার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে পুত্রের পিতারা তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার বেশ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে সমাজে বরপণ প্রথা চলিত হইয়া পড়িয়াছে। অর্থহীন পিতাকে নেহাৎ মুষ্ডিয়ে পড়িয়া বয়স্কা কন্যা ঘরে রাখিতে হইতেছে এবং সমাজ কর্ত্তৃক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু সমাজ যখন ইহার মীমাংসা করিতে অক্ষম তখন একঘরে করিবার ক্ষমতা থাকাও অকর্ত্তব্য। এই সকল সমস্যার বেশ মীমাংসা হইয়া যায় যদি সমাজ কন্যাকে সৎপাত্র ব্যতীত বিবাহ না দেন এবং তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। যে দেশে অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, বৃদ্ধ, কলুষিত-চরিত্র ব্যক্তিও কন্যা পায়, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি জানি না।

সমাজকে আর একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। নারীরাই সর্ব্বত্র সকল যুগে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যখনই যে দেশ ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছে নারীরাই সে দেশকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইদানীং আমাদের দেশে কি দেখিতে

পাওয়া যাইতেছে? নারীও পুরুষের ন্যায় ধর্ম্মহীনা হইয়া পড়িতেছেন। এখন কচিৎ গৃহে গৃহে পূজা পার্ব্বণ উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, কেন না তাহাতে আর কাহারো আস্থা নাই, কিন্তু বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিতে সমুচিত বলেরও অভাব দৃষ্ট হইতেছে। নব্য হিন্দুগৃহে পূজা, পার্ব্বণ উপাসনা নাই বটে কিন্তু খাওয়া পরা সাজ সজ্জার ত্রুটী নাই। তাহা সবই নব্যভাবে চলিতেছে। ইহাতেও নারীদের বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রমণী তিন সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা, ব্রত পার্ব্বণ করেন ইংরাজীশিক্ষিত পুরুষ সে রমণীকে বড় পছন্দ করেন না। তাহাকে লইয়া তিনি প্রীত নন। অতএব নব্য যুবার সঙ্গে নব্যনারী সৃষ্ট হইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে, একদিকে রমণীগণ ইংরাজীশিক্ষিত পুরুষের সহবাসে পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না, কিন্তু স্বামীর প্রীত্যর্থে বিলাস বাসনায় বেশ না ঢালিয়া দিতেছেন। অপর দিকে তাঁহাদের এরূপ শিক্ষা হইতেছে না, যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান সুপরিমার্জ্জিত হইয়া গৃহকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারে। ধর্ম্মবিহীন গৃহ ভয়ানক, বিশেষতঃ নারী যখন ধর্ম্মহীনা হইয়া পড়েন তখন সেই সমাজের পতন অনিবার্য্য। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কাতেই ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়—গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে সে গাছ যেমন সজীব হয় না সেইরূপ গৃহ ঠিক না করিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে কি হইবে? গৃহকে ঠিক করিতে হইলে সমাজকে স্ত্রীশিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি শিক্ষিত হইলে আর সকলই আপনা আপনি ঠিক হইয়া যাইবে। অতএব সকল কল্যাণের মূলে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হইলে দেশের মঙ্গল-সুদূরপরাহত।

সর্ব্বশেষে আমার বক্তব্য এই, পুরুষ যেমন মানুষ নারীও তেমনি মানুষ। এই উভয় জাতি লইয়া সমাজ গঠিত হইয়াছে। বিধাতাপুরুষ তাঁহার অসীম জ্ঞানভাণ্ডার উভয়ের সম্মুখেই সমভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। কাহাকেও তিনি এরূপ বলিবার অধিকার দেন নাই যে সে বলিবে, "তুমি আর অগ্রসর হইতে পারিবে না।" তাঁহার অসীম জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সকলেই ধন সংগ্রহ করিতে পারিবে। এখানে স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, ছোটজাতি, বড়জাতি, স্বদেশী, বিদেশী ইত্যাকার ভেদাভেদ নাই। পুরুষ প্রকৃতিগত বলের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও কোমল নারীর উপর কত শত সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐরূপ আধিপত্য ও অবিচার করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ শক্তি ও সামর্থ্য উৎকর্ষের অভাবে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে নতুবা ভগবান নারীকে হীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। নারী সর্ব্ববিধ সুবিধা পাইলে এবং অপরিস্ফুট শক্তির সমুচিত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে নারীত্ব বজায় রাখিয়াও বিধাতার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন। নারী শিক্ষিত হইলে নারীত্ব হারাইয়া ফেলে ইহা অতীব ভ্রান্ত ধারণা। বরং শিক্ষিত নারীর শীলতা, কোমলতা এবং হৃদয়ের বিশালতা বৃদ্ধি পাইয়া সংসারে নূতন শ্রী আনয়ন করে এবং তাঁহারা গৃহের পরিপাট্য ও সুবন্দোবস্ত বিধান করেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা শিক্ষিতা নারীর সংসার দেখিবার তেমন সুযোগ পান না বলিয়াই অনভিজ্ঞতাহেতু এইরূপ ভুল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিয়া শিক্ষার অবমাননা করা দোষাবহ। বি-এ, এম-এ পাশ করিতে পারিলেই যে কেবল শিক্ষিত হওয়া যায় তাহা নয়। আমি আবার বলিতেছি, যে নারীর আত্মজ্ঞান, চিন্তাশক্তি, ন্যায়ান্যায় বোধ এবং হৃদয়ে উদারতা পরিস্ফুট হইয়াছে তিনিই শিক্ষিতা নামের যোগ্য। মহা পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ বি-এ, এম-এ পাশ করেন নাই, কেবল সাধনা ও উৎকর্ষের বলে তিনি আজ জগতে পূজ্য হইয়াছেন। অতএব সমাজ হইতে বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিয়া স্ত্রীজাতির সম্মুখে শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করা হউক, দেখা যাইবে কুপ্রথাগুলি অচিরে দূরীভূত হইয়া সমাজ ধর্ম্মে, জ্ঞানে, সম্পদে, তেজে এবং শ্রীতে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বরপণপ্রথা উঠাইবার জন্য তখন আর সভা সমিতি ডাকিতে হইবে না, বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যের জন্য এত চিন্তিত হইতে হইবে

না। তখন সমাজে স্ত্রীজাতির মূল্য হইবে, স্থান হইবে এবং দেশ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হইবে।

শ্রীকুলদা চট্টোপাধ্যায়।

সুলোচনা।

(যুগ-সম্ভব কল্কিদেব দর্শনে—কল্কিপুরাণ।)

(১)

সামান্য তপস্যা মম এ নহেশো ভগবন্!
তুমি যে অমৃতফল, কল্পতরু নারায়ণ!
দীনা বিবেকণা পাশে আপনি এসেছ আজ
কি সৌভাগ্য ভাগ্য-হীনা লভিয়াছে বিশ্ব মাঝ!

(২)

এতকাল এ সংসারে কত সুরাসুর-নর
পড়ে মোর আঁখি পথে ভগ্ন হল নিরন্তর।
কমলাক্ষ! আজি তব পূত দৃষ্টি-সুধা-ধারে
প্লাবিয়া এ অভাগিনী নমে তোমা বারে বারে!

(৩)

কৃপা করে কৃপাময়! চাহিতেছ পরিচয়,
স্মরিলে তা' দহে হৃদি! স্বপ্ন হেন ভ্রম হয়!
সুলোচনা নাম মোর, চিত্রগ্রীব পতি মম,
গন্ধর্ব্বদম্পতি মোরা ছিনু সুখে নিরুপম।

(৪)

একদা গন্ধর্ব্বলোকে স্বাগত বসন্ত নব,
গৃহে গৃহে গীতোচ্ছ্বাস, গৃহে গৃহে মধূৎসব!
আবেশে আবেশে চিত্ত পলে পলে উঠে ভরি'
জীবনে যৌবন-রাগে খেলে জ্যোৎস্না-বিভাবরী!

(৫)

দু'জনায় হল সাধ না জানি কি কাল-ক্ষণে,
গন্ধমাদনের সঙ্গে বিহরিতে কুসুমবনে!
আরোহি পুষ্পকরথে আসিলাম মোরা দোঁহে
অতর্কিতে ধরি' নিতে দারুণ নিয়তি-দ্রোহে!

(৬)

নাহি জানি ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে পূর্ণ প্রাণ,
হেরিলাম কি সৌন্দর্য্য দিকে দিকে মূর্ত্তিমান!
দিগঙ্গনা বল্লরী কত আলিঙ্গিয়া পরস্পরে
পল্লবে মুকুলে ফুল রচে অর্ঘ্য স্তরে স্তরে!

(৭)

কোথা গিরি-নির্ঝর ঝরে পড়ে ঝর ঝর;
কোথা পায় শৈলবালা ঝঙ্কারিলি' মধুতর!
মৃগ-শিশু দলে দলে নৃত্য করি ফিরে তীরে,
পেখম ধরিয়ে শিখী ডাকে বুঝি শিখিনীরে!

(৮)

উপলে বিহগ-কণ্ঠে প্লাবিত সাহানা তান,
মৃদুমন্দ গন্ধবহ অহরহঃ বহমান!
নিবিড় কীচকবনে ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজে,
হরিচন্দনের বাসে কস্তুরী-সুরভি লাজে!

(৯)

যেদিকে নয়ন রাখি ফিরে না নয়ন আর,
আনন্দের পরে জাগে আনন্দের পারাবার!
মদিরার পাত্র ভরি' আপনি নিসর্গরাণী,
পিপাসু প্রাণের পাশে হাসে যে মেয়ে আনি!

(১০)

ভুলিলাম কালাকাল, ডুবিলাম ক্রীড়ারসে,
মাতাইল চিত্ত যেন অনন্ত বসন্ত পশে'!
ছত্রিশ রাগিণী রাগ বসাইল বক্ষে মেলা,
শুধু নৃত্য, শুধু গীত, শুধু রঙ্গ, শুধু খেলা!

(১১)

হেরিলাম অকস্মাৎ ঋষিবর যজ্ঞে যায়,
বীভৎস বিকৃত-কায়, রত ঘোর তপস্যায়!
রূপ-যৌবনের গর্ব্বে মত্তেহস্মতা দুর্ভাগিনী,
করিনু রহস্য তাঁরে বিদ্রূপ-কটাক্ষ হানি'!

(১২)

তীব্র পরিহাস সেই দীপ্ত অভিশাপ হয়ে
ফিরে এল মোর পাশে অসহ বেদনা লয়ে!
পতি-কণ্ঠ চুম্বি' ঝরে ছিন্ন লতিকার প্রায়
মুহূর্ত্তে এলাপপুরে লুটাইনু বালুকায়!

(১৩)

কোথা কান্ত চিত্রগ্রীব, কোথা কণ্ঠে গিরিবর,
কোথা সে গন্ধর্ব্বলোক, কোথা সে সুরম্য ঘর।

কাঞ্চনী নগরী-অঙ্কে নাগকন্যাগণ মাঝ
কর্ম্ম-দোষে ঋষি-রোষে নিক্ষিপ্তা হইনু আজ !

(১৪)

যে চক্ষে বিদ্রূপভরে নিরখিনু তপোধনে,
সে চক্ষু গরল বর্ষি' দহে আজি ত্রিভুবনে !
'সুলোচনা' আজি হায়, পরিত্যক্তা বিবেকণা,
এ ব্যথা বুঝাব কারে, বুঝিবে বা কোন্ জনা !

(১৫)

দগ্ধ দেহে ! আছে শুধু রূপ আর প্রেম বুকে,
পলে পলে হুতাশনে দহিবারে মর্ম্ম-দুখে !
বিষের পসরা খুলি বসে আছি আমি হায়,
কত মুগ্ধ অন্ধ হয়ে দহিল পতঙ্গ প্রায় !

(১৬)

হে দেব ! নেহারি তোমা বড় আশা প্রাণে জাগে,
তুমিত্ব আপনি কাছে লালসার অনুরাগে !
প্রসন্ন মূরতি তব প্রশান্ত উজ্জ্বল ভাই,
কি পবিত্র সুধা-ধারে অভিষিক্তা হয়ে যাই !

(১৭)

না জানি কি তপফলে তুমি আজি দিলে দেখা,
বুঝি ধীরে মুছে যায় দারুণ অদৃষ্ট-লেখা !
ঋষি-শাপে মুক্তা আমি !—পতিলোকে মুক্ত যার—
অর্কপ্রভ রথ ওই নেমে আসে অমরার !

(১৮)

ওই মোর চিত্রগ্রীব—প্রিয়তম ! প্রিয়তম !
এতকালে এ দাসীরে স্মরিয়াছ, নিরমম !
দীর্ঘ বিরহের তবে আজি হল অবসান !
সহস্র প্রণতি লহ আর্ত্ত-ত্রাতা ভগবান্ !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শ্যামনগরের জমিদার।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা।

(১)

বাঁচাগিয়াছে। এই ছয় মাস ধরিয়া কি অশান্তিতেই না কাল কাটাইয়াছি। কমিশনের অভিমতে আমাদের কৃষ্ণপদবাবু জাল-কৃষ্ণপদ না হইয়া প্রকৃত কৃষ্ণপদ প্রমাণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণপদবাবুকে তাঁহার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রতি আদেশ হইয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস ম্যানেজার মিড্ ও সব্ ম্যানেজার বিশ্বনাথ রায় বাহাদুরকে এই আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে কয় বৎসর কৃষ্ণপদবাবুর সম্পত্তি ছিল তাহার হিসাব নিকাশ করিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ অডিটার আসিয়াছেন।

(২)

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে কৃষ্ণপদবাবু বিলাত যাত্রার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতামাতার পিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল কৃষ্ণপদবাবুর প্রায়শ্চিত্ত করাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন কৃষ্ণপদ বিলাত যাইয়া কোন গর্হিত কার্য্য করেন নাই, তখন তিনি কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? ইহাতে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহার উত্তরে কৃষ্ণপদবাবু ডাক্তার ঘোষালকে এই কথা বলিয়াছেন যে, "বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে গেলে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা হিন্দুর কর্ত্তব্য কি না তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়াও আমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যেহেতু আমি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাই যে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিব। এখন প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তাহা করিতে পারিব না।" কৃষ্ণপদবাবুর পূর্ব্বোক্ত উত্তর শুনিয়া ডাক্তার ঘোষাল প্রীত হইয়াছেন।

(৩)

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সুশীলার ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া সেই বিবাহ আইনের বিধান মতে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে। বিবাহের পর সুশীলা ব্রাহ্মমহিলাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি সুন্দররূপে বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন।

ভবানীচরণের সহিত সুশীলা একবার নরসপুরে ও একবার শ্যামনগরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই কলিকাতা তাগ করিয়া রাজাসাহেবের সহিত তাঁহার রাজ্যে যাইবে।

কৃষ্ণপদবাবু সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবার জমিদারী পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন, বলিয়া গিয়াছেন।

(৮)

এ দিকে কৃষ্ণপদবাবু ও তাঁহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজ-চ্যুত করিবার জন্য জমিদার হরকিশোর মজুমদার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হরকিশোর মজুমদার যৌবন কালে এক খুনী মোকদ্দমায় আসামী হন। তখন বিশ্বনাথ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। বিশ্বনাথ সেই সময়ে অনেক কৌশল করিয়া হরকিশোরকে রক্ষা করেন। সেই অবধি হরকিশোর বিশ্বনাথের আজ্ঞাবহ। হরকিশোর গোপনে সকল প্রকার নিষিদ্ধ পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অথচ তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-সমিতির পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের উত্তেজনায় হরকিশোর, বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুদিগকে, আর সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছেন। সেই সভায় বাঙ্গালাদেশের সকল স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দর্শক স্বরূপে আমারও সেই সভায় যাইবার ইচ্ছা আছে।

(৯)

যথা সময়ে এই ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শুভাগমন হইল। হর-কিশোরের পক্ষীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, "যে হিন্দু ম্লেচ্ছ দেশে যাইবে, সে তথায় যে উদ্দেশ্যেই যাউক না কেন, সে হিন্দুসমাজ-চ্যুত হইবে। সেরূপ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সমাজে গৃহীত হইতে পারে না। ম্লেচ্ছদেশ গমনরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে।" ইঁহারা ইঁহাদের মতের সমর্থনার্থ বহু শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিলেন।

রামকমল বিদ্যালঙ্কারপ্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যে বিদ্যাশিক্ষার্থ ম্লেচ্ছদেশে গমন জনিত যে পাপ তাহা প্রায়শ্চিত্তার্হ। বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি সমাজে গৃহীত হইবেন। তাহা না হইলে সমাজশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া যাইবে। ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষে শুভকর নয়।" কয়েকজন ইংরেজীশিক্ষিত অথচ সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, "বিদ্যাশিক্ষার্থ ম্লেচ্ছদেশে গমন, পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। ম্লেচ্ছদেশে গেলে হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিতে হয় বলিয়া পাপ হয়, সেই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন, কেহ কেহ এরূপ কথা বলেন। কিন্তু তাহা হইলে ম্লেচ্ছদেশে না গিয়াও যে সকল হিন্দু হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও সমাজচ্যুত করা উচিত। তাহা না হইলে সমাজে মিথ্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।" এই তৃতীয়োক্ত দলের মত অধিকাংশ সভ্যেরই মনঃপূত হইল না। রামকমল বিদ্যালঙ্কারের পক্ষে সভার অধিক সংখ্যক সভ্য মত দিলেন। সুতরাং প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হরকিশোর পক্ষীয় পণ্ডিতেরা সেদিনের বিচারে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে তাঁহাদের পক্ষই জয় লাভ করিয়াছে।

(১০)

মিঃ স্মিড্ ও হার বাহাদুরের কার্য্যকালের হিসাব নিকাশ করিতে দুইজন সুদক্ষ অডিটারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা তিনমাস ধরিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কার্য্যকালের হিসাবের অনেক গলদ বাহির করিয়াছেন। ম্যানেজার মিঃ স্মিড্ ও সব ম্যানেজার রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ তিনলক্ষ টাকার কোন হিসাব দিতে পারিতেছেন না। এই তিনলক্ষ টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা দুইজন প্রথমে কয়েক মাস সময় লইলেন কিন্তু সেই সময় অতীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি

অনুসারে হিসাব বুঝাইয়া দিলেন না। তখন অডিটার-দ্বয় নিতান্ত অনিচ্ছায়, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সেই বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেন। কৃষ্ণপদবাবুর অথবা বিষ্ণুপদ বাবুর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকাকালে, সেই সম্পত্তির তিনলক্ষ টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া মিঃ স্মিড্ ও রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ অভিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত দুই মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দাওয়া সোপর্দ্দ হইলেন। এই মোকদ্দমা চলিবার সময় কৃষ্ণপদবাবু গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে আসামীদ্বয়ের লওয়া তিনলক্ষ টাকা সম্বন্ধে কৃষ্ণপদবাবুর দাবী তিনি ত্যাগ করিলেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট কৃষ্ণপদবাবুকে জানাইলেন যে কৃষ্ণপদ-বাবু আসামীদ্বয়কে ক্ষমা করিতে পারেন কিম্বা তাঁহার দাবী ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এইরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। বিচারে মিঃ স্মিড্ ও রায়বাহাদুর বিশ্বনাথ অপরাধী প্রমাণিত হইলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত-বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বিশ্বনাথের রায়বাহাদুর উপাধি কাড়িয়া লওয়া হইল।

(৭)

কৃষ্ণপদবাবু দশ বৎসর হইল দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার আর সন্তানাদি হয় নাই। সাগরিকার কয়েকটী পুত্রকন্যা হইয়াছে। তাহারাই এখন কৃষ্ণপদবাবুর নয়নের তারা।

বিজয়নারায়ণ কয়েক বৎসর বিজ্ঞান কলেজে পড়িয়া রসায়ন শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিজয়নারায়ণ ও সাগরিকা অধিকাংশ সময়ই শ্যামনগরে থাকেন।

কৃষ্ণপদবাবুর চেষ্টায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে কয়েকটী কাপড়ের কল ও কয়েকটী সাবান, দিয়াসলাই, পেন্সিল প্রভৃতির কারখানা স্থাপিত হয়। এই সকল কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য এমন সুন্দর অথচ সুলভ হইয়াছে যে দেশের লোকেরা আগ্রহের সহিত তাহাই কিনিতেছে। এই সকল দ্রব্যের জন্য বাঙ্গালাদেশের লোককে আর বিদেশীদিগের নিকট হাত পাতিতে হয় না।

রমানাথের উদ্যোগে দুইটী বঙ্গীয় ভৈষজ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সকল প্রকার এলোপ্যাথী ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি প্রস্তুত হইতেছে। এদেশীয় এলোপ্যাথী ডাক্তারেরা প্রথম প্রথম বঙ্গীয় ভৈষজ্যালয়ের ঔষধাদি ক্রয় করিতে চাহিতেন না। য়ুরোপীয় বা মার্কিন কোম্পানীর নাম সম্বলিত ঔষধ না হইলে তাঁহাদের মন উঠিত না। ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব দূর হইয়াছে।

(৮)

বাঙ্গালাদেশের একটী উপযুক্ত স্থানে একটী প্রকাণ্ড-গোছের লৌহকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই লৌহকারখানার নিকটে যদুনাথ কর্ম্মকার একটী ঘড়ি নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই দুইটী কারখানা স্থাপনে পূর্ব্বোক্ত রাজাসাহেব, কৃষ্ণপদবাবু এবং বাঙ্গালাদেশের আরও কয়েক জন জমিদার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণকে বসিয়া থাকিতে হইতেছে না। তাঁহারা দেশে বিদেশে অনেক কার্য্যক্ষেত্র পাইতেছেন।

(৯)

রমানাথ হিন্দুদিগের রসায়ন, তাহার উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হয়। তৎপরে বন্ধুবান্ধব-দিগের অনুরোধে রমানাথ সেই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও য়ুরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকেরা চমৎকৃত হইয়াছেন। রমানাথ বহু বিজ্ঞান ও চিকিৎসক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(১০)

শ্যামনগরের কলেজটীর আরও উন্নতি সংঘটিত হই-য়াছে। এই কলেজে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষ

ভাবে আলোচিত হয়। এই কলেজের কয়েকজন ইতিহাসের ছাত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনা আরম্ভ করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

সমাপ্ত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

আমার স্বামীর স্মৃতিকথা।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বিবাহ।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, গোধূলি মুহূর্ত্তে আমার বিবাহ হয়। বিবাহ সম্বন্ধীয় বেদোক্ত অনুষ্ঠান-বিধি শেষ হইলে পর, প্রায় ১০॥ টার সময়, আমাদের বরযাত্রীরা গৃহে আসিলেন এরূপ বলা অপেক্ষা, আমরা দুজনেই আমাদের গৃহে বরাবর পদব্রজে চলিয়া আসিলাম—এইটুকুই সত্য। বিবাহ হইয়া গেলে বাড়ী আসিবার সময় আমার মাতৃগৃহে আমার স্বামী আহারাদি করেন নাই এবং তাঁহার নিজ গৃহে আসিয়া কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, কিছু না খাইয়া, একেবারে আপনার ঘরে গিয়া ভিতর হইতে দ্বারে কড়া লাগাইয়া দিলেন। সেই দিন তাঁহার অসহ্য মনস্তাপ হইয়াছিল। একে-ত বরাবর-কার প্রিয় পত্নীর বিয়োগ ঘটিয়াছে সবে এক মাস মাত্র। সেই শোকটা একেবারেই তাজা ও টাট্‌কা ছিল; এই অবস্থায়, পুনর্ব্বার বিবাহ করা তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার শ্বশুর মহাশয়ের দুরাগ্রহ ও স্নেহের দরুণ তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে হইল; আর তাহাও দুইটি ব্রত পালনের নিমিত্ত। এক ব্রত,—"গুরুজনের কথার অবাধ্য হইবে না; দ্বিতীয় ব্রত,—পরিবারের সুখে প্রতিবন্ধক হইবে না।" তাই তিনি, বহু দিবস হইতে স্বীকৃত ও ভাল বলিয়া বিবেচিত নিজ মতটিকে, পুরাতন প্রিয়তম বন্ধুদিগকে, নিজ আত্মাভিমানকে, এবং সেই সঙ্গে মিলনের সুখকে ও বন্ধুবান্ধবকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উক্ত দুই ব্রত পালন করিলেন। তাহার দরুণ জগতের নিকট উপহাস ও দোষারোপ সহ্য করিতেও স্বীকৃত হইলেন। এই কারণে, এই বিবাহ-রাত্রিকে যে তিনি অসহ্য কষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাঁর পক্ষে ঐরূপ মনে করাই ঠিক। কারণ কেহ কেহ এখনো এইরূপ মনে করেন, আমার স্বামীর সমস্ত জীবনের মধ্যে যদি কোন দুর্ব্বলতা ও হীনতা প্রকাশ পাইয়া পাইয়া থাকে তবে সেই বিষয় সম্বন্ধে। কিন্তু এই সম্বন্ধে উল্টা আমার মত এই, তাঁহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে স্বার্থত্যাগ ও উদারচিত্তের যদি কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়া থাকে, তবে এইটিই সর্ব্বচেয়ে উচ্চ ও মহৎ নিদর্শন। এই সম্বন্ধে নিজ নিজ দৃষ্টি অনুসারে যে-ই যত দোষ দিক্ না কেন, কিন্তু আমার নিকট তাঁহার এই আচরণটি অত্যন্ত আদরণীয় বলিয়া মনে হয়; এবং যথার্থ ভক্তির সহিত যে কেহ তাঁহার চরিত্র সমগ্রভাবে অবলোকন করিবে তাহারই নিকট ইহা আদরণীয় হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে প্রায় পনেরো দিন ধরিয়া মিত্রমণ্ডলীর নিকট হইতে ক্রমাগত পত্র আসিত,—"এই সময় আসিয়াছে। এবার আমি ছোট মেয়ে বিবাহ করিব না, পুনর্বিবাহ করিব,—এইরূপ গুরুজনদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিবে" ইত্যাদি কথা ঐ সব পত্রে থাকিত। প্রথম প্রথম পত্রগুলি ডাকঘর হইতে আমার স্বামীর হাতে আসিত। কিন্তু এইরূপ পত্রাদি বোম্বাই হইতে আসিতেছে, আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাণে আসায়, তিনি ডাকের চিঠি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ডাকহরকরা ডাক আনিলে পর, তিনি প্রথমেই তাহা আপনার নিকট আনাইয়া লইয়া তন্মধ্যে বোম্বায়ের পত্র ও টেলিগ্রামগুলি রাখিয়া বাকী পত্রাদি উপরে পাঠাইয়া দিতেন। শ্বশুর মহাশয়কে বাড়ীর সবাই ভয় করিত বলিয়া এই কথা কেহই প্রকাশ করে নাই। প্রথম পত্নী মারা গেলে পর, শ্বশুর মহাশয় কোল্লাপুর হইতে পুনরায়

* মহারাষ্ট্রদেশীয় শ্রীমতী রমাবাই রাণাডে লিখিত মারাঠী গ্রন্থের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

আসিলেন ; তখন হইতেই কনের সন্ধান চলিতে লাগিল। বিধবাবিবাহের অনুকূলে আমার স্বামীর মত থাকায়, এখন আমার স্বামী বালিকা বিবাহ করিবেন না, বিধবা-বিবাহ করিয়া বসিবেন, এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের আশঙ্কা হইল এবং বোম্বায়ের মিত্রমণ্ডলীর সহিত আমার স্বামীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়া তাহাদের অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পূর্ব্বেই, বিবাহ ঘোষণা করিয়া দিবেন এইরূপ শ্বশুর মহাশয় স্থির করিলেন, এবং তদনুসারে প্রতিদিন কনের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সেই সময় শ্বশুর মহাশয় আমার পিতার আয়গাতেও কনে দেখিবার জন্য পুনায় আসিয়াছিলেন। আমার পিতা শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দুজনের মধ্যে পূর্ব্বকার পরিচয় ছিল। তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন :—"আমাদের মেয়েদের বিবাহ একেবারে স্থির করা ব্যতীত কেবলমাত্র দেখবার জন্য পাঠানো আমাদের রীতি নয় ; অতএব আপনার নিকট আমার এই মিনতি, আপনার কোন লোককে আমাদের গ্রামে মেয়ে দেখিবার জন্য পাঠিয়ে দিন। মেয়েকে যদি তাঁর পছন্দ হয় তাহলে তাকে সেখান থেকে আনান যাবে। বিবাহের জন্য কোন মেয়েকে বাহিরে নিয়ে এলে, যদি তার পর বিবাহ না হয়! তাই প্রথমেই মেয়েকে পছন্দ না হইলে, তাহাকে আমি আনাতে পারি না।" তখন শ্বশুর মহাশয়, আমাদের আশ্রিত বেদমূর্ত্তি বাঃ বালভট্টী ওয়াট্ওয়েকে আমার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বালভট্টী ১০।১২ বৎসর বয়স হইতে, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই, আমাদের গৃহে ছিলেন। ইনি খুব বিদ্বান ও কর্ম্মিষ্ঠ। ইঁহার আচরণ পরিশুদ্ধ হওয়ায় বাড়ীর লোকেরা সবাই ইঁহাকে আত্মীয়ের মত মনে করিতেন। আর শ্বশুর মহাশয়েরও তাঁহার উপর খুব বিশ্বাস ছিল। বালভট্টী ও আমার পিতা আমার মাতৃগৃহে আসিলে পর, বালভট্টী আমার মুখ দেখিলেন। যাহা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ঘর সংসারের সমস্ত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্যই হউক, কিংবা কি জানি কেন অপেক্ষা করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার সময় আমার পিতাকে তিনি বলিলেন,—"মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছে। কাল সকালেই আপনি মেয়েকে নিয়ে চলে যান। তার পর একটু অপেক্ষা করিয়া, তার-যোগে আপনার মণ্ডলীকে বিবাহের জন্য ডাকিয়া পাঠান।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, আমি, আমার পিতা, ও বালভট্টী, ডাকের টাঙ্গা গাড়ীতে চড়িয়া পুনায় আসিলাম। ইত্যবসরে, আমার স্বামী বিবাহ করিবেন না বলিয়া নানা কথা শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। "আমি এখন ছোট নই, আমার বয়স ৩২ বৎসর। অতএব এখন আমি নিজেই ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি। দুর্গা আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট হওয়ায়, একুশ বৎসর থেকে বিধবা হয়েছে। আপনার মেয়ে আমা অপেক্ষা তাহার উপরে কোন অংশেই কম নয় ; এইরূপ অবস্থায়, তার সম্বন্ধে আপনার ত কোন ভাবনা চিন্তা হচ্ছে না ; তবে আমার বিবাহ সম্বন্ধেই এত আগ্রহ কেন? যদি আপনি মনে করেন, দুর্গার পক্ষে ব্রতস্থ হইয়া থাকাই শ্রেয়, তাহলে আমার বেলাই তাহা না হইবে কেন? আমাদের দুজনের অবস্থাই ত সমান। পাছে আমি বিধবা বিবাহ করি, তাই যদি আপনার ভয় হয়, তাহলে আমি বিধবা বিবাহ করব না, আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করচি। সে সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা নাই।" এইরূপ নানাপ্রকারে কাকুতি মিনতি করিলেও শ্বশুর মহাশয় নিজের কথা ছাড়িলেন না। আরও বেশী ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন আমার স্বামী বলিলেন, "আমার কথা আপনি না শুনিলেও, অবশ্য আপনার কথা আমার শুনতেই হবে। আরো ছয় মাস আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিন—অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি বিলাতে গিয়ে আবার ফিরে না আসি সেই পর্য্যন্ত।" এ কথাতেও শ্বশুর মহাশয় রাজি হইলেন না। তখন আমার স্বামী লোকের দ্বারা এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন :—"আমার কথা ত কিছুই রাখলেন না। আপনি আমার বিবাহ না দিয়ে আর ছাড়বেন না। তবে আমার একটা কথা রাখুন—যার সঙ্গে বিবাহ হবে সে মেয়ে যেন স্বগ্রামের না হয়, পরগ্রামের মেয়ে হওয়া চাই ; কুলীন-

বংশের ও নামজাদা ঘরের মেয়ে হওয়া চাই ; ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তাহার কুটুম্বিতা আছে কিনা ভাল করে জেনে নিয়ে তবে এই বিষয় স্থির করা চাই। স্ব-গ্রামের মেয়ে আমি একেবারে চাই না। রূপসী ও বয়স্থা হইলেও সাধারণ বংশের মেয়ে আমি চাই না। রূপ অপেক্ষা কুলীনত্বের উপর বেশী লক্ষ্য রাখিলে তবেই, সেই সম্বন্ধ সুখের হবে।" এইরূপ নানাকথা বলা হইলে পর, আমরা দুই তিন দিনের মধ্যে পুনার আসিয়া পঁহুছিলাম। আমি যে বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, শ্বশুর মহাশয় সেখানে গিয়া আমার মুখ দেখিলেন, এবং পছন্দ করিয়া একাদশীর মুহূর্ত্তই বিবাহের স্থির করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমার পিতাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, "আজ সন্ধ্যাকালে তুমি আমাদের বাড়ী নিশ্চয় আসবে এবং আমার পুত্রের কি বলবার আছে শুনে নেবে। অনুকূল মত হয় ত কথাই নেই, কিন্তু যদি প্রতিকূল মত হয় তবে, এই মেয়ের সঙ্গেই বিবাহ দেব স্থিরনিশ্চয় করেছি এই কথা তাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দেবে।" আমার পিতা এই কথা শিরোধার্য্য করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপরে গেলেন। আমার পিতার চেহারায় কুলীন বংশসুলভ একটা গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়নিশ্চয়তার ভাব ছিল। তাঁকে দেখিবামাত্র আমার স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পর বসিলেন এবং দস্তুর মত ভদ্রতার প্রশ্নাদি করিলেন। তখন আমার পিতা, "আমি অমুক গাঁয়ের জায়গীরদার" ইত্যাদি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া শেষে বলিলেন "আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ করতে এসেছি।" তখন আমার স্বামী বলিলেন—"আমার কি দেখিয়া আপনি আমাকে মেয়ে দেওয়া স্থির করেছেন ? প্রথমত, আপনি পুরাতন বংশের জায়গীরদার, আর আমি সমাজ সংস্কারকদলভুক্ত হওয়ায় বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী। আমার শরীর দেখুচ্ছ, বেশ মোটা সোটা কিন্তু আমার চোখের ও কানের হীনতা আছে। তা ছাড়া আমার বিলাত যাবার কথা আছে, সেখান থেকে এসেও আমি প্রায়শ্চিত্ত করব না। অতএব, আপনি এই সব বিষয় বিচার করে যাহা কর্ত্তব্য স্থির করবেন।" আমার পিতা উত্তর করিলেন—"তোমার পিতা ভাউসাহেবের সহিত আমার পুরাতন পরিচয়। তিনি আমাকে সমস্তই বলেছেন, এবং আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন।" এই কথা শুনিয়া, একটু থামিয়া, আমার স্বামী বলিলেন :—"আপনার মেয়ের বিবাহ যদি আমার সঙ্গে দেওয়াই স্থির করে থাকেন, তবে আমার একটা কথা বলবার আছে ; আজ লগ্ন স্থির না করে কেবল বাগ্‌দিত্ত করে এক বৎসর অপেক্ষা করা হোক। তারপর বিবাহের লগ্ন স্থির করা হোক।" কিন্তু আমার পিতা বলিলেন, "তা করা উচিত নয়, আমার বংশমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখবে।" এই প্রকার নানা কথা বলিয়া বিবাহ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইলেন। তখন আমার স্বামী বলিলেন—"এখন এই কাজে আমার পিতা ভাউসাহেবের উপরেই বিচারের ভার দেওয়া হউক ; এবং তিনি যা বলেন আমরা উভয়েই তা শুনব।" এই কথা শুনিয়া আমার পিতা চলিয়া গেলেন। কেবল আমার স্বামী ভাবিলেন—"আমি যখন ভাউসাহেবের সমস্ত কথাই শুনিয়াছি, তখন কেবল বৎসর দেড়েক বিবাহ স্থগিত করতে হবে; আমার এই অনুরোধটি তিনি রাখিবেন না, এমন হবে না। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমার স্বামী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট গিয়া, আমার পিতা আপাসাহেব কর্ণেকর তাঁর নিকট গিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন সমস্তই বলিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় বলিলেন,—"শেষ নিষ্পত্তিটা কি হল আমাকে জানাও।" তখন আমার স্বামী বলিলেন—"শেষ নিষ্পত্তির ভার আপনার উপরেই দেওয়া হয়েছে। আপনাকে কি তাঁর সমস্ত কথাই শুনতে হবে ? আমি তাঁকে বলেছি, আপনার সব কথাতেই আমি রাজি আছি। আমি বিবাহ করব কিন্তু এখনি না। বছর দেড়েকের মধ্যে করব।" এইরূপ অনেক কথা আস্তে আস্তে বলে আমার স্বামী শ্বশুর মহাশয়কে শুনাবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় এই সমস্ত শুনিবার পর, ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ; কোন উত্তর দিলেন না। আমার স্বামী আস্তে আস্তে কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্বশুর

মহাশয়ের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। প্রায় দুই ঘণ্টার পর শ্বশুর মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেখানে যে সব লোক দাঁড়াইয়াছিল তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সবাই বাহিরে যাও, দুই এক ঘণ্টা এখানে এসো না।" তদনুসারে সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; কেবল আমার ননদ কি-কথাবার্ত্তা হইতেছে আড়ি পাতিয়া শুনিতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে বলিলেন—"এতক্ষণ তুমি যা বল্লে তা শুনে আমি মনে মনে খুব বিচার ক'রে দেখলেম; কিন্তু এবার তোমার কথাটা রাখ্‌তে পারব না, মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে কখন অবিশ্বাস করিনি, এখনো করিনে। কিন্তু যে রকম সমুদয় উপস্থিত হয়েছে,—বিবেচক ব্যক্তি বিচার করে একটা কিছু স্থির করলেও, তার আশপাশের মোহ-প্রলোভন তার সঙ্কল্পকে টলিয়ে দিতে পারে,—এটা কি তুমি দেখছ না? একবার তোমার কথা অনুসারে এক বৎসর দেড় বৎসর তোমাকে স্বাধীনতা দিলে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সের প্রকৃত সুখ ও শান্তি হারাতে হবে এই রকম আমার ভয় হয়। এর কারণটা এখন তোমাকে বল্‌ছি—গত পনেরো দিনের মধ্যে, তোমার মিত্রমণ্ডলী হতে যে সব পত্র ও তার এসেছে, সে সব পাঠ করে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সে সমস্ত বিচার করে, তোমার কথা শোনা উচিত নয়, এইরূপ আমার মনে হয়েছে। প্রথমত নব্য মতের দিকেই তোমার ঝোঁক, অথচ তোমাকে আটক করে রাখবার মত কোন জিনিসই নেই। এই রকম সব দিকেই তোমার স্বতন্ত্রতা থাকায়, সুতরাং নব্যতন্ত্রের মতটাই উথলে উঠবে ও তোমাকে মোহিত করবে,—আমার এই ভয় আছে। কিন্তু আমার বয়স পূর্ণ হয়েছে। আমাদের পরিবারের স্ত্রীপুত্রাদির ভার ও কর্ত্তাগিরি তোমার উপরেই বর্ত্তেছে এবং তুমি এই ভার বহনের যোগ্যও বটে। সে যাক্।" কিন্তু এ সব সত্য হলেও, তোমার কথা অনুসারে দুছর দেড়েক বিবাহটা স্থগিত রাখতে দিলে; আমার পারিবারিক সুখশান্তি অন্তর্হিত হবে। এই দুই দিকই তোমাকে দেখালেম। তুমি বিবেচক, যা ভাল বোধ হয় তাই করবে। কেবল আমি একটা এই স্থির করে রেখেছি, এখন যদি বিবাহ না কর তবে আমি মেয়েকে আর কেরত পাঠাতে পারব না। কারণ, তাহলে আমাসাহেবের বাক্যমর্য্যাদার হানি হবে এবং আমারও অপমান হবে। কিন্তু এরূপ কাজ যদি করতেই হয় তাহলে তোমার আমার মধ্যে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায়, আমিও চিরকালের মত "করবীর" তীর্থস্থানে চলে যাব। পরে আমার অদৃষ্টে যা ঘটবার তা ঘটবেই।" এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া হাত পা ধুইয়া সন্ধ্যা করিতে গেলেন, এবং আমার স্বামী উপরে চলিয়া গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বেকার এই বিবরণ আমি ননদের মুখে শুনিয়াছি।

ইহার পর,—পূর্ব্বে শ্বশুর মহাশয় যেরূপ স্থির করিয়াছিলেন—১৮৭৩ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গোধূলি মুহূর্ত্তে আমার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের পরে, স্ত্রী-আচার প্রভৃতি লৌকিক উপচার মোটেই করা হয় নাই। কেবল বেদোক্ত বিধি ও হোম-হবনাদি অনুষ্ঠান সমস্তই হইয়াছিল। বিবাহের দিনেও আমার স্বামী আদালতের ছুটি লন নাই। বিবাহের সময়ের পূর্ব্বে আদালত হইতে আসা পর্য্যন্ত, শ্বশুর মহাশয়ের ভয় ছিল, পাছে বোম্বায়ের কোন মিত্র আসিয়া এই সুযোগে বিবাহের মুহূর্ত্তটা কাটাইয়া দিবার জন্য আমার স্বামীকে বাহিরে কোথাও বেড়াইতে লইয়া যায় কিংবা কি করে কে জানে। কিন্তু আমার স্বামীর উপর এতটা বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও যাহা তিনি একবার স্বীকার করিয়াছেন তাহার কখনই অন্যথা করিবেন না। আমার স্বামী কোর্টের কাজ শেষ হইলে বেড়াইতে না গিয়া অথবা লাইব্রেরী প্রভৃতিতে না গিয়া একদম বাড়ী আসিলেন। এই প্রকারে বিবাহ হইয়া গেলে পর, আমার পিতা আমাকে একলা পুনায় শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া, স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। এই সময় বলা আবশ্যক, আমাকে দেখাবার জন্য যে সময় আমাকে পুনায় আনিলেন, সে সময় আমার পিতাই কেবল আমার সঙ্গে ছিলেন। তিথি স্থির হয়ে গেলে পর, আমার মা, ভাই, ভাজ, বোন, কাকা, কাকী প্রভৃতি বাড়ীর লোকদিগকে তার-যোগে ডাকিয়া পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু

শ্বশুর মহাশয় বিবাহের দিনটা খুব কাছাকাছি ধরায়, তাহার সময় পাওয়া গেল না। কেবল বেদোক্ত বিধি ছাড়া অন্য কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করা হইবে না, এইরূপ আমার স্বামী স্পষ্টরূপে বলায়, স্ত্রী পরিবার ও ছেলে পিলেদের আনিয়া তাহাদিগের মনক্ষুণ্ণ করা আমার পিতা পছন্দ করিলেন না। (ক্রমশঃ)

সমাজ-সমস্যা।

(গল্প)

পরেশ পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় যুবক। ছেলেবেলায় অভিভাবক সমাজে "একগুঁয়ে" বলিয়া তাহার একটা দুর্নাম ছিল। এখন সে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গণ্য। তবে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তাহার একটু পার্থক্য ছিল। সাধারণতঃ যে সকল কৃতিত্ব থাকিলে লোকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করে সে সকল শিক্ষা পরেশের পূর্ণমাত্রায়ই ছিল, তদুপরি তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার প্রভাবেই সে বিশেষ রূপে বলীয়ান্। পরেশ স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক, কিন্তু উৎকট আবেগের চঞ্চলতা তাহার মধ্যে ছিল না। সে নিম্নসমাজের কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত কিন্তু ইহা নিয়া অথবা যার তার সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইত না।

পরেশ অনেক দিন হইতেই তাহার পিসিমার সংসারে আছে, শৈশবে পিতামাতার মৃত্যুর পরেই সে প্রথম এ সংসারে প্রবেশলাভ করে, পরে পিসিমার ছেলেদের সঙ্গে একত্র লেখাপড়া শেষ করিয়া এখন এই পরিবারের সকলের সঙ্গে একরূপ মিশিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

পরেশ স্থিরলক্ষ্য এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। সে মানব-জীবনকে একটা লক্ষ্যহীন ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিত না। কেহ কোন কাজের ভার দিলে কখনও সে তাহা অগ্রাহ্য করে নাই। মোট কথা তাহার চরিত্রগুণে তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি সকলেরই একটা সম্ভ্রম ছিল।

সেদিন পিসিমার অন্য এক ভাইপোর বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীর সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। পিসিমা দুপুরবেলা আর সকলকে নিয়া বিবাহ বাড়ীতে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বিশেষ কারণ বশতঃ ছোট বধূ সেদিন বিবাহ বাড়ীতে যাইতে পারিবে না—এজন্য পিসিমার মনটা তত ভাল বোধ হইতেছে না। বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, অগত্যা পরেশকে বাড়ীর প্রহরায় নিযুক্ত করিবার মানসে তিনি পরেশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরেশ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া একখানা পাখা হাতে নিয়া কেবল আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় বাহিরে শব্দ হইল—টুং টুং। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল বীরেন সাইকেল হাতে করিয়া আসিয়াছে।

বীরেনের সঙ্গে বন্ধুভাবে পরেশের বেশ হৃদ্যতা ছিল। এ বাড়ীতে বীরেনের সর্ব্বদা যাতায়াত থাকাতে পিসিমার সঙ্গেও তাহার পরিচয় ছিল এবং বন্ধুত্বের খাতিরে সেও তাঁহাকে পিসিমা বলিয়া ডাকিত। বীরেন পরেশকে ভালরূপেই চিনিত—তাহার চরিত্র, তাহার মতিগতি কিছুই বীরেনের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া বন্ধুকে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মভাবপন্ন বলিয়া ঠাট্টা করিতেও সে ছাড়িত না।

সাইকেল বাহিরে রাখিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতেই বীরেন হাঁকিয়া উঠিল—পরেশ, বাড়ী আছ হে?

পরেশ। কেন দেখতে পাওনা, সব আঁধার দেখচ নাকি?

বীরেন। তা ভাই আমাদের যেমন কপাল তেমন ত হবে, (বিকৃত গম্ভীর স্বরভঙ্গীতে) আলো হইতে অন্ধকারের দিকেই আমাদের গতি—তোমার মত দিব্য-জ্যোতিঃ লাভ করিলে বরং ভিন্ন কথা ছিল।

পরেশ। হাঁ, এখন কত কথাই হবে। এদিকে যে সাইকেল নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছ তা আর স্বীকার করিতে চাও না। নূতন নূতন সাইকেল চড়িতে শিখিলে কি সকলেরই এই দশা হয়?

বীরেন। না ভাই, শুধু সাইকেলের দোষ নয়। একবার বেরিয়েই দেখ—যে ভয়ানক রোদ্দ। আমরা ত আলোক হইতে অন্ধকারে এসে আঁধার দেখি, তুমি এখন বাহিরে গেলে হয়ত এই অন্ধকার হইতে আলোকে গিয়েই আঁধার দেখিবে।

কে জানিত যে এই সামান্য কথার একটা সোচনীয় পার্থকতা এত সন্নিকট।

বীরেন। কই, আজ ছুটির দিন, নরেশ টরেশ ওরা সব কোথায়?

পরেশ। বিয়ে বাড়ীতে।

বীরেন। ওঃ তাই ত—আমিও ত সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি। চল যাওয়া যাক্।

পরেশ। এই! তোমার একটা পেলেই হ'ল। তুমি সেখানে গিয়ে কাজের নামেত কিছু করবে না, হয়ত অথবা একটা বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি তুলে দিয়ে যাহাতে আর দশজনেরও কাজ পণ্ড হয় তারই চেষ্টা করবে।

বীরেন। আর তুমি কি করিবে? বিয়ে করিতে তোমার আপত্তি আছে জানি—বিয়ের বাড়ীতে যেতেও কিছু আপত্তি আছে কি?

পরেশ। বাড়ীতে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে ত কথা হচ্ছে না। কাজ কর্ম্মের বাড়ীতে—বিশেষ কাজ কর্ম্মের সময় সেখানে গিয়ে দশজনের কাজ পণ্ড করার চেয়ে না গিয়ে বাসায় বসে থাকা বরং ভাল। বিয়ের বাড়ী হলেই কি হল—সেখানেও আমোদ প্রমোদের একটা সময় অসময় আছে ত?

বীরেন। কবে তোমার বিয়েতে গিয়ে এরূপ একটা উৎকট বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি ক'রে কিছুক্ষণ আমোদ করতে পাব!

পরেশের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি-রেখা ফুটিয়া উঠিল; পরক্ষণেই তাহা মিলিয়া গিয়া একটা গম্ভীর ভাবের ছায়া পড়িল। বীরেনও ইহাতে একটু বিচলিত হইল, তাহার চঞ্চলতাও যেন ক্ষণকালের জন্য চাপা পড়িল। সে একটু গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ভাই, বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই জানি। কিন্তু বিবাহ করিবার স্বপক্ষে কোন যুক্তিও কি তোমার মনে উদয় হয় না?

পরেশ। সমাজে এবং সংসারে থাকিলে বিবাহ করা দরকার এবং উচিত তা স্বীকার করি, কিন্তু আমার পক্ষে ঐ এক বাধা। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহির ত হইতে পারেনই না, বাড়ীতেও আবার তাহাদিগকে একটা ঘোমটার অন্তরালে থাকিতে হয়। ভাশুর ইত্যাদি কয়েক জন আছেন তাঁহাদের দৃষ্টি-সীমার ভিতরে আসাও বাড়ীর বধূদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই রীতিকে শুভ মনে করা দূরে থাকুক আমি ইহাতে অশুভ এবং অসুবিধার সম্ভাবনাই বেশী দেখিতে পাই। তার পর মনে কর বৌ ঘরে আনা গেল। কিন্তু যে আমার স্ত্রী, আমার সুখে, দুঃখে, জীবনের সমস্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গিনী—তাহার সঙ্গে শুধু আমার নিজেরই ঘনিষ্ঠতা হইল, কিন্তু আমার বাহিরে আমার যে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আছেন তাহাদের অনেকের সঙ্গে উহার পরিচয় মাত্র হইবারও সম্ভাবনা নাই। আমার নিজত্বের বাহিরে যে আমার একটা জীবন আছে সে সম্বন্ধে আমার স্ত্রী একেবারেই অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে। লোকের সমক্ষে আমার সম্পর্কেও তাহার ঘোমটার ব্যবধানটুকু থাকিবে। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক কি কেবলই নেপথ্যের সম্পর্ক? স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক এক পক্ষে অতি গূঢ় রহস্যাবৃত, অন্যের উহাতে মর্ম্মভেদ করিবার অধিকার নাই; কাজেই স্বামীস্ত্রীর অনেক সময়ে নির্জ্জনে থাকার কারণ আছে—ইহা স্বীকার করি। কিন্তু উহার বাহিরে লৌকিক জীবনে স্বামীস্ত্রীর কোনও সম্পর্ক নাই কি? সমাজে, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের একত্র হইবার কোনও আবশ্যকতা নাই কি? সমাজের এসব ত্রুটিও আমি মানিয়া নিতে পারি না, আবার সমাজকেও আমি না মানিয়া পারি না। কাজেই আমি সমাজ ছাড়িয়া বিবাহ করিতে যখন নারাজ তখন বিবাহ করাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি বিবাহ করিব সেদিন যেদিন আমাদের সমাজে লোকসমক্ষেও স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোন ঘোমটার ব্যবধান থাকিবে না।

এই সময় পিসিমা আসিয়া পড়িলেন, কাজেই বক্তৃতার স্রোতও বন্ধ হইল। পিসিমা অন্যমনস্ক ছিলেন, পরেশের কথা তাঁহার কানে পৌঁছায় নাই। তিনি ভাবিতে-ছিলেন, কবে তিনি এই ভাইপোটিরও বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার ছোট ছেলে নরেশ পরেশের চেয়ে দুই বৎসরের ছোট, তাহারও প্রায় দুই

বৎসর হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরেশ এখনও অবিবাহিত। তাহারই বুদ্ধি লালিত পালিত এই ভাইপোটিকে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধীভাবে না দেখিতে পারিলে পিসিমা কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছেন না,—তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই একটা মাত্র অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন—"পরেশ, তুই-ও বাড়ী আছিস, ছোট বৌ একা ঘরে রইল—বাড়ীতে আর কেউ নেই—আমরা না আসা পর্য্যন্ত তুই বাড়ী ছেড়ে যা'স্ না যেন। কিও আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়েই ফিরে আসবে এখন।"

পরে বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন,—বীরেনও ত আমাদের সঙ্গে যেতে পারে—কি আর তবে নাই বা গেল।

পরেশ বীরেনের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল,—না পিসিমা, তোমরা কিকে নিয়েই যাও। বীরেন সাইকেলে একবার ঘোড়ে যাবে এখন।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমরা কিকে নিয়েই যাব এখন। পরে বীরেনের দিকে তাকাইয়া বলিয়া গেলেন—কিন্তু বীরেন, সাবধান, দুপুর বেলা এই রোদের মধ্যে কোথাও পড়ে টড়ে যেও না যেন।

পিসিমা চলিয়া গেলে পরেশ বলিল, "বীরেন, বাচলে।"

বীরেন। কেন, আমার বুঝি আর সারাদিনের মধ্যে সাইকেলে চড়বার সময় হ'ত না।

পরেশ। তাই যদি মনে করতে তবে আর পিসিমার গাড়ীতে যেতে আপত্তি করতে না।

বীরেন। আমি বুঝি আপত্তি করেছি?

পরেশ। বড় বাকীও রাখ নাই।—মৌনং সম্মতি-লক্ষণং।

এইরূপে দুই বন্ধুর মধ্যে আবার রহস্যালাপ জমিয়া উঠিল।

পিসিমার গাড়ী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—কিরও ফিরিয়া আসিবার সময় হইল।

এদিকে ঘড়িতে ৫৪ করিয়া একটা বাজিল; বীরেনও উঠিয়া পড়িল। পরেশকে বলিল—"পিসিমা ত তোমার যাবার পথ বন্ধ করে গেলেন, তুমিও বেচে গেলে। আমি আর থাকি কার ভরসায়—আমিও চল্লুম।"

পরেশ। তা যাও,—আর পার ত বিয়ে বাড়ীতে গিয়েও আলো-অন্ধকারের ব্যাখ্যা নিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিও।

বীরেন চলিয়া গেলে পরেশও আস্তে আস্তে উঠিল। দুপুর বেলা—বাহিরে রৌদ্রে সমস্ত ঝা ঝা করিতেছে। পরেশ একবার হাত মুখ ধুইয়া নূতন উদ্যমে গড়াশুনায় মনোযোগ দিবে স্থির করিল। হাত মুখ ধুইবার উদ্দেশ্যে বরাবর একেবারে কুয়োর দিকে অগ্রসর হইল।

ছোট বধূ কমলা দেখিল, যে প্রায় সমস্তটা দিনই তাহাকে একা একা কাটাইতে হইবে। সে অগত্যা একখানা বই নিয়া বসিল। কমলার স্বামী নরেশ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে, তাহার আশা আছে, কমলাকে তাহার মতই লেখাপড়ায় পারদর্শী করিয়া তুলিবে। কমলার বই হাতে নিয়াই স্বামীর কথা মনে হইল। স্বামী বলিয়াছেন এই বই খানা শেষ করিলে তিনি কমলাকে একটি পুরস্কার দিবেন। কমলা স্বামীর নিকট হইতে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে ত এ পর্য্যন্ত স্বামীকে কিছু দিতে পারে নাই। কমলা ভাবিতে লাগিল, যে স্বামীকে এবার এমন একটা কিছু তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে যেন তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যান। এই বিষয়ে নানারূপ ব্যবস্থার কথা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে কমলার মন পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলার আর বই পড়া হইল না। চঞ্চল মনে এটা ওটা করিতে করিতে একবার একটু জল আনিতে কুয়ার ধারে গেল।

তখন সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে জলের কল ছিল না। সকলেই নিজের খরচায় বাড়ীতে কুয়া কাটাইয়া নিতেন। কুয়ার ধারেই রশিবাধা একটা বালতি থাকিত তাহাতে করিয়া জল উঠাইয়া ব্যবহার করিতে হইত।

কমলা কুয়ার ধারে গিয়াই দেখিল বালতির রশিটা বেষ্টনে পড়িয়া আছে ঠিক তাহারই সঙ্গে মিশিয়া একটা সাপ। সাপটা রশির সঙ্গে এমন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে সকল সময়ে সকলের নজরে নাও পড়িতে পারে।

সাপটা ওরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিলেও ওটা জীবন্ত বলিয়াই বোধ হইল। কমলা একটু সরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল যে সাপটা নড়ে চড়ে কি না।

ঠিক এই সময়ই অপর দিক হইতে পরেশ বাহির হইল, কমলা পরেশকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝিতে পারিল যে পরেশ কুয়ার দিকেই অগ্রসর হইতেছে তখন হঠাৎ তাহার মনে একটা আশঙ্কার অনুভূতি জাগিয়া উঠিল—যদি তিনি সাপটাকে না দেখিতে পান! কমলা আবার তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া পড়িল। পরেশ নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তাহার বিশ্বাস হইল যে তিনি নিশ্চয়ই সাপটাকে দেখিতে পান নাই। এখন কি করা যায়! পরেশ সম্পর্কে কমলার ভাশুর, তাঁহার সহিত কোন দিন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হয় নাই, কমলা এখন কি করিয়া বলে যে আপনি ওখানে যাবেন না। ওখানে একটা সাপ আছে। কমলা মহা সমস্যায় পড়িল—আর সময় নাই, কমলা একেবারে বাহিরের কামরার দিকে দৌড়িল—যদি কিকে বা আর কাহাকেও দেখিতে পায়। বাস্তবিকই কি রান্তা দিয়া আসিতেছিল। কমলা অতি ব্যস্ততার সহিত জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পরেশ চীৎকার করিয়া উঠিল।

পরেশ অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে কুয়ার দিকে আসিতেছিল। রান্নাঘরের বারান্দায় দণ্ডায়মান কমলাকে সে দেখিতে পায় নাই অথবা দেখিয়াও লক্ষ্য করে নাই। ঘর হইতে এই তীব্র রৌদ্রে বাহির হইয়া সে বাস্তবিকই একটু আঁধার দেখিতেছিল। যখন কুয়ার ধারে আসিয়া পৌঁছিল তখনও সাপটার দিকে তাহার নজর পড়ে নাই। সে সেইরূপ অন্যমনস্ক ভাবেই বালতির রশিটা হাতে উঠাইয়া লইল। রশিতে টান পড়িতেই সাপের গায়ে আঘাত লাগিল। সাপ অমনি স্বধর্ম্মের উত্তেজনায় ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং দেখিতে দেখিতে আক্রমণকারীকে দংশন করিয়া তাহার প্রতিহিংসা এবং সমস্ত বিষের জ্বালা দংষ্ট স্থানে ঢালিয়া দিল।

পরেশ চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকার শুনিয়াই কমলা আবার দৌড়িল। এবার একেবারে পরেশের সাম্নে আসিয়াই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল। কি পরেশের চীৎকার শুনিতে পায় নাই, কিন্তু কমলার ব্যস্ততার ভাব দেখিয়াই কমলার পেছনে পেছনে দৌড়িয়াছিল এবং প্রায় কমলার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আসিয়া পড়িল। উভয়ে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে উভয়েই স্তম্ভিত, উভয়েই ক্ষণ কালের জন্য নির্ব্বাক। মুহূর্ত্তেই কির ডাকাডাকিতে আশেপাশের সকল বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল।

বীরেন বিয়েবাড়ীতে যাওয়ার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ দৌড়া-দৌড়ি করিয়া সাইকেল অভ্যাস করিতেছিল, ঘটনাক্রমে সে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া এই রাস্তা দিয়াই ছুটিয়া চলিয়াছিল। সোরগোল শুনিয়া সে থামিয়া পড়িল। তাড়াতাড়িতে সাইকেল থামাইতে পারিল না; পড়িতে পড়িতে কোনও রূপে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে ঘটনা শুনিয়া সাইকেল বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া বীরেনও তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিয়া বন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে বিষের কালিমা পরেশের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ ছায়া তাহার মুখাবয়বে স্পষ্টীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কোন চিকিৎসা প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্ব্বেই বন্ধুর হাতে হাত রাখিয়া পরেশ ইহজগতের সমাজ-সমস্যা হইতে অন্ততঃ এইবারের জন্য মুক্তিলাভ করিল।

পরেশের মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে, প্রতিবেশীমণ্ডলে এবং বন্ধুসমাজে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন কি, যে ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে?

কমলা বালিকা, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এখনও বিশেষরূপে পরিপক্কতা লাভ করে নাই। কমলা দেখিল সাপটা পরেশের নজরে পড়ে নাই; তাহার সহজবুদ্ধি তাহাকে বলিল, পরেশকে সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু সমাজ এখানে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কমলা জানে যে ভ্রাতৃবধূ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, ভাশুরের সঙ্গে তাহার সর্ব্বদাই একটা দূর দূর

ভাব। কাজেই সে পরেশের সাম্‌নে যাইয়া অথবা পরেশকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিতে পারিল না। কমলা অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু সে উপায়হীনা। কমলা দেখিয়াছে যে পরিবারের মধ্যে শোকে, দুঃখে অথবা সুখের শুভ মুহূর্ত্তে, আপদে, বিপদে অথবা সম্পদসময়ে, সকল প্রকার অবস্থাবিপর্য্যয়েই ভ্রাতৃবধূ এবং ভাশুরের মধ্যে যে একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে সে কেমন করিয়া জানিবে যে এই বিপদ সময়েও—ভবিতব্যতার এই বিশেষ দারুণ মুহূর্ত্তেও সেই চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের কোন কোন লোক তাহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিলেও দেখিতে পারেন। কিন্তু যদি কমলা পরেশকে সাবধান করিয়া দেওয়ার দরুণ কোন ঘটনাই না ঘটিত তবে অনেকেই হয়ত বলিত যে পুরেশ নিজেই যথাসময়ে সাপটাকে দেখিতে পাইত, কমলার এবিষয়ে দৃষ্টাবলম্বন বাহুল্যই হইয়াছে। কমলা নিজের দায়িত্বে এরূপ একটা অসম্ভব কাজ করিয়া বসিবে—সমাজের সমস্ত সংস্কারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া এরূপ মনের বল সে কোথায় পাইবে? কাজেই তাহার কেবল ছটাছুটি করাই সার হইল। ইতিমধ্যে ভবিতব্যতা আপন কাজ সারিয়া লইল।

অদৃষ্টবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, সমাজনীতিজ্ঞেরা কি ইহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পান না?

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

আমার সন্তানপালন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি। আমার কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল যে এক বৎসর বয়স না হইলে শিশুরা এসকল কিছু বুঝিতে পারে না।

মিসেস কাটার। সে তোমার ভুল ধারণা। যাক্, আমি ত তোমার কাছে বসিয়া খুব গল্প জুড়িয়া দিয়াছি। এখন উঠিতে হয় যা। মধুর শিশিটা রাখিয়া যেখানে, যদি দেখ খোকা হাতের মুঠো বার বার মুখে দেয় তবে তোমার মধ্যমাঙ্গুলি মধুতে ডুবাইয়া সেই আঙ্গুল দিয়া তার মাড়ি ঘষিয়া দিও। তা'তে সে বেশ আরাম পাবে। কিন্তু ঘন ঘন এরূপ করিও না। আর এক কথা, খোকার গলায় যে রবারের চুষি ঝুলাইয়া দিয়াছ তাহা খুলিয়া ফেল, উহাতে খারাপ একটা যন্ত্র হয়, শিশুদের পক্ষে তা ভাল নয়। ওরিস্ রুল (Orris-root) ডাক্তারখানা হইতে কিনিয়া তাহাতে ছিদ্র করিয়া ফিতায় ঝুলাইয়া তাহা দিয়া চুষিকাঠি করিয়া দেও। শিশু যত উহা কামড়াইবে তত সুগন্ধ বাহির হইবে, আর তাহাতে মাড়িরও উপকার হইবে। আর ঐ যে সুতি-কাপড়ের বিব (bib) খোকার গলায় বাঁধিয়া দিয়াছ, তাও ভাল নয়। মুখের লালায় উহা ভিজিয়া যায়, তাহাতে বুকে এবং মাড়িতে ঠাণ্ডা লাগে, আর অসুখ করে। ফ্লানেলের বিব তৈরী করিয়া তাহার উপর রেশম বা সাধারণ কাপড় লাগাইয়া নিও। উহা সহজে ধোয়া যায়, শীঘ্র শুকায়।

খোকার মাথা এত ঠাণ্ডায় সময়ও খোলা রাখিও না। শিশুদের কানে ব্যথা, মাড়ি ফোলা ইত্যাদি যত দেখিতে পাও তা সর্দ্দিই—অন্ততঃ বেশীর ভাগই—তাহাদের মাথায় ঠাণ্ডালাগা হইতে হয়। শিশুদের মাথায় ঠাণ্ডা লাগা বড় অনিষ্টকর। খুব পাতলা ফ্লানেলের টুপি খোকার মাথায় পরাইবে—যেন ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে। অনেকে শিশুদের কত যে ঔষধ খাওয়ায়! মাসে মাসে একটু ক্যাষ্টর ওয়েল খাওয়ান ছাড়া আমি আমার ছেলেদের প্রায় ঔষধ খাওয়াই নাই। ক্যাষ্টর-ওয়েল খাওয়াবার একটী গল্প তোমাকে বলিতেছি। আমার মেজ ছেলে এডমাণ্ড যখন তোমার খোকার বয়সী তখন একদিন আমি দেখিতে পাইলাম তাহার কফুই ফুলিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিয়া লইলাম, তাহার ধাত্রী কোনরূপে হাত মচকাইয়া দিয়াছে তাই কনুই ফুলিয়াছে। ধাত্রী কিন্তু দৃঢ়তার

* বিলাতের ওরিসমূলের ন্যায় এদেশে কোন কৃষ্ণমূল শিশুদিগের চুষিবার উপযোগী কি না আমি না। ওরিসমূল ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায় কি না তাহাও জানি না।

সহিত তাহা অস্বীকার করিল। ডাক্তার ডাকিলাম, তিনিও তাই বলিলেন। রাগ করিয়া ধাত্রীকে তখন জবাব দিলাম। ডাক্তার সবত্নে হাত বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। এক সপ্তাহ পরে দেখি অন্য হাতখানাও ফুলিয়াছে। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, ক্রুকোলা হইয়াছে, হাত মচকায় নাই। শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া ক্রুকোলা হয়। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন সমুদ্রতীরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে এডমাণ্ডকে নিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে হইবে। মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম।

ইতিমধ্যে আমার একটী বন্ধু একদিন বেড়াইতে আসিয়া খোকাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এক কাজ কর। ছোট চামচে এক চামচ ক্যাষ্টর অয়েল প্রতি রাত্রে খোকাকে খাওয়াও। এক সপ্তাহ এরূপ করিয়া দেখ, এতে অনিষ্ট কিছু হইবে না।' এক সপ্তাহ এরূপ খাওয়াইয়া মাঝে এক সপ্তাহ বিশ্রাম দিয়া আর এক সপ্তাহ ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইলাম। দুই হাতের ফোলাই সারিয়া গেল, আর কখনই ফোলে নাই। কোথায় গেল ক্রুকোলা, কোথায় সমুদ্রতীরে বায়ুপরিবর্ত্তন! আমার দুর্ভাবনা দূর হইল। যে ধাত্রীটীকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম তাহার প্রতি বড় অবিচার করিয়াছি বুঝিতে পারিয়া ডাকাইয়া আনিয়া তাকে আবার কাজ দিলাম।

যে সকল গৃহিণী শিশুদের অসুখবিসুখের এইরূপ মুষ্টিযোগ জানে তাহারা স্বামীর অনেক অর্থ বাঁচাইতে পারে, আর নিজেরাও কত দুশ্চিন্তা দুর্ভোগ হইতে রক্ষা পায়।

আমি। বিবাহের পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই যে বিবাহিত জীবনের এত দায়িত্ব।

মিঃ কাঃ। খুব কম মেয়েই তাহা ভাবিয়া থাকে। বড় দুঃখের কথা যে আজকাল বিবাহের পূর্ব্বে বয়স্কা মেয়েদিগকে তাদের বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। গৃহস্থালি কি করিয়া করিতে হয়, অল্প আয়ে কি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়—আজকালের মেয়েরা এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই যখন তাদের বিবাহ হয় তখন গৃহের অনেক সুখ-স্বস্তির বিনিময়ে তাহাদিগকে এ সকল শিখিতে হয়। সুস্থ অবস্থায়ই হউক আর অসুস্থতায়ই হউক শিশুপালন ত তারা জানে না বলিলেই হয়। সামান্য সামান্য অসুখ বিসুখেই ডাক্তার ডাকা—আর ঋণে ডুবা আজকালের যেন ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় বড় অসুখে ত ডাক্তার ডাকিতেই হইবে, কিন্তু সামান্য সর্দ্দিকাশি, একটু পিত্তের উপদ্রবে বমি করা, ঠাণ্ডা লাগিয়া এখানটায় সেখানটায় একটু ফোলা—তার জন্য আবার ডাক্তার ডাকাডাকি কেন বাবা?

আমি। কিন্তু বসন্ত, হুপিং কাশি—এ সকল ব্যারামের জন্যও কি আপনি ডাক্তার ডাকেন না?

মিঃ কাঃ। মা যদি যথা সময়ে সন্তানকে টীকা দেওয়ান তবে বসন্ত প্রায়ই হয় না। এ সকল রোগে ত ডাক্তার ডাকিতেই হয় কিন্তু এ সকল ব্যারাম হইলেও কিরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন মা-দের তাহা জানা উচিত। বসন্ত রোগে রোগীর পক্ষে ঠাণ্ডা চিকিৎসার আবশ্যক। হাম হইলে গরমে রাখিতে হয়। হুপিং কাশিতে সর্ব্বদা সম-উত্তাপ বিশিষ্ট মুক্ত বায়ু শিশুর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, তার কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার আর ঘন ঘন ইপেকাকুয়ানা (Ipecacuanha) খাওয়াইতে হয়।

আমি। কি দুঃখের কথা যে কুমারী অবস্থায় আমাদিগকে এ সকল বিষয় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না।

মিঃ কাঃ। মেয়েদের আজকাল এমন অনেক কারুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে ভবিষ্যতে তাদের কোন উপকার হয় না; সেগুলি একটু কমাইয়া যদি গার্হস্থ্য বিদ্যা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় তবে দেশের শিশুরা যে অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও ঘর সংসার অধিকতর সুখের স্থান হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শিশুদের সামান্য সামান্য অসুখের চিকিৎসা সকল মেয়েরই জানা উচিত। তারা ডাক্তারী শিখিবে—আমি তা বলিতেছি না; কিন্তু বিনা সাহায্যে বিবাহিত জীবনে শিশুপালনের উপযোগী শিক্ষালাভ প্রত্যেক মেয়েরই আবশ্যক। বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভ্যাস মেয়েদের অল্প বয়স হইতেই করা উচিত;—বিশেষতঃ নর্দ্দমা পরিষ্কার রাখা। অনেক হাঙ্গাম, অনেক রোগের উৎপত্তি স্থান বাড়ীর অপরিষ্কৃত নর্দ্দমা। সহরগুলিতে

এই নর্দ্দমা পরিষ্কার না রাখার জন্য কত কঠিন পীড়া এক একটী পরিবারকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলে। একটীর পর একটী ছেলেমেয়ে পীড়িত হয়, কর্ত্তা গিন্নীর শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হয়, রোজ মাথা ধরে, ঘরের গৃহিণী অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়াই নিজের দোষ এড়াইতে চেষ্টা করেন। সর্ব্বত্রই যে শুধু অপরিষ্কার নর্দ্দমার দোষে এই অবস্থা হয়, তাহা নয়, তবে বড় বড় সহরে আজকাল নর্দ্দমাই অনেক রোগের কারণ আর গৃহিণীদের এ বিষয়ে অমনোযোগই এজন্য দায়ী।

আমি। বাবা! বিবাহ করা ত মেয়েদের পক্ষে কম দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়া নয়!

মিঃ কাঃ। মেয়েরা এ দায়িত্বের কথা ভাবে কই? বিবাহের পরই স্বাধীন হইয়া তাহারা নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিবে বলিয়া আনন্দে অধীর হয়। স্বামীর আদর সোহাগের জন্য, ইচ্ছামত গয়না ও কাপড়চোপড়ের টাকা কড়ির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে আর গীতবাদ্য ইত্যাদিতে নিজের কি কৃতিত্ব আছে পার্টি ইত্যাদিতে তাহা প্রদর্শন করিতেই ব্যাকুল হয়। এই অবস্থায় মাঝখানেই হয়ত প্রথম সন্তানের জন্ম হয়।

যাক, কথায় কথায় অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। আর এক কথা, তোমার খোকাকে দুধ ছাড়াবে কবে?

আমি। আমি ওকে বুকের দুধ খাওয়াব কখন, যে ছাড়াব? ও আমার দুধ মোটেই পায় নাই। ছেলেরা এক বছরের হইলেই মা দুধ ছাড়ে?

মিঃ কাঃ। আমার মনে হয়, আট মাসের সময়ই দুধ ছাড়ান ভাল। শিশুদের স্বাভাবিক এই বয়সে কম থাকে বলিয়া আট মাসের সময় দুধ ছাড়াইতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু এ বিষয় মীমাংসা করা নির্ভর করে মায়ের স্বাস্থ্যের উপর। রুগ্ন জননীর সন্তান মার বুক হইতে বিষই পান করে। সুতরাং মা নিজের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া ছেলেকে দুধ ছাড়াইবেন। মাই ছাড়াইলে দুধে একটু মিষ্টি মিশাইয়া ঝিনুক বোতলে তাহা পুরিয়া শিশুকে খাইতে দিলে ভাল হয়। কিন্তু বেশী খাইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। এই সময় হইতেই দিনে একবার দুধের সঙ্গে সুজি বার্লি বা সুজি মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুর উপকার হয়। দিবা ভাগে তিন তিন ঘণ্টা পরে শিশুকে অল্প অল্প খাওয়াইতে হয়, রাত্রে ৪ ঘণ্টা পর পর। রাত্রি দশটার পর আর ভোর ৪টার মধ্যে শিশুকে কিছু খাইতে দিও না।

আমি। আঃ! আমার মন এখন কি আরামেই ঘুমাইতেছে! মাড়ি কাটিয়া দেওয়াতে কি উপকারই হইয়াছে! আপনাকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।

মিঃ কাঃ। আমাকে আর ধন্যবাদ দিতে হইবে না। মাড়ি কাটিয়া না দিলে বাস্তবিকই বিপদের আশঙ্কা ছিল। মাড়ির উত্তেজনায় ওর খিঁচুনীর পর্য্যন্ত হইতে পারিত। আঙ্গুল দিয়া ধীরে ধীরে ওর মাড়ি ঘষিয়া দিও। মধুতে আঙ্গুল ডুবাইয়া লইও তা হইলেই খোকার ব্যথা বোধ হবে না।

আমি। আচ্ছা বলুন ত, গত আট দশ দিন খোকা আলো সহিত পারিত না কেন? আলো কাছে আসিলেই কেন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিত?

মিঃ কাঃ। ব্যাপার ওটা একটা চিহ্ন। এইরূপ হইতে হইতেই শেষে ফিট দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকে, কেমন একটা অবসাদের ভাব দেখা দেয়, ক্রমে গুরুতর অসুখ দেখা দেয়। এখন তবে আসি। অনেকটা সময় তোমার কাছে কাটাইয়া দিলাম।

কেশরোগ।

অতীত কালে লোকে মনে করিত শারীরিক সৌন্দর্য্য বিধানের চেষ্টা একটা পাপ কার্য্য। কেননা শরীর অস্থায়ী, অতএব অস্থায়ী পদার্থের সৌন্দর্য্য বিধান নিতান্তই অনাবশ্যক। তথাপি লোকে সৌন্দর্য্যের জন্য অপেক্ষা করিত। ইহাকে সাধারণে কখনই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। অথচ জ্ঞানী মহাজনগণ ইহার নিন্দাবাদ করেন দেখিয়া প্রকাশ্যতঃ ইহার জন্য চেষ্টা করিতেন না। গোপনে ইহার আয়োজন করিতেন। চিকিৎসকগণও

ইহাতে মনোনিবেশ করিতেন না। কেন না তাঁহারা বুঝিতেন এরূপ চেষ্টা কোনও ফলদায়ক হইবে না। ফলে ইহার যাবতীয় কার্য্য সমস্তই অচিকিৎসক, অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরিচালন করিত।

যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। লোকে বুঝিতেছেন—শারীরিক সৌন্দর্য্য রক্ষা কেবল মাত্র বিলাস ব্যসন নহে, স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। চিকিৎসকগণও ইহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া আজকাল সৌন্দর্য্য সাধক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দন্তের সৌন্দর্য্যসাধক নানাবিধ ঔষধ, লোশন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ চর্ম্ম, কেশ ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গাবরণ পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার জন্য তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তা, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব যাবজ্জীবন যাহাতে এই চর্ম্ম, কেশ, দন্তপাতি ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্পন্ন ও অবস্থা উপযোগী স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য রীতিমত আয়োজন চলিতেছে।

অনেক সময়ে শারীরিক সৌন্দর্য্য জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম করে। বাস্তবিকই দুই জন একই অবস্থাপন্ন ভিখারী বালকের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ভিখারী দাতার হৃদয় আকর্ষণ করে। কর্ম্মস্থলে যে সমস্ত কর্ম্মচারী অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি প্রভু স্বভাবতঃ বীতরাগ হইয়া পড়েন। তাহারা যদি অশেষ গুণবান্ হয়, তবে প্রভু বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন। নতুবা তাহাদের চক্ষুঃশূলের কখনও প্রভু উপস্থিত হয়েন না। অবশ্য সিদুরের মূল নিন্দনীয় কিন্তু সৌন্দর্য্যউদ্ভাসিত খোলাপ নিন্দনীয় নহে। উৎকৃষ্ট কুসুমমাত্রেই প্রায় গুণে ও বর্ণে, সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট। কি সামাজিক জীবনে, কি কর্ম্মজীবনে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিশেষ কার্য্যসাধক।

ভবিষ্যতীত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সৌন্দর্য্য সাধন-চেষ্টা স্বাস্থ্যসাধক। চর্ম্ম, কেশ, কর্ণ, মুখবিবর ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্পন্ন না রাখিলে নানাবিধ পীড়ায় মানব আক্রান্ত হইতে পারে। নিউরাল্‌জিয়া, রিনাইটিস্, ওটাইটিস্ ইত্যাদি বাতজ এবং স্নায়বিক পীড়ার প্রধান কারণ আমাদের শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি যত্নহীনতা।

অদ্য কেশ সম্বন্ধে ২।১ টি কথার আলোচনা করা হইবে। রমণীগণের ইন্দ্রলুপ্তি, ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতীত তাহাদের চুল অতি শীঘ্র পুরুষের ন্যায় পাকিয়া উঠে না। পুরুষের ইন্দ্রলুপ্তি মস্তকের উর্দ্ধ-বিন্দুতেই প্রথম আরম্ভ হয়, কর্ণমূলেই কেশ প্রায় প্রথমে শুভ্র হইতে থাকে। শ্মশ্রু, শুষ্ক অপেক্ষা চুল শীঘ্র পাকিয়া যায়। যাহারা পরিশ্রমী মজুর তাহাদের মাথার প্রায় টাক পড়ে না বা বিলম্বে পড়ে এবং তাহাদের চুলও শীঘ্র পাকিয়া যায় না। কিন্তু যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমের নিতান্তই অভাব তাহাদের চুল শীঘ্র পাকে, টাক শীঘ্র পড়ে। ইহার কারণ কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সমস্ত চিকিৎসক মাথার চুলের ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মস্তকেই কেশের অভাব।

জনৈক কেশ-চিকিৎসক পণ্ডিত বলেন যে, বর্ত্তমান-কালে যে প্রণালীতে চুলের চিকিৎসা করা হয় তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল ও বিজ্ঞানবিগর্হিত। তিনি বলেন যে, আজকাল চুলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চিকিৎসকগণ যে অভিজ্ঞ লোক দ্বারা চুলের শ্যাম্পুইং, মর্দ্দন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা চুলের সুস্থ জীবনের বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ। তাঁহার এই অভিমতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি শরীর-গঠন-শাস্ত্র শারীরস্থান-বিজ্ঞান হইতে কেশের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও রক্ষার কারণ বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় সাধারণ পাঠকের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইবে না বিবেচনায়, আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

চুলের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য স্বভাবতঃই একরূপ তৈলাক্ত পদার্থ চুলের মূল হইতে নিঃসৃত হয়। ইহার উল্লেখ করিয়া উক্ত চিকিৎসক দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ সাবধানতার সহিত সময়ে সময়ে (ঘন ঘন নহে) চুলের পরিচ্ছন্নতা সাধন আবশ্যক। কোনরূপ তৈল বা চর্ব্বিময় পদার্থ চুলের মূলে অতি ধীরে ধীরে ঘর্ষণ আবশ্যক।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, রমণীর চুল পুরুষের চুলের ন্যায় ঘন ঘন মর্দ্দিত হয় না। রমণীগণ একবার কেশ বিন্যাস করিলে অন্ততঃ দুই দিন তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করেন না। অন্যান্য দেশে ও শীতপ্রধান দেশে রমণীর চুল একবার বিন্যস্ত হইলে ৭।৮ দিন একই অবস্থায় থাকে।

তিনি বলেন যে চুলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে চুলের দৈর্ঘ্য একান্ত আবশ্যক। কেন না চুলের দ্বারা চুলের মূল আবৃত থাকে বলিয়া মূল বায়ুমণ্ডলের নানাবিধ অবস্থার প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। অতএব চুল ছোট করিয়া কাটা নিতান্ত অন্যায়। বর্ত্তমান সভ্যতায় চুলের যে অবস্থা হইতেছে, তাহাতে উক্ত চিকিৎসকের মতে অতি শীঘ্র পুরুষের মস্তক শুষ্ক তালবৎ প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার মতে ঘন ঘন চুল কাটাও স্বাস্থ্য-সঙ্গত নহে।

তিনি হাট্ বা বিলাতী টুপি ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তাহাতে চুলের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। তিনি বলেন—শোণিতের অব্যাহত চলাচল চুলের স্বাস্থ্যের অনুকূল। তীক্ষ্ণদন্ত চিরুণী ব্যবহারে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া সম্ভব। তৈল মর্দ্দন বিশেষ উপকারী। কেন না মৃদুমর্দ্দনেও রক্ত চলাচল বেশ চলিতে থাকে এবং খুস্কি, মরামাস ইত্যাদি অপসারিত হয়।

চুল সাবানের দ্বারা ধৌত করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে চুলের মূলে স্বভাবতঃ যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহা নষ্ট হয়। চর্ম্ম অত্যন্ত শীতল হয় কাজেই শোণিতপ্রবাহ প্রত্যাহৃত হইতে থাকে। ইহাতে প্রত্যেক চুলের মূলে যে পেশী সংলগ্ন থাকে, তাহা শিথিল হইয়া উঠে।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, যে সমস্ত লোক বুদ্ধিজীবী তাহাদের মস্তকে প্রায় চুল থাকে না। কিন্তু এ কথার মূলে কোন সত্য নিহিত নাই।

(বিজ্ঞান)

রহিরাঙ্গ। *

(গুরুমুখী হইতে)

সোরঠ।

মহলা ১ : গুরু নানক ; রাগ আসা।

সোবর কেহা সোবর কেহা জিত বহে সভ সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখ্য কেতে বাবন হারে॥
কেতে রাগ পরীসিউ কইবন কেতে গাবন হারে।
গাবন তুহনু পউন পাণী বসন্তর গাবন রাজা ধরম দুয়ারে॥
গাবন চিত গুপত লিখ জানন লিখ লিখ ধরম বিচারে।
গাবন ঈসর বরমা দেবী সোহন সদা সবারে॥
গাবন ইন্দ্র ইন্দাসন বাইঠে দেবতরা দর নালে।
গাবন সিধ সমাধি অন্দর গাবন সাধ বিচারে॥
গাবন জতী সতী সন্তোখী গাবন বীর করারে।
গাবন পণ্ডিত পড়ন রখিসর যুগ যুগ বেদা নালে॥
গাবন মোহনীআ মনমোহনি সুরগা সহপরালে।
গাবন রতন উপায়ে তেরে অঠসঠ তীরথ নালে॥
গাবন যোধ মহবল সুরা গাবন খানীচারে।
গাবন খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা কর কর রখ্খেধারে॥
সেই তুধনু গাবন জো তুধ ভাবন রতে তেরে ভগত রসালে।
হোর কেতে গাবন সে মৈঁ চিত না আবন নানক কিআ বিচারে॥

সোই সোই সদা সচ সাহেব সাচা সাচি নাঈ।
হুকমী হোসী জাই না হুকমী রচনা যিন রচাই॥
রঙ্গী রঙ্গী কর কর যিনী মায়া যিন উপাঈ।
কর কর বেখৈ কীতা আপনা সিব তিস দি বডিআঈ॥
যে তিস ভাবে সেই করমী কিস হুকম না করণা জাঈ।
সো পাতশাহ সাহাসৎ সাহি নানক রহেন রজাঈ॥

সে ঘর ও যে গৃহ কিরূপ যেখানে বসিয়া তুমি সকলকে রক্ষা করিতেছ? সেখানে কত শত বাদ্য ও

---

* ইহা শিখদের নিত্য পাঠ্য 'নিতনেমে'র অন্তর্গত 'রহিরাঙ্গে'র বাংলা অনুবাদ। বছর বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রে শিখগুরুদিগের কতিপয় উক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে গ্রন্থসাহেব বা আদি গ্রন্থের অংশবিশেষের সম্পূর্ণ অনুবাদ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

বাদক বর্ত্তমান! কত শত (তোমার) রাগ রাগিণী ও গায়কবৃন্দ! পবন, অগ্নি ও জল তোমার গুণগান করে। রাজা ধর্ম্মদ্বারে (মন্দিরে) তোমারই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত (তোমারই) নাম গান করেন ও লিখিয়া লিখিয়া পাপ পুণ্য বিচার করেন। মহাদেব ব্রহ্মা ও পার্ব্বতী দেবী তোমারই ধ্যান করিয়া সুশোভিত হন। ইন্দ্রাসনে বসিয়া ইন্দ্রদেবতাদের সহিত তোমারই নাম গান করেন। সিদ্ধপুরুষ সমাধি ও সাধু তোমার বিচার করিয়া তোমার নাম গান করেন। সাধু, সৎ ও অনির্লিপ্ত (নরনারী) তোমার গুণগান করেন। অন্যের বীরপুরুষও তোমারই পূজা করেন। যুগযুগান্তর ধরিয়া পণ্ডিত ও ঋষি বেদ পাঠ করিয়া তোমার নাম গান করেন। স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও পাতালে সুন্দরী অপ্সরাগণ তোমার গুণগান করেন। তোমার রত্নসমূহ ও ৬৮ তীর্থ তোমার স্তুতি গান করে। যোদ্ধা ও পরাক্রান্ত বীর তোমার মহিমা কীর্ত্তন করেন; জীবনের উৎস-চতুষ্টয়ও তোমার গুণগান করে। তোমার হুকুমদ্বারা পণ্ডিত দেব মহাদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই তোমার কীর্ত্তি প্রকাশ করে। কত শত প্রেমাসক্ত ভক্ত তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া তোমারই নাম গান করেন। আরও কত শত লোক তোমার নাম গান করে, কে তাহাদের গণনা করিতে পারে? নানক কিরূপে তাহাদের বর্ণনা করিবেন, ভগবান সর্ব্বদা সত্য; তিনিই একমাত্র সত্য প্রভু; তাঁহার নাম সত্য। বিশ্ব রচয়িতা এখনও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকিবেন। তিনি কখনও পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন না এবং কেহই তাঁহাকে দূর করিতে পারিবে না। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন বর্ণের দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন; এবং উহারাই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। কেহই তাঁহাকে আদেশ করিতে পারে না। তিনিই রাজা; তিনিই রাজাধিরাজ। নানক (কহেন) তাঁহার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য।

মহল্লা ১; গুরু নানক; রাগ আসা।

সুণি বড্ডা আখৈ সভ কোই।
কে বড় বড্ডা কীঠা হোই॥
কীমতি পাই না কহিয়া যাই।
কহনে বালে তেরে নাহে সমাই॥ ২।১॥
বড় মেরে সাহিবা গহির গম্ভীরা গুণী গহিরা।
কোঈ না জাণৈ তেরা কেতা কে বড় চীরা॥
সভ সুরতী মিলি সুরতী কমাঈ।
সভ কীমতি মিলি কীমতি পাঈ॥
সিয়ানী সিয়ানী গুর গুর হোঈ।
কহণু না যাই তেরী তিল বডিয়াঈ॥ ২।২॥
সতি সত সতি তপ সতি চংগি-আঈআ।
সিধা পুরখ কীআ বডি আঈআ॥
তুধু বিনু সিধী কিনৈ না পাঈআ।
করমী মিলৈ নাহী ঠাকী রহাই আ॥
সাধণ-বালা কি আ বিচারা।
সিফতি তরে তেরৈ ভাণারা॥
বিনু তু দেহি তিসৈ কিছা চারা।
নানক সচু মহবল হাঁরা।

তোমার মহত্বের কথা শুনিয়া সকলেই তোমাকে মহান বলিয়া ডাকে; কিন্তু কেহই তোমার মহিমার সীমা নির্ণয় করিতে পারে না। তোমার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না; যাহারা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে তাহারা তোমাতেই মগ্ন হইয়া যায়। হে আমার প্রভু, তুমি গম্ভীর ও গম্ভীর; তুমিই গুণের আধার। কেহই তোমার মহিমার অন্ত জানে না। সকল যোগী ও সাধু মিলিত হইয়া তোমার ধ্যান করিলেও, সকল জ্ঞানী ও ধ্যাতা একত্রিত হইলেও তোমার মহিমার তিল মাত্র বর্ণনা করিতে পারে না। সকল সত্য, সকল সাধনা, সকল মহত্ব ও নিষ্কলঙ্ক পুরুষের সকল গুণ তোমা ভিন্ন নির্ণীত হইতে পারে না। তোমার কৃপা লাভ করিলে কেহই দূরে থাকিতে পারে না। নিরুপায় বক্তা কি করিবে? তোমার ভাণ্ডার তোমারই গুণে পরিপূর্ণ। তুমি যাহাকে দান কর, কে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে? নানক কহেন, সেই সত্যপুরুষ মহিমাময়।

মহল্লা ১; গুরু নানক; রাগ আসা।

আখা জীবা বিসরৈ মর জাউ।
আখনি অউখা সাচা নাউ॥

সাচে নাম কী লাঁসর ভূখ।
উহু ভূখর যাহি ভুলি অই দুখ॥
যো কিউ বিরচর মেরী মাই।
সাচা সাহিব সাচায় নাই॥
সাচে নাম কী তিল বাজাঈ।
আঁখি ঘকে কিমতি নহী পাই॥
যে সতি মিলিকর আখণ পাহি।
বড়া না হোবয় ঘটি না জাহি॥
না উহ মরয় না হোবয় সোগ।
দেহা রহয় না ভুকয় ভোগ॥
ওগ এহো, হোর নাহী কোই।
না কে হোআ না কে হোই॥
যে বড আপি তে বড তেরী দাতি।
তিন দিন করিকর কীচী রাতি॥
যনম বিসীরহি ভেক মআতি।
নানক নাবয় বার্ত্তা সনাতি॥

তোমার নাম গান করিয়াই আমি জীবিত থাকিতে পারি, ভুলিলেই আমার মরণ। সেই সত্য নাম উচ্চারণ করা কষ্ট-সাধ্য।

যদি (মানুষের হৃদয়ে) সত্য নামের ক্ষুধা জাগ্রত হয় এবং সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তাহাতে মানুষের সকল দুঃখ দূরীভূত হয়। যা আমার, তাঁহাকে আমি কিরূপে ভুলিতে পারি? ভগবান সত্য; তাঁহার নাম সত্য। মানুষ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তবুও তাঁহার মহিমার তিলমাত্র কণা লাভ করিতে পারে নাই; তাঁহার মূল্যও নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নামগান করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি বা ন্যূন করিতে পারে না। ভগবান অমর ও অশোক। তিনি দান করিয়া যান তবুও আমাদের ভোগের স্পৃহা দূর হয় না। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইহাই তাহার গুণ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কেহ হইবেও না।

তোমার দান-তোমারই মহত্বের পরিচায়ক। তুমিই দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছ। অসৎলোক প্রিয়তমকে ভুলিয়া থাকে। নানক কহেন, তাঁহার নাম বিনা সে শক্তিহীন।

মহল্লা ৪; গুরু রামদাস; রাগ গুজরী।

হরি কে জন সতি গুর সত পুরখা বিনয় করো গুর পাসি
হম কীড়ে কীরম সতি গুর পরমাই করি দয়া নাম পরগাসি॥
মেরে মীত গুরদেব সোকউ রাম নামে পরগাসি।
গুরমতি নাম মেরা প্রাণ সখাই, হরি কীরতি হমরী রহরাসি॥
হরি জন কে বড ভাগ বডেरे বিন হরি হরি পরমা
হরি পিয়াস।
হরি হরি নাম মিলয় তৃপ্তা দুহি মিলি সংগতি গুণ পরগাস॥
বিন হরি হরি হরি রসী নাম না পাইআ তে ভাগহীন
জমপাসি।
যো সতি গুরু পরমি সংগতি নহি আয়ে ধ্রিগ জীবয় ধ্রিগ
জীবাসি॥
যিন হরি জন সতি গুর সংগতি পাই তিন ধুরি মসতকি
লিখিয়া লিখাসি।
ধন ধন সত সংগতি যিথু হরি রস পাইআ মিলি জন
নানক নামু পরগাসি॥

হে ভগবানের ও সত্য পুরুষ সদ্‌গুরুর দাস, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা কর:—হে সত্য গুরু, আমরা ক্ষুদ্র কীট, তোমার শরণে আগত; কৃপাপরবশ হইয়া তোমার নাম প্রকাশ কর। হে আমার সুহৃদ গুরুদেব, ভগবানের নামের মাহাত্ম্য আমার নিকট ব্যক্ত কর।

গুরুর আদেশানুসারে নামই আমার প্রাণের বন্ধু; হরির গুণগান করাই আমার একমাত্র কার্য্য। ভাগ্যবান ভগবানের দাস, যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁহার জন্য পিপাসিত। ভগবানের নাম পাইলেই সে তৃপ্ত হয়; সাধু সংসর্গেই ভগবানের নামের প্রকাশ। সেই ভাগ্যহীন যে হরিনামরস লাভ করে নাই, যে সত্য গুরুর শরণে ও সংসর্গে আসে নাই, সে-ই গর্হিত জীবন যাপন করিয়াছে ও করিতেছে। সাধু সত্যগুরুর সঙ্গলাভ করিবে ইহা তাহার অদৃষ্টে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। 'নানক' কহেন, ধন্য সেই সত্য সঙ্গ যেখানে নামের প্রকাশ এবং যাহার সহিত মিলিত হইয়া হরিরস পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন।

* গুরু নানকের পরবর্ত্তী গুরুগণ সকলেই 'নানক' নাম গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। এজন্য গ্রন্থ সাহেবকে বহু 'মহল্লা' বা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম মহল্লা গুরু নানক কর্ত্তৃক রচিত; দ্বিতীয় 'মহল্লা' গুরু অঙ্গদ ইত্যাদি।

ভারত মহিলা.

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall man grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (লয়ড গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ } আশ্বিন, ১৩২৪। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোম্বাই ভগিনীসমাজ

বোম্বাই প্রদেশের নারীদিগের কল্যাণ সাধনের জন্য বোম্বাইয়ের উৎসাহশীলা মহিলাগণ ভগিনী সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গত দুই বৎসর ধরিয়া এই সমিতি সুন্দর কাজ করিতেছেন। তাঁহারা শুধু বোম্বাই নগরীতে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, অন্যান্য অনেক সহর এবং পল্লীগ্রামেও কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। গত বৎসর এই সমিতি নারী-দিগের হিতার্থে সহরে ও গ্রামে চল্লিশ হাজার পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। সহরে ও মফস্বলে প্রায় ৫০টী বক্তৃতা দেওয়াইয়া নারীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন। প্রায় ৫০টী গ্রামে নারীদিগের পাঠকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাহিত্য শিক্ষার দুইটী ও শিল্প শিক্ষার একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সমিতির একটী প্রধান উদ্দেশ্য—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ত্যাগ ও পর-সেবার ভাব জাগ্রত করা এবং অসংখ্য দুঃখী স্ত্রীলোকের সেবাকার্য্যে তাহাদিগের শক্তি নিয়োগের সুবিধা করিয়া দেওয়া। সমিতির সংসৃষ্ট শিক্ষাদান, অর্থ সংগ্রহ, সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার প্রভৃতি সকল কার্য্যই মহিলাগণ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। ভগবান দিন দিন এই সমিতির উন্নতিসাধন করুন এই প্রার্থনা করি।

বেঙ্গালোর মহিলাসমিতি।

বেঙ্গালোর মহীশূর করদ রাজ্যের প্রধান সহর। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী মহিলা সমিতি (Women's Social League) স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতির কাজ

উৎসাহের সহিত চলিতেছে। মহীশূর গবর্ণমেণ্টও সমিতির সাহায্য করিতেছেন। সমিতির অধীনস্থ সাহিত্য শ্রেণী গুলির কার্য্য চালাইবার জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট একজন লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দিয়াছেন। স্থানীয় কেনারিজ ভাষা শিক্ষাদানের জন্য দুইটী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য-নীতি ও ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় নিয়মিত-রূপে চলিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে নারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। গার্হস্থ্য বিদ্যা ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের জন্য গত বৎসর একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। শিল্পশিক্ষার জন্য কয়েকটী শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে সেলাই শ্রেণীতেই বেশী মেয়ে আসিয়া থাকে। মহীশূর ইকনমিক কনফারেন্সের প্রদত্ত ৬০০৲ টাকার সাহায্যে শিল্প শ্রেণী-গুলির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ বলিয়াই সাধারণের ধারণা। কিন্তু কোন কোন দেশীয় রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বরং ব্রিটিশ-ভারত অপেক্ষা ভাল। আমরা মহীশূরের মহিলাদিগের এই কর্ম্মশীলতার সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি।

পারস্যে নারীর অবস্থা।

প্রবাসী বলেন:—পারস্য দেশের নারীদের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে একজন তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বিলাতের পেল মেল গেজেটে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পারস্যের লোকেরা মুসলমান। তিনি বলেন, তথাকার নারীরা বরাবরই বহু বিষয়ে শিক্ষা পাইতেন। গত কুড়ি বৎসরে তাঁহাদের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কুড়ি বৎসর আগে তাঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম, কাব্য ও প্রাচীন ফরাসী গীত সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতেন। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি আধুনিক বিদ্যার কোন শাখার জ্ঞান তাঁহাদের প্রায় হইত না; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও হাফিজের অর্দ্ধেকটা মুখস্থ থাকিত, অনেকেই হয় ত সাদীর গুলেস্তাঁর অনেকখানি আবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের খুব জ্ঞান ছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে বাহির হইতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাদের শিক্ষা ও শক্তির পরিচয় পাইত না। পারসীকরা গত কুড়ি বৎসরে বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে জাতীয় উন্নতির জন্য নারীর শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। ফলে, প্রথমে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানেরা এবং পরে পারসীকেরা অনেক নারী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র তেহেরান নগরে এখন ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়ে বিদেশী নানা ভাষায় সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি খুব কম বালিকা আছে যাহারা ফরাসী বা ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে পারে না। অনেকে সঙ্গীত জানে। রাজনৈতিক বিষয়ে পারসীক মহিলাদের খুব আগ্রহ দেখা যায়। পারস্যের প্রত্যেক বৃহৎ প্রচেষ্টায় নারীদের খুব হাত দেখা যায়। দশ বৎসর আগে, গত রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়, পারসীক মহিলাদের অনেক অন্তরঙ্গ-সমিতি ছিল। তাঁহারা দেশে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপনের জন্য প্রাণ দিয়া খাটিয়াছিলেন। এতদর্থে তাঁহারা নিজ নিজ স্বামী ও অন্যান্য সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর যতটা প্রভাব খাটে, তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বালিকা বিদ্যালয় সকলের কার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্য পারস্যের শিক্ষামন্ত্রীসভা খুব চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে এই মন্ত্রীসভার প্রতি-নিধিদের সমক্ষে স্কুলে স্কুলে মেয়েদের পরীক্ষা হয়, এবং যাহারা খুব পারদর্শিতা দেখায় তাহারা সার্টিফিকেট পায়। তাহাদিগকে বক্তৃতা করিতে হয়। গত বৎসর অনেকের বক্তৃতায় পারসীক মহিলাদের বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সেলাই, বুটিতোলা এবং অন্যান্য সূচীশিল্প বরাবরই বালিকাদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। তাহারা আগে এই শিক্ষা বাড়ীতে পাইত, এখন স্কুলে পায়।

ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসন।

দেশের লোকেরা আইন কানুন করিবে, নিজেদের প্রতিনিধি দ্বারা দেশ শাসন করিবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। ইংলণ্ডে ও জাপানে যদিও রাজা আছেন তথাপি তাঁহারা দেশশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত মহাসভাই দেশ শাসন করে। ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রাজা নাই, প্রজাদের দ্বারা

নির্ব্বাচিত দেশনায়ক বা প্রেসিডেণ্ট রাজার কাজ নির্ব্বাহ করেন, দেশের লোকের প্রতিনিধিরা আইন কানুন প্রস্তুত করেন। কিছু দিন হইল অতি প্রাচীন চীন রাজ্যেও রাজপদ তুলিয়া দিয়া এইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি রুশ রাজ্যেও এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রজাতন্ত্র প্রণালী ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সকল দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। দেড়শত বৎসর ইংলণ্ডের অধীনে থাকিয়া ভারতবাসী এখন নিজের দেশশাসন কার্য্যের অধিকার চাহিতেছে। অনেক দিন ধরিয়াই এই দাবী ভারতবাসী করিতেছে। স্বায়ত্ত শাসন সহজ কাজ নহে, একার্য্যে উপযুক্ততা লাভ সহজে হয় না, এই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর দাবী এত দিন পূর্ণ করেন নাই, কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন, ভারতবাসী এবিষয়ে কতক যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। তাই সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত সচিব মহাশয় বিলাতের পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ ঘোষণা এ দেশে প্রচার করিয়াছেন। ঘোষণাটীর মর্ম্ম এইরূপঃ—বিলাতের গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, শাসনবিভাগের প্রত্যেক শাখায় অধিকসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইবে, এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির (যথা—মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড) ক্রমশঃ উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি করতঃ পরিণামে ভারতের শাসনপ্রণালীকে সম্পূর্ণ জনসাধারণের মতানুযায়ী করিয়া ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হইবে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যথাসম্ভব সত্বর এ বিষয়ে জনসাধারণকে প্রকৃত অধিকার প্রদান করা হইবে। কিরূপ অধিকার প্রথমতঃ প্রদান করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য বিলাতের ও ভারতের কর্ত্তৃপক্ষের পরস্পর পরামর্শ একান্ত আবশ্যক। এইজন্য সম্রাটের অনুমোদন অনুসারে বিলাতের গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ভারত সচিব ভারত গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ অনুসারে ভারতবর্ষে আসিবেন। এদেশে বড়লাট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করা হইবে এবং বড়লাটের সহিত একযোগে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিবেচনা ও জনসাধারণের সভা সমিতি সমূহের মত গ্রহণ করা হইবে।

গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্পিত শাসন-প্রণালী অবস্থা অনুসারে ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইবে। কোন্ সময়ে কি পরিমাণে অধিকার প্রদান করা হইবে, ব্রিটিশ ও ভারত গবর্ণমেণ্টই তাহার বিচারকর্ত্তা হইবেন, কারণ ভারতবাসীর মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তাঁহারাই দায়ী। যাঁহাদিগের উপর নূতন কার্য্যভার অর্পণ করা হইবে, তাঁহারা কি পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন এবং তাঁহাদিগের দায়িত্ব জ্ঞানের উপর কতদূর নির্ভর করা যায় তাহা বুঝিয়া ক্রমে অধিকতর অধিকার প্রদান করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলির প্রকাশ্য আলোচনার যথেষ্ট অবসর প্রদান করা হইবে এবং যথাসময়ে ঐ সকল প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে।

কংগ্রেসে আত্মকলহ।

গত বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়ন ব্যাপারে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। আমরা তখন বলিয়াছিলাম, ভারতবাসীর মুখপাত্র স্বরূপ মহাসমিতির সভাপতিরূপে যিনি ভারতের রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিবেন, তাঁহার ভারতবাসী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই জন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকা বাবুর সভাপতিত্বেরই আমরা সমর্থন করিয়াছিলাম।

এ বৎসরও শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ও মামুদাবাদের রাজাসাহেব এই উভয়ের মধ্যে মহাসমিতির সভাপতিত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। তাঁহারা নিজেরা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহাদের গুণানুরাগী লোকেরা তাঁহাদের জন্য লড়িতেছেন।

শ্রীমতী বেসাণ্ট হোমরুল লীগ অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবাসীর স্বরাজলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কর্ম্মিষ্ঠা ইংরেজ-মহিলা, যাহা ধরেন ভাল করিয়াই ধরেন,

করিয়াই করেন। এ দেশের লোকের মত নিজীব ভাবে করেন না। হোমরুল লীগের কাজ তিনি প্রবল উৎসাহের সহিতই করিতেছেন। এই চেষ্টার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়া, ভারতরক্ষা আইন (Defence of India Act) অনুসারে অবরুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। দেশবাসীর আন্দোলনে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। ভারতবাসীর হিতচেষ্টায় এইরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া তিনি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার যোগ্যতার জন্য এবং এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহাসমিতির আটটী প্রাদেশিক সমিতির মধ্যে বঙ্গদেশ স্থানীয় অপরিচিত সাতটী প্রাদেশিক সমিতিই শ্রীমতী বেসাণ্টকে স্বীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশনের সভানেত্রী করিবার পক্ষে মত (Vote) দিয়াছেন।

এই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা। কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতায় যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে বহরমপুরের প্রবীণ উকীল অকৃত্রিম দেশসেবক, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে অভ্যর্থনা সমিতির একটা বিশেষ অধিকার এই যে অধিকাংশ প্রাদেশিক সমিতির মতের সহিত অভ্যর্থনা সমিতির মতপার্থক্য হইলে তাঁহারা মহাসমিতির সমগ্র ভারতীয় অধ্যক্ষ সভাকে (All India Congress Committee) এই মতপার্থক্যের কথা জানাইয়া মীমাংসার ভার দিতে পারেন। গত বৎসর লক্ষ্ণৌ অভ্যর্থনা-সমিতি অধিকসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত অম্বিকা বাবুকে সভাপতি নিয়োগে অনিচ্ছুক হইয়া মিসেস বেসাণ্টকে সভানেত্রী মনোনীত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে মহাসমিতির সমগ্র ভারতীয় অধ্যক্ষসভার উপর মীমাংসার ভার দিয়াছিলেন। অধ্যক্ষসভা অম্বিকা বাবুকেই সভাপতি মনোনীত করেন।

এ বৎসর সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য আহূত কলিকাতা অভ্যর্থনাসমিতির অধিবেশনে মহা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় গণ্ডগোল দমন করিতে না পারিয়া সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া দেশনায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত সভাস্থল ত্যাগ করেন। প্রবীণ দেশনায়কদিগের প্রতি মিসেস বেসাণ্টের মনোনয়নাকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত লোকেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে পড়িয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। তর্কের খাতিরে যদি একথা ধরিয়াও লওয়া যায় যে প্রবীণেরা দোষ করিয়াছেন, তথাপি দেশের সর্ব্বত্র-পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিবেন কেন? শ্রদ্ধাশীলতা এদেশের বিশেষ ভাব বলিয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি; জাতীয় ভাবের প্রচারক বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকেন তাঁহারাই যদি প্রবীণের প্রতি এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশিষ্ট ব্যবহার করেন তবে দেশের ভবিষ্যৎ নেতা যুবকদিগের উপর তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল কি হইবে ভাবিলে নিরাশ হইতে হয়। সুরেন্দ্রবাবু প্রমুখ প্রবীণ নেতৃদল যে আদর্শ-দেশসেবক একথা সকলে স্বীকার করে না, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা ত্যাগ, নিষ্ঠা ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর সেবকদলের যে বঙ্গদেশে অভ্যুদয় হইয়াছে এমন কোন প্রমাণও আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অধিকতর শক্তিশালী নেতৃদলের আবির্ভাব হইলে তাঁহাদের পথ আপনি পরিষ্কার হইবে। জোরজবরদস্তি, অশিষ্ট আচরণ ও উদ্ধত ব্যবহার দ্বারা নেতৃত্ব কেহ কোন দিন পায় নাই, পাইবেও না।

শ্রীমতী বেসাণ্টকে কংগ্রেসের সভাপতি করিবার জন্য বঙ্গদেশের যে দল ঝুঁকিয়াছেন, সম্প্রতি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যোগদানে এই আত্মকলহ ব্যাপার আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-সচিবের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আশা হয়, ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসনের দাবী এইবার কতকটা পূর্ণ হইবে। এই সময় একজন অভিজ্ঞ, দেশসেবা-নিরত দেশীয় লোক কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দাবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিদেশী ভারতহিতৈষী কয়েক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভারতবাসী রাজনৈতিক হিসাবে এখন

আর শিশু নয়, নিজের দাবী—বিশেষতঃ স্ব-রাজের দাবী স্ব-মুখেই করা কর্ত্তব্য ও শোভন। শ্রীমতী বেসাণ্ট যদিও এখন এ দেশবাসিনী হইয়াছেন তথাপি তাঁহাতে আর খাঁটি ভারতবাসীতে যে অনেক তফাৎ আছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, অন্য উপায়ে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাউক।

শ্রীমতী বেসাণ্টের মনোনয়নাকাঙ্ক্ষী দলের প্রতি আমাদের একটী নিবেদন আছে। প্রবীণ নেতৃদল মনে করিতেছেন, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলে এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আমাদের মনে হয়, এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু মিসেস বেসাণ্টকে নির্ব্বাচিত না করিলে সেরূপ কোন সম্ভাবনার কারণ আছে কি? কেহই বোধ হয় তাহা মনে করেন না। মামুদাবাদের রাজা অতি যোগ্য ব্যক্তি, কংগ্রেসের সভাপতির কাজ তিনি সুচারুরূপেই সম্পাদন করিতে পারিবেন। দেশের ক্ষতির আশঙ্কা স্থলে (হউক সে আশঙ্কা কল্পিত) কেন মিসেস বেসাণ্টের দল এত জেদ করিতেছেন? দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া, প্রবীণ নেতৃদলের জীবনব্যাপী দেশসেবার অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া তাঁহারা আত্মকলহে নিবৃত্ত হউন। তাহাতে দেশের কল্যাণই হইবে। তিলমাত্র ক্ষতি হইবে না।

তথাপি যদি কংগ্রেসের অধ্যক্ষ সভা তাঁহাকে সভানেত্রী করাই কর্ত্তব্য মনে করেন দেশের সকলেই সে নির্দ্ধারণ মাথা পাতিয়া লইবেন। যদি তাঁহারা অন্যরূপ মীমাংসা করেন আমরা আশা করি শ্রীমতী বেসাণ্টের মনোনয়নাকাঙ্ক্ষী দল তজ্জন্য কংগ্রেসে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবেন না।

মিসেস বেসাণ্টের অবরোধ দণ্ড ও বঙ্গনারী।

আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে নানাস্থানে মহিলারা সভা করিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট ও তাঁহার সহকারীদ্বয়ের স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের মহিলারা তাহা করেন নাই, এই জন্য ইঙ্গিতে কেহ কেহ বঙ্গনারীর নিন্দা করিতেছেন।

বোম্বাই, মান্দ্রাজে নারীর অবরোধ প্রথা নাই, আগ্রা-অযোধ্যারও সর্ব্বত্র বোধ হয় নাই। সুতরাং মুক্ত স্বাধীনতার অভাব যে কিরূপ কষ্টকর ঐ সকল প্রদেশের নারীরা তাহা অনুভব করিতে পারে। বঙ্গনারী পিতা ও স্বামী পুত্র কর্ত্তৃক যেরূপ অবরোধে সারা জীবন যাপন করে। মিসেস বেসাণ্টের রাজনৈতিক মত প্রচারের বাধা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে লঘু। সুতরাং মিসেস বেসাণ্টের অবরোধ-দণ্ডাজ্ঞায় বঙ্গনারীর চিত্ত যদি অত্যধিক মাত্রায় পীড়িত না হইয়া থাকে তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বঙ্গনারী ফিজিদ্বীপে দেশীয় ভগ্নীগণের বিপদে মর্ম্মপীড়িত হইয়া সভা করিয়াছে। মিসেস বেসাণ্টের অবরোধের ক্লেশকরতা তাহারা অনুভূতিতে বুঝে নাই, কল্পনায় বুঝিয়াছে, সুতরাং সে জন্য যদি তাহারা বোম্বাই মান্দ্রাজের মহিলাদের মত সভা না করিয়া থাকে তবে তাহাদের বেশী দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

তবে মিসেস বেসাণ্ট ধৃত হওয়াতে বঙ্গের পুরুষগণ—উদারমতাবলম্বী ও গোঁড়া সকলেই—যে আন্দোলন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই যে মিসেস বেসাণ্টকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি—যদিও দেশের হিতের দিকে চাহিয়া আমরা তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি করিতেছি। আমরা আশান্বিত হইয়াছি এই দেখিয়া যে, বাঙ্গালী পুরুষগণ নারীর অধিকার স্বীকার করিতেছেন। মতটা (Principle) স্বীকার করিয়া লইলে কাজ অর্থাৎ মতের অনুসরণ অনেক সহজ হইয়া আসে।

সার্ব্বজনিক কাজে বঙ্গনারী।

দেশহিতকর কাজে বাঙ্গালী নারীরা বোম্বাই প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলের নারীগণ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ কেন, গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া

আসিতেছি যে সার্ব্বজনিক কাজে অর্থাৎ দেশহিতকর কাজে বাঙ্গালী নারীরা অন্য কোন কোন প্রদেশের নারীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ। ইহা একটা মত বা ধারণা মাত্র নহে। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী-বিপন্ন ভারতবাসী-দের জন্য বাঙ্গালী নারীরা কয়জনে মিলিয়া কটি সভা করিয়াছেন ও কত টাকা তুলিয়াছেন, ও ফিজিদ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণরূপ দাসত্ব বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গালী নারীরা কি আন্দোলন করিয়াছেন, এবং এই এই উদ্দেশ্যে অন্য কোন কোন প্রদেশের নারীরা কি করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেই আমাদের কথা সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে। ইহা না হয় দূর দেশের ব্যাপার। আমরা নিজে জানি, বাংলা দেশেরই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বোম্বাইয়ের মহিলারা যত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মেয়েরা তাহার দশ ভাগের একভাগ টাকাও দেন নাই। পঞ্জাবের শিক্ষিতা কোন কোন মহিলা বালিকাদের শিক্ষার জন্য ভারতময় বক্তৃতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্গের কেহ সেরূপ করেন নাই। সমাজসেবার অন্য কোন কোন বিভাগেও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই প্রভেদের কারণ কি?

ইহা জাতিগত নহে। কারণ, সম্প্রতি ২।১ বৎসর বাঙ্গালী পুরুষেরা সার্ব্বজনিক কাজে ঔদাসীন্য বা সাহসের অভাব দেখাইলেও, মোটের উপর তাহারা অন্য কোন প্রদেশের পুরুষদের চেয়ে কম অগ্রসর নয়।"

প্রবাসী সম্পাদক বলেন—সম্ভবতঃ শিক্ষার অভাব ও অবরোধ প্রথা এই পশ্চাৎপদবর্ত্তিতার কারণ। তাঁহার অনুমান সত্য। তবে শিক্ষার অভাব অপেক্ষা অবরোধ প্রথাই এজন্য অনেক বেশী দায়ী। অবরোধ প্রথা বঙ্গ-নারীর—সুতরাং বঙ্গদেশের পুরুষদেরও—যে কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী কোন চিন্তাই করে না। অবরোধ প্রথা বঙ্গদেশের নারীদিগের মনুষ্যত্ব বার আনা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ব্যাপারটা যে কি অস্বাভাবিক সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে, সহিতে সহিতে, তাহা আমা-দের ধারণায়ই আসে না। শুধু শিক্ষা দ্বারা অবরোধ প্রথার দোষপূর্ণ হইতে পারে না। মানুষের স্বাভাবিকত্ব বিনাশরূপ মহা অনিষ্টের সংশোধন অন্য কোন উপায়েই হইতে পারে না। বাহিরের সহিত সংস্পর্শে না আসিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ অসম্ভব। বঙ্গনারী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহের যন্ত্রমাত্র হইয়া পড়িয়া-ছেন। এই অবস্থায় থাকিয়া নিতান্তই যে-সকল শক্তি বিনষ্ট হয় না, সেই সকল শক্তিমাত্র তাহার অবশিষ্ট আছে। বঙ্গনারী প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নত পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। উদার ধর্ম্মমত ও উচ্চ শিক্ষায় কোন কোন নারীর মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকালবদ্ধ পিঞ্জরের পাখীকে ছাড়িয়া দিলেও সে যেমন ফিরিয়া পিঞ্জরেই প্রবেশ করে, তেমনি আমরাও আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা বেশী দিন প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারি না। মিসেস বেসাণ্টকে গবর্ণমেণ্ট অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া দেশময় কি আন্দোলনই না হইয়া গেল? এ আন্দোলন করিল কাহারা?—যাহারা নিজ নিজ স্ত্রীকন্যাকে মিসেস বেসাণ্টের অপেক্ষা শতগুণ বেশী অবরোধে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারা। মিসেস বেসাণ্টের প্রতি এই সম্মান দেখাইয়া বাংলার পুরুষগণ নারীশক্তির যে সম্মান করিলেন, নারীর স্বাধীনতার যে গৌরব ঘোষণা করিলেন, আশা করি আপন আপন গৃহে তাঁহারা তাহার অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নারীদের উদ্যান।

গত ১৩ই জুলাই কলিকাতা সার্কুলার রোডের প্রিন্সের পার্ক নারীদের ভ্রমণার্থ উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ঐ দিন তথায় এক সভার অধিবেশন হয়। হাইকোর্টের প্রধান জজের পত্নী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। সভায় বহু সংখ্যক ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয় মহিলা ও বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত নারীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে বসিবার আসন গুলি অত্যল্পকাল মধ্যে পূর্ণ হইয়া গেলে অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সর্ব্ব প্রথমে লেডি আণ্ডারসন সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উদ্যান উৎসর্গের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেন। তারপর লেডি মুখার্জ্জি ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙ্গলায় বক্তৃতা করেন।

উপস্থিত মহিলাদের অনেকেই হিন্দু পরিবারের মেয়ে। উদ্যানের তিন দিক পরদার আবৃত এবং উত্তরদ্বারে অন্তঃপুর-মহিলাদের উদ্যান-প্রবেশের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (সঞ্জীবনী)

অগ্রসর বাঙ্গালী।

উপরে যে উদ্যানের কথা লিখিত হইল সহজে মেয়েদের-জন্য তাহা পাওয়া যায় নাই। মেয়েদের এই সুবিধাটুকু দিতে অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙ্গালী ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। বোম্বায়ের একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে একজন বোম্বাইবাসী ভদ্রলোক এজন্য বাঙ্গালীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতবাসীগণ ক্রমাগতই আন্দোলন করিতে থাকুন, রাজনীতিবিদ্গণ এইরূপ উপদেশ দিতেছেন।* সমাজসংস্কারকগণেরও এই আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক। ভারতনারীর প্রশংসা আমরা কতই না উচ্চ কণ্ঠে করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টির কতই অভাব। এসম্বন্ধে সংবাদপত্রে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির (এদেশীয়দের স্বায়ত্তশাসনের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠান) এক অধিবেশনের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, একজন ইংরেজ-ডাক্তার প্রস্তাব করেন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বায়ুসেবনের জন্য মিউনিসিপালিটীর একটা উদ্যান পৃথক করিয়া রাখা যাউক। কারণ তাঁহার চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝিয়াছেন যে কলিকাতার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যক্ষ্মারোগের ভয়ানক প্রবলতার কারণ তাহাদের বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের অভাব। এই প্রস্তাবে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী সভ্য এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যে তবে ত বাংলা দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত হইতে চলিল! একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারও এই প্রস্তাবের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করেন।

* ইদি মিসেস বেসাণ্টকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল। কিন্তু তাঁহার দেশের মেয়েদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে দেওয়া ত দূরে কথা, একটা পর্দাঘেরা সাধারণ উদ্যানে বেড়াইতে দিতেও ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন।

ভাঃ মঃ পঃ।

তিনি বলেন, বাঙ্গালীমেয়েরা বিকাল বেলাটা রান্নাবান্নার আয়োজনেই কাটায়, তাহারা আবার পার্কে বায়ুসেবন করিতে যাবে কি করিয়া! সুখী বঙ্গদেশ! বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল স্ত্রীলোকই এদেশে রন্ধন কার্য্যেই ব্যতিব্যস্ত! মিউনিসিপালিটীর আর একজন উৎসাহী বাঙ্গালী সভ্য (বোধ হয় তিনি আইনব্যবসায়ী) বলেন, 'জনসাধারণের জন্যই মিউনিসিপালিটীর উদ্যান, সেই উদ্যান শুধু স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবার আইনসঙ্গত অধিকার মিউনিসিপালিটির নাই।—স্ত্রীলোক ত আর জন জনসাধারণের মধ্যে নয়!

আসুন আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতিতে—পরদানশিন উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করি। ধন্য অগ্রসর বঙ্গদেশ! ধন্য বাঙ্গালার ডবল কোম্পানী! বঙ্গের ভগিনীগণ, তোমরাই সুখী! তোমাদের ভোজনপ্রিয়, আত্মসুখরত স্বামীদিগের হাতে তোমাদের স্বার্থ সুরক্ষিত! তাহাদের উপর তোমাদের উন্নতির ভার দিয়া তোমরা প্রশান্ত চিত্তে তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাক, আর যজ্ঞাদি অতিথিগণকে নিমন্ত্রণ কর। বঙ্গদেশ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" দেশ, সে দেশে পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

সোণার গহনা।

ঝিনি গলানো বন্ধ হইয়াছে; বাঙ্গালী মেয়ের গহনা গড়াইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; সামান্য সেকরার দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বড় জুয়েলারি সপ পর্য্যন্ত যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে হাপর হইতে সোণা অতি চমৎকাররূপে নিমেষে সিকি পরিমাণ উপিয়া বায় বিশেষে পিয়া জমাট বাঁধিত, তাহার অসুবিধা হইয়াছে। কেন এমন হইল?

সভারিনের বলে পড়িয়া বেচারি টাকা আধুলি সিকি দুআনিরও অবস্থা তদ্রূপ।

গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন যে সভারিন্ টাকা ইত্যাদি প্রচলিত মুদ্রা কেহ গলাইতে পারিবে না, ভাঙ্গিতে পারিবে না, অথবা এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না, যাহাতে উহা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে না পারে। ধরা পড়িলে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

সিনিসোনার অর্থাৎ সভারিন্ গলানো সোণার গহনা কলিকাতা অঞ্চলেই অধিক প্রচলিত, পশ্চিমবঙ্গ ইহার প্রধান উপাদক। পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে ইহার তত আদর নাই। তথায় প্রায়ই খাঁটি সোণা পাত সোণা গলাইয়া গহনা তৈয়ারী হয়। কিন্তু এ সকল সোণা এখন হইতে কলিকাতের মুদ্রির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ ভারতবর্ষে যত সোণাই আমদানী হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লইবেন। অতঃপর অন্যদেশ হইতে সোণা আমদানী করিবার পূর্ব্বে লাইসেন্স লইতে হইবে। এরূপ করিবার কারণ আছে; ভারতবর্ষে যত সোণা আছে, তার অতি সামান্য অংশ মাত্র ভারতবর্ষ হইতে যায়। বৎসর বৎসর যে সোণা আসে তাহা ভারতবর্ষের মাটীতে চুষিয়া লয়; পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ হয় না। সে সকল দেশে সোণা আসে জিনিষ কিনিতে; আবার চলিয়া যায় জিনিষ কিনিতে, সোণা সেখানে বাজারে বেড়ায়, দোকানে ঢুকে, পথে হাটে। আর আমাদের দেশে সোণা যেমন আসা, অমনি অন্তর্দ্ধান। অর্থাৎ ভারতবর্ষ পরিবের দেশ—দুর্ভিক্ষের দেশ। রূপার ও সোণার আপেক্ষিক মূল্যের ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে পরিবর্ত্তন ঘটিত তাহার জন্য ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্যের লাভালাভের স্থিরতা থাকিত না বলিয়া আমাদের দেশে টাকার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সভারিনের প্রচলন হইয়াছিল; ধার্য্য হইয়াছিল যে এক পাউণ্ড অর্থাৎ একটা সভারিনের দাম ১৫ টাকা।

ভারতবাসীর হাতে সভারিন পড়িলে তাহা নিতান্ত দায়ে না পড়িলে আর বাহির হইত না। বৎসর বৎসর সোণা গলাইয়া তোমাদিগকে সভারিন তৈয়ারি করিয়া দিব; আর তোমরা তাহা কেবল পুঁজি করিবে—গলাইয়া ফেলিবে—তাকিয়া ফেলিবে। এ ব্যবস্থা কত দিন চলে? পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় এ ব্যবস্থা আদবেই উপেক্ষা করা চলে না। জাপান খুব সোণা কিনিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে সোণা কিরিয়া যায় না বলিয়া ভারতবর্ষের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে। যে পরিমাণ মূল্যের নোট গবর্ণমেণ্ট বাহির করেন, সেই পরিমাণ মত সোণা মজুত না রাখিলে হয় না। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব যখন পান, তাহার চালানের সহিত প্রায়ই সভারিন আসে না; বিদেশের বণিক জিনিস বেচিয়া কতকগুলা রূপা পায়, যে রূপা তাহাদের দেশে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয় না। মোটের উপর লোকসান হইতেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের। তা ছাড়া আমাদের বাংলা দেশে দেখিতে দেখিতে গহনা পরার সখ ও নেশা বাড়িয়া চলিতেছিল, তাহার গতি যদি থামে, তাহা হইলে বাঙ্গালীর পরম লাভ বিবেচনা করিব। পূর্ব্বকালে রাজমহিষী ও রাজকন্যারা যে গহনা পরিত না, এখন ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীর গৃহিণীর গায়ে সেই সব অলঙ্কার! কোথা হইতে ইহা আসে? কি করিয়া ইহা কুলায়? একে ত অশন বসন পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য; তাহার উপর এই গহনার বোঝা, কাজেই অর্দ্ধাশন, কাজেই অসততা, কাজেই ঘর কন্ধ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড ভঙ্গ। বাড়ীর ভিতরে হাসির অধিক রেখা দেখিবার জন্য বাড়ীর বাহিরে বাঙ্গালীকে সর্ব্বদা মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। বেচারী করেই বা কি? পশুপক্ষিদের মধ্যেও ভালবাসা বলিয়া একটা জিনিস আছে; তাহা কি আমাদের মধ্যে থাকিবে না? ভালবাসার সামগ্রীকে গহনা না পরাইলে যে লোকে তাহাকে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গহনা কিনিতে হয়—ক্ষমতার অতীত কার্য্য করিতে হয়। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলার সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে পিত্তল পরিত; দুই এক খানা রূপার গহনা পরিত। এই সেই দিনও মুসলমান আমলে সোণার নথ পরিবার অভিলাষ হইলে কাজির নিকট নজর দিয়া হুকুম লইতে হইত। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বেও সোণার গহনার এত প্রচলন হয় নাই। দেখিতে দেখিতে সোণার প্রসার বাঙ্গালী নারীর গাত্রে বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন নূতন গহনার সৃষ্টি হইতেছে—নূতন নূতন ঢং উঠিতেছে—তাহাদের কারিকুরি, তাহাদের পালিশ, তাহাদের খাদ, তাহাদের মজুরিই কত! নূতন আইনের ফলে বাংলায় সোণার গহনা যদি কমে, তবে আমাদের দেশের একটী মহোপকার সাধন হয়। (সঞ্জীবনী)

পারিবারিক জীবনে অবরোধ প্রথা।

আজকাল উন্নতির যুগ। সকল দেশেই সকল বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু উন্নতির আদর্শ নির্দ্দেশ বিষয়ে সকলে একমত নহেন; বরং ইহাই দেখা যায় যে প্রত্যেক বিষয়েই সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে মতের ঘোরতর অনৈক্য আছে, যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া একদল লোক দেশের অথবা সমাজের দেবায় সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিতেছেন, যে আদর্শকে জীবনের চরমলক্ষ্য জ্ঞান করিয়া সেই আদর্শের পরিপোষণকারী এবং প্রচারক মনে করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, অন্য একদল হয়ত সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায়ই দেশের অথবা সমাজের সর্ব্বনাশের সূচনা মনে করিয়া শঙ্কাকুল হৃদয়ে তাহা হইতে দূরে রহিতেছেন। জগতে, মানবসমাজে অথবা কোনও দেশে কোনও দিন সকল বিষয়ে মতের অনৈক্য দূর হইয়া যাইবে কিনা—কোন্ দিন অনৈক্য দূর হইয়া গিয়া পৃথিবীময় এক সার্ব্বজনীন মতবাদ ও ভাবের প্রতিষ্ঠা হইবে—কোনও দিন তাহা হইবে কিনা—এই চিন্তায় অনেক বড় বড় মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে এবং হইতেছেন। সুদূর ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে যখন আমরা দেখিতে পাই যে দুই একটি মৌলিক বিষয় ছাড়া একজনের মতামত অন্যজনে গ্রহণ করিতে অথবা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতে অসমর্থ তখন আমাদের এই মনে হয় যে সকলেরই নিজ নিজ মতামত জনসমাজে প্রকাশ করিতে এবং নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে জীবনপ্রণালী গঠন করিতে অনেকটা অধিকার আছে।

আমার মতও যে সকলেই গ্রহণ করিবেন এমন কথা বলি না। তবে যাঁহারা এখনই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ প্রবন্ধ পড়িয়া বিষয়টি আবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন এইমাত্র ভরসা। বিষয়টি আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে রমণীদের ঘোমটার অধীনতা সম্বন্ধে। কাজেই আমাদের দেশে হিন্দু সমাজেও যাঁহাদের মধ্যে ঘোমটার অধীনতা নাই তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে—যথা ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এবং অব্রাহ্মদের মধ্যেও অগ্রণী একদল যাঁহাদিগকে আমরা সভ্যতাভিমানী, আলোক প্রাপ্ত ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ি না অথচ মনে মনে নিজের সঙ্গে তুলনায় ঐ ঐ কারণেই তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া হিংসাও করিয়া থাকি। কাজেই বাকী রহিলেন দেশের সর্ব্বসাধারণ যাঁহাদের মধ্যে রমণীদের ঘোমটার অধীনতা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, বিশেষ যাঁহারা গ্রামে থাকেন, অথবা সহরে থাকিলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতার গণ্ডী ছাড়াইয়া অগ্রসর হয়েন নাই। ইঁহারাই দেশের "পনেরো আনা।" এখন যে কয়েকটা কথা বলা হইবে তাহা ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে বলিয়া সকলে ধারণা করিয়া নিবেন ইহাই লেখকের অনুরোধ। কত কাল জগতে ঘোমটার সৃষ্টি হইয়াছে ঐতিহাসিকগণ তাহার অনুসন্ধান করিবেন। কোন্ সময়ে কোন্ শাস্ত্রকার কর্ত্তৃক ইহার প্রথম আদেশ প্রচলন হয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার বিচার করিবেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় বর্ত্তমান জগত। আমাদের সময়ে সমাজে ঘোমটার কতটা আধিপত্য আছে এবং কতটা আধিপত্য থাকা বাঞ্ছনীয় আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বিবাহের আলোচনা শুনিলেই প্রায় সকল বালিকারই একটা মহালজ্জার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়—সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক বালিকার আবার সাধারণতঃই লজ্জা বেশী। কাহারও সঙ্গে একটা কথা বলিতেই যেন প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। সে যাহাই হউক বিবাহের দিন রাত্রিতেই বালিকার মাথায় প্রথম ঘোমটা উঠিল—তা সে লজ্জাশীলাই হউক কি সপ্রতিভস্বভাবাই হউক। তারপর বালিকাবধূ স্বামীর গৃহে আসিল; সেখানে সকলেই তাহার অপরিচিত। কিছুদিন একত্র থাকিলে সকলের সঙ্গেই পরিচয় হইয়া যায়, কিন্তু সমাজ এস্থলে তাহার প্রতিরোধক। সামাজিক শাসনের অনুরোধে বালিকার মাথায় যে ঘোমটা উঠাইয়া দেওয়া হইল তদ্দ্বারা নিজ পরিবারস্থ জনগণের মধ্যেও বালিকার পক্ষে পরিচিত এবং অপরিচিতের সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইল। বালিকাবধূ সাধারণতঃ নিজ ননদ এবং

অল্পবয়স্ক দেবরের সঙ্গে আলাপ করিবার অনুমতি পায়। স্বামীর সঙ্গে কথা বলিবে—তাহাও নির্জ্জনে, কাহারও সাক্ষাতে নয়। কোন কোন স্থলে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম অথবা একটু শিথিলতা দেখা যায়; হয়ত বধূকে শাশুড়ীর সঙ্গেও কথা বলিতে দেওয়া হয়, অথবা ছোট ননদ ও অল্পবয়স্ক দেবরের সাক্ষাতে, স্বামীর সঙ্গেও দুই একটা কথা চলে। যাহাই হউক মোটের উপর এ কয়েকজন ছাড়া বাড়ীর আর সকল লোকই প্রত্যক্ষ ভাবে বধূর নিকট অপরিচিতরহিয়াগেল।

এই অপরিচিতদের মধ্যে আবার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন (যথা ভাসুর ইত্যাদি) যাহাদের সাক্ষাতে শুধু ঘোমটা দেওয়াও যেন যথেষ্ট নয়। বহু বাড়ীতে আর সকলকে অল্প পরিবেশন করিতেছে, কিন্তু ভাসুরকে পরিবেশন করিবার সময় অন্য লোক আসিয়া দেখা দেয়। ভাসুর যখন যে ঘরে উপস্থিত থাকেন সেই সময়ের জন্য বধূর সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ। ভাসুরের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে আসাও যেন বধূর পক্ষে পাপ।

তারপর স্বামীর সম্পর্কে কোন কথা বলিতে হইলে বধূর পক্ষে সে এক মহা সমস্যা। এ বিষয়ে অভিভাবকেরাও অত্যন্ত অসম্ভবরূপে সতর্ক। তাঁহারা বধূকে তাহার স্বামীর সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না যাহাতে উত্তরে স্বামীর উল্লেখ করা দরকার হইতে পারে। সকল সতর্কতা সত্ত্বেও কখন কখন এরূপও ঘটিয়া পড়ে যে হয়ত স্বামী কোন কাজ করিয়া গিয়াছেন। বধূর শাশুড়ী না জানিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কাজ কে করিয়াছে। প্রশ্নের উত্তর মনে হইতেই লজ্জায় বধূর মুখ লাল হইয়া উঠিল; শাশুড়ীও বধূর ভাব দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন—কাজটা কে করিয়াছে। স্বামীর সম্পর্কে যদি কোন কথা বলিবার অথবা জিজ্ঞাসা করিবার দরকারই হইয়া পড়ে তবে হয় ননদ অথবা ক্ষুদ্র দেবরের সাহায্য লইতে হয় অথবা ইসারার সঙ্কেতে কাজ সারিতে হয়।

ইঁহারা জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে বাধ্য। নিজ বাড়ীতে মাথার উপরে সামান্য একখণ্ড আকাশ এবং চারিদিকে কয়েকটা গাছপালা অথবা বাড়ীর প্রাচীরশ্রেণী—ইহাই তাঁহাদের সমস্ত দিনের প্রধান দৃশ্য। কাজে পর্ব্বে কখনও বা বন্ধ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সহরের দুই একটা রাস্তা দেখিতে পান। আমাদের অদৃষ্টে যেমন শুভ মুহূর্ত্তে বিশেষ সুযোগে কখনও তীর্থ দর্শন ঘটিয়া থাকে, উঁহারাও সেইরূপ দানাদি উপলক্ষে কখনও বা দুই একটি নদী দেখিয়া থাকেন, কোথাও যাইবার সময় পথে ট্রেণ অথবা ষ্টীমার হইতে দুই একটা পাহাড়ের দৃশ্য চোখে পড়িলেও পড়িতে পারে, সকলেই জানেন ইহাই আমাদের দেশে রমণীদের সমজীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিষয়টা কতদূর গুরুতর তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। পুরুষ পাঠক! আপনি একবার কিছুক্ষণের জন্য মনে মনে কল্পনা করিয়া লউন যে আপনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ চলৎশক্তি রহিত হইয়া ঘরে পড়িয়া আছেন, বাহিরে যাইবার শক্তিমাত্র নাই। আপনার ব্যাধি অথবা দুর্ঘটনাজনিত আর কোনও উপসর্গ নাই শুধু শক্তিহীনতাই একমাত্র শেষরক্ষা রহিয়া গিয়াছে। মনে করুন আপনার গাড়ী করিয়া বেড়াইবার সঙ্গতি নাই, কাজেই দিনের পর দিন ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইতেছে। মনে করুন আপনার ঘরে আপনার শারীরিক সেবা করিবার যথেষ্ট লোক আছে সে সম্বন্ধে আপনার কোনও অসুবিধা অথবা সঙ্কোচের কারণ নাই। তথাপি কি এ অবস্থায় আপনার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া বোধ হইবে না? আপনার কি সময়বিশেষে মৃত্যুকেও স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে ইচ্ছা হইবে না? আপনার এই একটা জীবনের সঙ্গে তুলনায় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন আমাদের এই বাংলা দেশে প্রায় সমস্ত রমণী জাতি বংশানুক্রমে কিরূপভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। জগতের সমস্ত দৃশ্য হইতে ইঁহারা বঞ্চিত, ঘরের বাহিরে পৃথিবীর চেহারা কিরূপ সে সম্বন্ধেও ইঁহাদের কোন ধারণা নাই, বাহা প্রকৃতিতে

দিনের পর দিন কি পরিবর্ত্তন হইতেছে ইঁহারা তাহার খোঁজ রাখেন না, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নামে একটা ব্যাপার ইঁহাদের নিকট প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন কোন রমণীর মুখে ত এপর্য্যন্ত কোনও অভিযোগ শুনি নাই যে তাঁহারা এই বর্ত্তমান অবস্থায় কোন অসুবিধায় আছেন। ইহারও কারণ আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বংশানুক্রমে এই অবস্থায় থাকার দরুণ তাঁহারা ইহাতেই একরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; জীবনের প্রধান লক্ষণ যে সজীবতা—সে সজীবতা উহারা অনেকদিন হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং বর্ত্তমান নির্জ্জীব অবস্থায় সে সজীবতার আস্বাদও বোধ করি ভুলিয়া গিয়াছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Ignorance is bliss; এক্ষেত্রেও ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বাধীন জীবনের যে স্ফূর্ত্তি এবং উপকারিতা ইহার অজ্ঞতাই আমাদের দেশের রমণীদের পক্ষে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই কারণ বশতঃই ইঁহাদের জীবন একরূপ অন্তভাবে চলিয়া গেলেও ইঁহাদের পক্ষ হইতে কোন অভিযোগ শুনা যায় নাই। আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে ইহার বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। আমাদেরও এই পরাধীন, প্রয়োজনে—পরমুখাপেক্ষী এবং এই নির্জ্জীব জীবন একরূপ চলিয়া যাইতেছে; কয়জনে ইহার হীনতা, অপকৃষ্টতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন? স্বাধীন জীবনের যে উল্লাস ও আনন্দ, স্বাধীন জীবনের যে উজ্জ্বলতা ও গৌরব, স্বাধীনতা যে জীবনের পক্ষে একটা মহা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, স্বাধীনতার এসকল মহাসম্পদ লাভের জন্য কয়জনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হইয়া উঠে? আজ যদি রাজাজ্ঞায় আমাদের দেশের সমস্ত রেল, ষ্টীমার ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম হয় আমরাও গতিশক্তি রহিত হইয়া নিজ নিজ সহর অথবা গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে থাকিব। কালে কালে ইহাও আমাদের সহ্য হইয়া যাইবে। দুই এক যুগ চলিয়া গেলে হয়ত এটা একটা অসুবিধা বলিয়াই বোধ হইবে না, অন্ততঃ এসম্বন্ধে কোন অভিযোগের কথা কাহারও মনে আসিবে না। কিন্তু মানুষের ন্যায় উন্নত জীবের পক্ষে এটা কি একটা শোচনীয় ব্যাপার হইবে? আমাদের অধুনাতন আপেক্ষিক উন্নত অবস্থার সঙ্গে তুলনায় উক্তরূপ গতিশক্তিহীন ব্যবস্থা যেরূপ অদ্ভুত এবং শরীর ও মনের পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়, প্রাকৃতিক অধিকার-সম্পন্ন আদর্শ রমণীসমাজের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশের রমণীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা প্রকৃতই সেইরূপ শোচনীয়।

এই ত গেল বাহিরের কথা। এখন দেখা যাউক নিজ গৃহে তাঁহাদের জীবন-প্রণালীটা কিরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বধূবয়সে উহারা সকলের সঙ্গে কথা বলিতেও অনুমতি পায় না। আমাদের সমাজে এখনও এত অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয় যে বিবাহের পূর্ব্বের কালটুকু বাদ দিলেও চলে। বিবাহের পরেই বালিকা বধূরূপে স্বামীর গৃহে আসিল। এখন তাহার সঙ্গীর মধ্যে কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপরিণতবুদ্ধি বালকবালিকা এবং সৌভাগ্যক্রমে হয়ত দুই একজন বড় জা (যাঁহাদের বধূবয়সে তাঁহারাও এই অবরোধ নীতিরই অধীন ছিলেন)। আর আছেন স্বামী—সমাজের খাতায় ইনিই পত্নীর সুখদুঃখের কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা এবং চিরসঙ্গী। কিন্তু কার্য্যতঃ কতদূর হয় সকলেই জানেন। দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গলাভ অথবা দর্শনলাভ বালিকা বধূর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; কারণ লোকসমক্ষে স্বামীর সঙ্গে কথা বলা হইবে না—স্বামীর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, স্বামীর সঙ্গে পত্নীর যে কোনও সম্পর্ক আছে লোক সমক্ষে তাহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায়ও যদি কোন বালিকা বধূ দিনের বেলা তাহার স্বামীর সঙ্গ লাভ করিবার আশা করিতে পারে তবে তাহার ধৃষ্টতা অতি অসাধারণ বলিতে হইবে। রাত্রিতে ঘরের কাজ সারিয়া স্বামীর কক্ষে যাইতে যাইতে বিলম্ব হইয়া পড়িল—হয়ত তখন ঘুমের সময় হইয়া আসিল। বয়সোচিত দুই একটা সামান্য আলাপের পর উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; কাজের কথা আর কিছুই হইল না। স্বামী পত্নীর

শিক্ষালাভ—সমাজের এ সকল আদর্শ আদর্শরূপেই রহিয়া গেল।

এই পরিহার নীতির ফলে বালিকা বধূ পরিবারের আর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র স্বল্পসংখ্যক বালকবালিকার সঙ্গ লাভ করিল,—যাহাদের সঙ্গে একটু প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে। শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলিবে তাহাও হয়ত অতি অনাবশ্যক সঙ্কোচের সহিত। বাহিরের লোক দূরে থাকুক নিজ পরিবারের মধ্যে বালকবালিকা, যুবকযুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ইত্যাদি নানা রকমের লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহারা যে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার দরুণ কূপমণ্ডূকের ন্যায় রহিয়া সামান্য ঘরের কাজ কোনও প্রকারে সারিয়া লয় তাহা প্রায়ই স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ, স্বাধীন বুদ্ধির প্রভাবে নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই স্বভাবসংস্কার আর সামান্য ঘরের কাজই একরূপ ইঁহাদের সমস্ত জীবনের ইতিহাস। ইহার ফলও তদ্রূপ। ঘরের বালিকারা তাহাদের বৌদিদি অথবা কাকীমাদের জীবনে নিজ নিজ জীবনের অদূর ভবিষ্যতের ছায়া দেখিতে পায়। ঐ বন্ধুদের নিজ গর্ভজাত মেয়েরা যে তাহাদের মতই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এই পরিহার নীতির ফলে প্রত্যেক ঘরে দুটি করিয়া দলের সৃষ্টি হইতেছে। একটি সাধারণ সমাজ, একটি রমণীসমাজ। রমণীসমাজে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। সকলেই বলিবেন ইহাই যথার্থ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এখানেও একটি কথা আছে। রমণী সমাজ সকল দেশেই আছে। যে সব দেশে রমণীজাতি ঘোমটার অন্তরালে নির্ব্বাসিত নয়, যে সব দেশে তাঁহারাও সমাজে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, সেখানে তাঁহাদিগকে সমাজের একটা অঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য করা হয় ঐরূপ সকল দেশেই সকলে যথোপযুক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও রমণীগণ পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে অবসর পান, উৎসবে ব্যসনে, আমোদ প্রমোদে সকলের সঙ্গে একত্র যোগ দিতে পারেন, সমাজের সকল ব্যাপারে, সকল সকল প্রকার অভিব্যক্তিতেই তাঁহাদের একটা স্থান আছে। রমণীগণ সকল কাজই করিতে পারেন—তবে তাহারও একটা সীমা আছে। টেনিসন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন All that not harms distinctive womanhood (নারীর প্রকৃত বিশেষত্ব যাহাতে নষ্ট না হয়)। ইহাই রমণীজাতির সীমা। এই বিশেষ ক্ষেত্রই প্রকৃত পক্ষে রমণীসমাজ। এই রমণীসমাজে যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ইহা সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশের রমণীসমাজ ইহার অনুরূপ নহে।

ঐ সকল স্বাধীনতার দেশে যে সকল ব্যাপারে স্ত্রী এবং পুরুষ একত্র হইয়া যোগদান করেন সেখানে তাঁহাদের উভয়েরই মানবত্বের অভিব্যক্তি—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে যে একটা সাধারণ মিলনভূমি আছে উহা তাহারই পরিচায়ক। এই সাধারণত্বের উপরে যে বিশিষ্টতার জন্য তাঁহারা রমণীরূপে একটা পৃথক জাতি বলিয়া পরিচিত সেইটাই তাঁহাদের distinctive womanhood—ঐ সকল দেশের পূর্ব্বোক্ত রমণীসমাজ তাহাই জ্ঞাপন করে। এখানে রমণীসমাজে রমণীগণের বিশিষ্টতার অভিব্যক্তি। আমাদের দেশে রমণীসমাজ রমণীগণের মানবত্বের সাধারণ গুণ এবং স্ত্রীত্বের বিশিষ্টতা এই উভয়েরই অভিব্যক্তির ক্ষেত্র। এই সঙ্কীর্ণ সমাজের ক্ষীণ নির্জ্জীব অভিব্যক্তিই তাঁহাদের জীবন। সাধারণ সমাজ হইতে তাঁহারা বহুদূরে অবস্থিতি করেন। কাজেই আমাদের দেশের সাধারণ সমাজকে পুরুষ সমাজ বলিলেও প্রায় চলে—শুধু পরিবারের মাতৃস্থানীয়া দুই একটি বৃদ্ধা কি প্রৌঢ়া সময়ে সময়ে তাহাতে নামমাত্র যোগদান করেন।

অতএব দেখাইতেছে যে আমাদের সমাজে পরিবারের মধ্যে সাংসারিক বিষয় ছাড়া স্ত্রীপুরুষের উভয়ের সেরূপ যোগাযোগ নাই, উভয়ের মধ্যে ভাবের ও মতামতের বিনিময় নাই, একজনের অভিজ্ঞতা প্রায়ই অপরের জ্ঞানগোচর হয় না। পুরুষ দিনের অনেকটা সময় বাহিরের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ঘরে আসিলে সেই কাজের ধুয়া ছাড়িতে পারেন না, গৃহেও অনেক সময় সেই আলোচনাই করেন, অথবা যে আলাপই করেন

তাহা নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ। পরিবারের রমণীগণ তাহা হইতে দূরে রহিতে বাধ্য। পুরুষের আলাপের রসগ্রহণেও তাঁহারা অসমর্থ। কাজেই পরিবারের মধ্যে রমণীগণও একটি ভিন্ন দল গঠন করিয়া নিতে বাধ্য। তাঁহাদের আলাপ, তাঁহাদের মতামত, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, পুরুষের নিকট তাহার ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনিও গিয়া পৌঁছায় না।

জীবনব্যাপী এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতির ফলে তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। চিন্তাশক্তি বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে না, বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত থাকিয়া যায়। তাঁহারা পৃথিবীর ব্যাপার কিছুই দেখিতে পান না, ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের জন্মে না, নিজেদের অধিকার অনধিকারও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এইরূপ এক প্রকার অন্ধভাবেই তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়, এই সংকীর্ণতাই তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস। ইহাই আমাদের সমাজের অর্দ্ধাংশের পরিণতি।

এ সকল সংকীর্ণতার ফলে সীমাবদ্ধ সাংসারিক জীবনে যে কত প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে করুন একদিন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর সকলেই অন্যত্র চলিয়া গেলেন শুধু বালিকাবধূ ঘটনাক্রমে বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য। হয়ত ঠিক সেই সময়ের জন্য তাহার শ্বশুরও বাড়ীতে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট হইবে না। বধূর পরিচিত কোন লোককে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে হইবে। অথবা হয়ত সেই সময়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু শ্বশুরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব। সহস্র প্রয়োজন হইলেও বাড়ীর আর সকল না আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। রেলে ষ্টীমারে রমণীমাত্রকেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া যাওয়া যে কি বিষম ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন—একটা ষ্টেসনে গিয়া দেখিলে যে কেহ তাহা প্রত্যক্ষও করিতে পারেন। পথে যাইবার সময় ঘটনাক্রমে যদি রমণী সঙ্গের অভিভাবক হইতে কিছুকালের জন্যও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন তাহা হইলে হয়ত একটা অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া যাইতে পারে এই ভয়ে অনেক সময় দুই একজন রমণীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য একাধিক পুরুষ অভিভাবকের দরকার হয়। উহাদের অজ্ঞতা নিবন্ধন সংসারের—নিজ গৃহের—অনেক কাজেও যে উহারা অপটু বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন—দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এখন আপনারাই বিচার করুন ইঁহাদের জীবনের সার্থকতা কি। একবার ভাবিয়া দেখুন আমাদের দেশে রমণীজীবন সঙ্কীর্ণতার কি ভয়াবহ চিত্র। শিক্ষার অভাবেই যে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সামাজিক পরাধীনতাই ইহার মূল; এবং সেই পরাধীনতার ফল স্বরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতাই ইহার বিশিষ্ট কারণ।

এই সঙ্কীর্ণতার প্রভাব যে শুধু রমণীসমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে, পুরুষের উপরও ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে। সমাজে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান না থাকাতে ঘরের ছেলেরাও দুই চারিজন বিশেষ আত্মীয় ভিন্ন অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিতে অভ্যস্ত হয় না। ক্রমে বয়স বাড়িতে থাকিলেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। প্রয়োজন উপলক্ষে কোন অপরিচিত মহিলার সঙ্গে আলাপ করিতে হইলে তাঁহারা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। যেমন বালিকাবধূ পিত্রালয়ে শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে কোন কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে অনেক যুবকেরও সেই অবস্থা দেখা যায়। যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ শ্বশুর বাড়ীর প্রদত্ত কাপড় চোপর ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন এ কাপড় খানা কে দিয়াছেন। পাছে শ্বশুর বাড়ীর প্রতি অযথা বেশী টান আছে বলিয়া কেহ নিন্দা করেন অথবা সন্দেহ প্রকাশ করেন এই ভয়ে অনেকে শ্বশুর-বাড়ী যাইতেই নারাজ এবং এই কারণে শ্বশুরবাড়ীর প্রতি তাচ্ছিল্যের অভিনয় করিয়া অনেকে শ্বশুরশাশুড়ীর মনে কষ্ট দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

বালিকাবধূ যেরূপ লোকসমক্ষে স্বামীকে কোন কথা বলিতে পারেন না, অনেক যুবকেরও তদনুরূপ ভাব

দেখা যায়। আমি নিজে দেখিয়াছি—এক যুবক, ১০।১২ বৎসর যাবৎ তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তবু তিনি তাঁহার স্ত্রীকে সকলসমক্ষে বলিতে পারেন না যে আমার ভাত বাড়; তাঁহার স্ত্রী তখন রান্না ঘরে আছেন—ঘরের বাহির হইতে তিনি বলিলেন "আমাদের ভাত বাড়ুক" দেশের এত উন্নতির যুগেও এসব কি পুরুষের পক্ষে বালিকাসুলভ লজ্জার অতি অপকৃষ্ট উদাহরণ নয়?

Tennyson বলিয়াছেন—

The woman's cause is man's they rise or sink
Together, dwarfed or Godlike bond or free.

আমাদের সমাজে রমণীজাতিকে এরূপ পরাধীনতা ও অজ্ঞতার অধীন করিয়া রাখার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল এইরূপে উৎপন্ন হইতেছে। কবির কথায় ইহা একেবারে প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

দেশের যে এইরূপ অবস্থা তবু কাহারও চৈতন্য হইতেছে না। রমণীজাতির এরূপ পরাধীনতার দরুণ ছেলেমেয়েরা সব সেই সংস্কার নিয়াই জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কারাপন্ন পরিবারবর্গের মধ্যেই লালিত পালিত হয়, সেই অন্ধসমাজের সীমার মধ্যেই শিক্ষালাভ করে। এই আজীবন সংস্কারের বলে এবং তদনুরূপ পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে বর্ত্তমান অবস্থা সকলেরই সহ্য হইয়া যাইতেছে নতুবা হয়ত সমস্ত রমণীজাতি শুধু এই বৈচিত্র হীন জীবনের ব্যর্থতার দরুণ তদ্দণ্ডেই হইয়াই মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। এইরূপে পিতামাতা হইতে সন্তানে, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপ্রদেশে বংশ পরম্পরা সমাজের সকল শ্রেণীতে এই অবাঞ্ছনীয় প্রথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের এই ব্যাধি দূর করিতে হইলে সমাজের লোককেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে কোন বিষয়ে ভাবিবার অবসর পান না, তাঁহাকে জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গতানুগতিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া সমাজের গতিস্থিতি বিষয়ে একরূপ অলস-ঔদাসীন্যের সহিত নিজ নিজ খেয়ালে ব্যাপৃত রহেন, সেই সকল কিম্বুত-কিমাকার পুরুষেরা যেন এক একজন বলিয়া নিজের ব্যক্তিত্বের স্পর্দ্ধা না করেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা সমাজের ইষ্টানিষ্টের প্রতি উদাসীন রহিতে স্বভাবতঃই অসমর্থ, যাঁহারা স্বসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত নিজের পারিবারিক জীবনকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত মনে করেন, যাঁহারা জীবনের কোনও মুহূর্ত্তে অন্ততঃ একবারও সমাজের অভাব এবং অপূর্ণতার বিষয়ে স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা আহ্বান করিতেছি। আসুন, আপনারা সকলেই একবার সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সমস্ত সভ্যজগতের দৃষ্টান্তের কথা দূরে থাকুক, এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের দেশেও অনেক বিষয়ে নবজাগরণের দিনে এবং বিশেষতঃ এই স্বাধীন চিন্তার যুগে অতীতের আজীবন বদ্ধমূল সংস্কার কাড়িয়া ফেলিয়া একবার নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুন যে আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ব্যাপকতর স্বাধীনতার আবশ্যক কিনা। আমার বিবেচনায় রমণীজাতির অবরোধ প্রথার উন্মোচনই হইবে সেই ব্যাপকতর স্বাধীনতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

কথাটা অনেকের নিকটই একেবারে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইতে পারে। এই সমাজনির্দ্দিষ্ট প্রথা এত অধিক কাল এদেশে প্রচলিত যে আপামর সাধারণ ইহাকে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট অথবা বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়াই মনে করে এবং ইহার বিরোধীভাবের সম্ভবনীয়তাও অনেকের কল্পনায়ও স্থান পায় না। কিন্তু পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদের এই বর্ত্তমান কালেও কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। এই সেদিন চীনদেশে নবজাগরণ আসিল, সমস্ত দেশ তাহাতে মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে এই বিশাল রাজ্যে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল। পোর্ত্তুগালেরও চিরাগত প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা হইল না, রাজা এবং রাজপদ অগ্রাহ্য হইল, মুহূর্ত্তমাত্রের সঙ্কেতে সমস্ত দেশময় এক নবভাবের বন্যা আসিয়া সকল পুরাতন ব্যবস্থা উলট-পালট করিয়া গেল এবং রাজশাসনের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।

আমাদের দেশেও এরূপ একটা প্রবল পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। অবশ্যই আমরা এরূপ আশা করিতে

পারি না যে একদিনে দেশের সমস্ত রমণীকুল একযোগে সমাজের আবরণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাঁহাদের নবীনালোকে মঙ্গলালোকে সমস্ত বাস্তুমাঠ "কুসুমিত উপবনে"র ন্যায় শোভা ধারণ করিবে: কিন্তু চেষ্টা করিলে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে ঘোমটার আবরণ উন্মোচন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব।

সম্মুখে দেশের এই বিপুল জনসঙ্ঘ দেখিয়া কেহ পশ্চাৎপদ হইবেন না, সমাজের এই অসংখ্য জনসমষ্টিকে কি করিয়া বুঝাইব—ইহা মনে করিয়া কেহ ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। সকলেই নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে এই ঘোমটার আবরণ উঠাইয়া দিন এবং স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে যাহাতে সহজভাবে ভাবের আদান প্রদান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন করুন। পাশ্চাত্যদেশে—দিবসের কাজকর্ম্ম শেষে পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলে কিছুকালের জন্য একত্র হন, সেই সময়ে গল্পে, গানে, আলাপে আলোচনায়, অধ্যয়নে, স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ সকলের মধ্যে পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানে একটা সহজ প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাব বাড়ীর বয়স্থ লোকদিগের পক্ষেও যেমন শান্তিপ্রদ তেমনি বর্দ্ধমান জীবনের পক্ষেও উপকারী। আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করুন। ইহাতে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে যে ফল প্রসব করিবে তাহা জাতীয় জীবনের পক্ষে অমৃতময় হইবে সন্দেহ নাই।

আবার ইহা প্রধানতঃ পুরুষেরই কাজ। রমণীগণ এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেও কোন বিপ্লববিলোড়নে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই যে অসম্ভব তাঁহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সহমরণ-প্রথার নিরাকরণ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন—এই উভয় কার্য্যই পুরুষের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই উভয়ের অনুষ্ঠানেই অনেক রমণী বিরোধীও ছিলেন। কিন্তু কালের সাবধানে এখন প্রায় সকলেই ইহারই দায়বত্তা স্বীকার করিতেছেন। বর্ত্তমান স্থলেও পুরুষেরই একার্য্যের ভার নিতে হইবে—রমণীগণ শুধু কার্য্যের সহায় থাকিবেন। অনেক রমণী বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগ দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে পারেন কিন্তু সমাজের কল্যাণার্থে নিজের সংস্কারকে খাট করিয়া স্বামীর ভ্রাতার এবং পুত্রের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন সমাজের পক্ষেও তাহাই মঙ্গল।

অতএব আসুন আমরা সকলে একমত হইয়া কার্য্যে নামিয়া যাই। আসুন, প্রাচীন অভিভাবকের দল, আপনাদের জন্মজাত সংস্কারের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া অন্ধবিশ্বাসের জড়তা কিঞ্চিৎমাত্র থাকিলেও তাহা পরিহার করিয়া, আপনারা সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন তাহার পুণ্যজ্যোতিতে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বসমাজেরই মঙ্গলার্থে নিজেদের ভবিষ্যবংশীয়দিগকে আরব্ধ কার্য্যে অনুমতি প্রদান করুন। আসুন প্রাচীনা মাতৃস্থানীয়া দেশের অভিভাবিকাগণ, আপনারা আপনাদের পুত্রস্থানীয় দেশের যুবকবৃন্দের প্রতি কর্তৃত্বাভিমান এবং আভিজাত্যের ভাব সম্বরণ করিয়া আপনাদের স্নেহের পাত্র পুত্রকন্যাসম্প্রদায় যাহাতে ভবিষ্যতে বিশ্ব-জগত-জন-সভায় একটা সম্মানের আসনের অধিকারী হয় সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের চিরকল্যাণময় আশীর্ব্বাদের উজ্জ্বলধারায় তাহাদিগকে অভিষিক্ত করুন। আসুন নবীনা রমণীগণ, —নববধূ সম্প্রদায়, এ আন্দোলনের প্রথম আঘাত আপনাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া কোন বিষয়ে শঙ্কা অথবা সঙ্কোচের কারণ নাই। আপনারা পতির এই শুভ অভিপ্রায়ে আস্থাস্থাপন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম এবং সহানুভূতির দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করুন এবং এই পরীক্ষার সময়ে নিজেদের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং সঙ্কোচ প্রভৃতি পূর্ব্বসংস্কারের মূলোৎপাটন করিয়া শুধু ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ পতির সংকল্পিত কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়া "সহধর্ম্মিণী" নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। সর্ব্বশেষে আসুন আপনারা দেশের নব্যসম্প্রদায়, এ কার্য্যের বিশেষ ভার আপনাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। আপনারা এই স্বাধীনতার যুগে নিজ নিজ স্বাধীনচিন্তার

বিমল রশ্মিপাতে এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করুন, দেশের এবং সমাজের পক্ষে ইহার অত্যাবশ্যকতা হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করুন। বহুসহস্রাব্দের অতীত জীবনের কথা ভুলিয়া যাউন। ভক্তিতে যাহাতে ঘরে ঘরে রমণীগণ আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আপনাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী সযত্নে ঔৎসুক্যের সহিত অনুসরণ করত আপনাদের মতিগতি, আপনাদের রুচি প্রবৃত্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, যাহাতে আপনাদের জীবনের অধিকাংশ তাঁহাদের নিকট সুদূরস্থিত জন-কোলাহলের ন্যায় দুর্বোধ্য মনে না হইয়া একখানা ঘটনাবৈচিত্র পরিপূর্ণ সরল সজীব আখ্যায়িকার ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয় এবং যাহাতে তাঁহারা ঐ ঘটনাবৈচিত্রের ঘাত প্রতিঘাত নিজেদের জীবনে অনুভব করিয়া আপনাদের চিন্তায় যোগদান করতঃ জীবনের প্রকৃত সঙ্গিনীরূপে আপনাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারেন—সেই চিন্তায় ব্রতী হউন। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই আদর্শের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া জন-সমাজকে প্রবুদ্ধ করুন। সামাজিক জীবনের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজ নিজ বিচার প্রণালীর উপরে নির্ভর করিয়া, যুক্তির ন্যায্যতায় ভক্তিমান থাকিয়া, উন্নত জাতির এবং সভ্যতর জন সমাজের আদর্শ দেখিয়া আপনারা জীবনের পথে অগ্রসর হউন। আর সব কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে আপনাদের যে কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, দেশে এবং সমাজে যে স্বাধীন চিন্তার সুবাতাস বহিবে তাহাতে মোটের উপরে যে শুভ উৎপাদন হইবে তাহার তুলনায় ছোট খাট একটা বিপ্লবও অতি সামান্য ব্যাপার।

শ্রীশৈলেন্দ্রভূষণ সেন।

মহারাণী সূর্য্যমতী।

(সংমৃতা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে।—রাজতরঙ্গিনী)

১

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকাল প্রভো! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!
চরণ-আশ্রিতা দাসী আসিছে তোমার!
কোথা তারে ফেলে যাও? হোক্ সে অজ্ঞান
তবু সে তোমারি শুধু, করুণা-আধার!

২

বন্ধুর সংসার-পথে দীর্ঘ দিনমান
ছায়া হেন অনুসরি আসিনু তোমায়,
হে আর্য্য-গৌরব-রবি! হে দেব মহান্!
কেমনে লভিবে অস্ত না লয়ে সন্ধ্যায়!

৩

কুপুত্রের মাতা আমি, অন্ধ-পুত্র-স্নেহে
ভুলি হায়, তোমা নাথ, করেছি পীড়ন,
পাও নাই শান্তি কভু তীর্থে কিংবা গেহে
সে স্মৃতি বৃশ্চিক সম করিছে দংশন!

৪

ক্রুদ্ধ যথা ব্যাধ-শরে ত্যজিলা শরীর
জানি প্রভু, ততোধিক বাক্য-বাণে মম
তোমারে করেছি বিদ্ধ, বীরেন্দ্র-মিহির!
অন্তিমে দিয়েছি ব্যথা কঠিন নির্ম্মম!

৫

ক্ষমা চাহিবার মোর নাহি অধিকার
প্রগল্ভতার ত্রুটি তবু ক্ষম, প্রেমঘন!
যে রাজ্যে চলেছি মোহে অতীত ধরার
সেথাকার যোগ্য করি লহ এ জীবন!

৬

ধরণীর পঙ্কিলতা জানি সেথা নাই,
স্বার্থ তরে পিতাপুত্রে করেনা সংগ্রাম;
শান্তি আনন্দেতে সেথা পূর্ণ সব ঠাঁই,
প্রেম পুণ্যে কোলাকুলি জাগে অবিরাম!

৭

তা'রি মাঝে হে নৃপেন্দ্র! অভিষেক তব
হবে আজ দেবলোকে বাজিছে দুন্দুভি;
এ দাসী চরণপ্রান্তে দাঁড়ায়ে নীরব
কুড়াবে তোমার শুভ্র গৌরব-সুরভি!

৮

ধরার বিচ্ছেদ-ব্যথা অতিক্রম করি
মহা শুভক্ষণ আজি এসেছে জীবনে,

সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সব হর্ষে ধরি,
যুগল আত্মার দিবা শাশ্বত মিলনে !

৯

সমবেত প্রজাগণ ! সন্তান আমার !
মুহ অশ্রু, আন ত্বরা পূত বৈশ্বানর ;
অপেক্ষিছে মহারাজ, আহ্বান তাঁহার
ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুলিয়া তুলিছে অন্তর !

১০

প্রিয়তম পৌত্র ধর্ম্মে তোমাদের করে
সঁপিতেছি, করো তারে তোমরা রক্ষণ ;
তাহার অদৃষ্ট-সূত্র বিশ্বচরাচরে
তোমাদেরি মনে ধাতা করুন প্রদান !

১১

করি সবে আশীর্ব্বাদ বীর-ধর্ম্ম পালি,
অক্ষয় সুকীর্ত্তি সবে রাখ বসুধায় ;
তোমাদের চিত্তে শক্তি দিন্ অন্তর্যামী
স্বর্গাধিক স্বদেশের প্রাণদ-সেবায় !

১২

যারা আজি মাতাপুত্রে ঘটাল বিচ্ছেদ
তাহাদের পরিণাম হৌক ভয়ঙ্কর ;
মাতৃ-অভিশাপ এই—শস্ত্র-বর্ম্ম-ভেদ—
আসুক তাদের বক্ষে বহ্নি নিরন্তর !

১৩

হে হর্ষ ! জীবনাধিক ! কি কব তোমায়—
স্বয়ম্ভু করুন তব সর্ব্বথা কল্যাণ ;
বংশের দুলাল তুমি, সৌর্য্যে প্রতিভায়
তোমার হৃদয় হোক বিশ্ব-পীঠস্থান !

১৪

তুমি হও বৎস ! তব পিতামহ সম
দুষ্টের দমনকারী শিষ্টের আশ্রয় ;
মুছায়ে দীনের অশ্রু নিত্য নিরুপম
লভ শান্তি, লভ তৃপ্তি আনন্দ-বিজয় !

১৫

সাক্ষী রহ হে পাবক ! তোমা সাক্ষী করি
একদা করিনু নৃপে পতিত্বে বরণ ;
আজি পুনঃ তোমাতেই সর্ব্বস্ব বিতরি'
মাগিতেছি সতীলোকে পতির মিলন !

১৬

ত্রিলোক-সোপান তুমি, ত্রিলোকবন্দিত !
পঞ্চভূতাত্মক দেহ লহ উপহার ;
তোমাতে অমর আত্মা হয়ে বিশোধিত
অক্ষয় অমৃতধামে পৌঁছুক আবার !

১৭

ওই বুঝি "হলু" দেয় দিগ্‌বধূগণ
শঙ্খাঞ্জলি দিশে দিশে হয় বরষণ ;
তোমরাও রহ সাক্ষী চন্দ্রমা-তপন
লভি যেন পুনঃ ফিরে দয়িত-চরণ !

১৮

বিশ্বাতীত বিশ্ব কোন্ ওই বুঝি ধীরে
আমার নয়ন পাশে হয় উদ্ভাসিত ;
ওই বুঝি ভেসে আসে মন্থর সমীরে
কি অপূর্ব্ব সুধামাখা অপ্সরা-সঙ্গীত !

১৯

ধরণীর দৃশ্যপট ওই সরে যায়,
খসে যায় একে একে সকল বন্ধন ;
এতকাল ছায়া নিয়ে ছিনু কি খেলায়,
ভেঙ্গে গেছে ঘুম, আজ একি জাগরণ !

২০

প্রসারি' সহস্র বাহু কি দীপ্ত আলোক
ওই বুঝি কোটি কণ্ঠে করে আবাহন ;—
বহ্নি-কোলে হে বাঞ্ছিত ! চির-পুণ্যলোক !
হোক তবে আমাদের কুসুম-শয়ন !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

লেখায় মৌখিকভাষা ।

"সবুজপত্র" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথচৌধুরী যে মৌখিক-ভাষা বাংলাসাহিত্যে চালাবার জন্যে কোমরবেঁধে লেগে-ছেন তা নিয়ে তর্কবিতর্ক যখন সমান তেজেই চলছে

তখন এ সম্বন্ধে দু চার কথা বলবার ইচ্ছে অনেকেরই হতে পারে। লেখকেরা আবার পাঠকদের জন্যেই লেখেন, সুতরাং পাঠকস্বরূপে আমি যদি বীরবলী বা মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলি, তা'হলে সেটা বোধ হয় নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা হবে না।

প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে বীরবলী ভাষা পড়তে আমার ভাল লাগে। "সাধু ভাষার চেয়ে চলিত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার বেশী সুবিধে", এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রায় দশ বছর আগে ছেলেদের জন্যে আমার যে "উপকথা" নামক গল্পের বই লিখে তা আবার ছাপাবার দুর্ম্মতি হয়, তাতে আমি, আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কই সেই চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলাম।

আমার জিজ্ঞাস্য এই যে বাংলা সাহিত্যে যে চলিত ভাষা ব্যবহার করা হবে, তার কোন আদর্শ থাকবে, না যে লেখকের যেমন মর্জ্জি হবে, তিনি সেই রকম চলিত কথা ব্যবহার করবেন।

যাঁরা বাংলা রচনায় চলিত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁদের অধিকাংশই—আজ কাল চলিত কথার সঙ্গে দরকার মত সংস্কৃতসম ব্যবহার করে থাকেন। গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা সবুজপত্রে "বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন যে বীরবল মশায়ের মতও তাই। এখনকার কোন লেখকই টেকচাঁদ ঠাকুরের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লিখতে বসেন না যে "যে কথা আমাদের মেয়েরা বুঝতে পারবে না, এমন একটি কথাও আমাদের লেখাতে থাকবে না।"

ক্রিয়াপদ আর সর্ব্বনাম সংক্ষিপ্ত করে লেখাই হচ্ছে বীরবলী ভাষার প্রধান লক্ষণ।

কেহ যদি লেখেন, "আমি অন্ন আহার করিয়াছি", তা হলে আমরা এখন বলি যে, "ওটা হল নেহাতেই পণ্ডিতী ভাষা।" "আমি ভাত খাইয়াছি" লিখলে অনেকে আপত্তি করবেন না। বীরবল লিখবেন, "আমি ভাত খেয়েছি।" কথাবার্ত্তার সময় কেহ "খাইয়াছে" বলে না। যদি কেউ কখন বলে, তা শুনে কাণে আঙুল দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

বাংলার সর্ব্বত্র "খাইয়াছি" স্থলে "খেয়েছি" বলা হয় না। পূর্ব্ববাংলার লোকেরা "খেয়েছি" বলেন না তাঁরা বলেন, "খাইছি"। তদনুসারে পূর্ব্ববাংলার কোন লেখক যদি লেখেন, "আমি ভাত খাইছি", তা'হলে বীরবল আপত্তি করবেন কিনা?

"আমি যাদবকে ভাত খাইতে বলিলাম" বীরবলী ভাষায় হবে, "আমি যাদবকে ভাত খেতে বল্লুম।" কলকাতা বা কলকাতার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি জায়গা ছাড়া বল্লুম, কল্লুম, খেলুম, খেলুম চলিত কথায় ব্যবহার হয় না। কলকাতা অঞ্চলের লোক ছাড়া বাংলার অন্য অংশের অধিকাংশ লোকই বল্লাম বা বল্লেম, কল্লাম বা কল্লেম বলেন। কোন কোন জায়গায় লোকেরা আবার বলনু, খেনু, খেনু বলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই যে শুধু খেনু, খেনু বলেন তা নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকদেরও খেনু, খেনু বলতে শুনেছি।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, (১) আমি যাদবকে ভাত খেতে বল্লাম বা বল্লুম, (২) আমি যাদবকে ভাত খেতে বল্লাম বা বল্লেম, (৩) আমি যাদবকে ভাত খেতে বল্লু; এই তিন মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তি সাহিত্যসমাজে চলতে দেওয়া হবে? অথবা ঐ তিন মূর্ত্তিই নিজ নিজ ভক্তের নিকট আদরে পুজো খেতে থাকবেন।

কেহ এমন বলেন যে কলকাতা যখন বাংলার রাজধানী তখন কলকাতার আদর্শেই বাংলাভাষা গড়তে হবে। কাঁঠালপাড়া কলকাতার প্রভাবের বাইরে নয়। অনেকদিন হতেই রাজধানী কলকাতার আদর্শে সকল বাংলা দেশেও ভাষা ভেঙ্গেছে গড়েছে। প্রথমে পণ্ডিতেরা ভাষার আকার দেন। বঙ্কিম তাকে ভেঙ্গে আবার গড়েন। এখন সেই আকারে আর একটু নূতনত্ব দিবার চেষ্টা হচ্ছে। প্রতিভা এখন রাজধানী ছেড়ে পালান নাই। কলকাতার আদর্শ সকলকে নিতেই হবে,—এ প্রতিভার আদেশ।

পূর্ব্বোক্ত মতগুলি বা আদেশের সমস্তটা যে সকলে মাথা পেতে মেনে নেবেন এমত বোধ হয় না।

কাঁঠালপাড়া কলকাতার প্রভাবের বাইরে হ'ক বা না হ'ক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার কোন স্থানেই কলকাতা-

সুনত গেলুম, খেলুম দেখতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে যদি কাজ হত আর যদি বঙ্গভঙ্গ রহিত না হত তা হলে এতদিনে বোধ হয় যে কলকাতার প্রভাবে প্রত্যুবাদ্বিক বাংলা লেখা আর ঢাকার প্রভাবে প্রভাবান্বিত বাংলা লেখা দুই স্বতন্ত্র আকার ধারণ করত।

দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, মনোমোহন বসু প্রভৃতির নাটকেও গেলুম, খেলুম ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গেলুম, খেলুম লিখেছেন বলে মনে হয় না। "মাগো তোর চরণেতে, দিলেম এই মাথা পেতে," "যখন অনাদরে চাইনি মুখে তেবে-ছিলেম দুঃখিনী মা," প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দো লনের সময়ের লেখা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে গেলুম, খেলুম এবং গেলাম, খেলাম দুই আছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর "প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি নাটকে গেলুম, খেলুমের শ্রাদ্ধ করেছেন। যে সময় পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকগুলি প্রকাশিত হয়, প্রায় সেই সময়েই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কতকগুলি নামজাদা নাটক প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কোন পুস্তকেই গেলুম, খেলুম লেখেন নাই। বলতে দোষ নাই যে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি জায়গা ছাড়া বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অধিকাংশ লোকে গেলুম, খেলুমের বদলে খেলাম, গেলাম বা গেলেম খেলেম পছন্দ করে।

করিতেছে, বলিতেছে প্রভৃতি চলিত কথায় হ'য়েছে কর্চ্ছে, বলছে, পূর্ব্ববাংলা ও উত্তর বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে করতেছে, বলতেছেও বলে।

করিল, বলিল প্রভৃতির চলিত কথায় কেউ বা বলেন, কল্লে, বল্লে, আবার কেউ বা বলেন কল্ল, বল্ল। লেখাতেও ঐ দুই মূর্ত্তি দেখতে পাই। পশ্চিমবাংলার লেখকেরা কল্লে, বল্লে, লেখেন, আর পূর্ব্ববাংলা ও উত্তর বাঙ্গলার লেখকেরা অধিকাংশ স্থলে কল্ল, বল্ল লেখেন।

করুম বা করাম কল্লে বা কর্ল্লে সম্বন্ধে মতভেদ বড় একটা মারাত্মক নয়। কেন না, যাঁরা ছাপার অক্ষরে চলিত কথা দেখে মারমূর্ত্তি না হন, তাঁরা করুম বা করাম, কল্লে বা কল্ল, দুই সহ্য করতে পারেন। কিন্তু করছে, বলছের বদলে করতেছে, বলতেছে ছাপার অক্ষরে কেউ পছন্দ করবেন বোধ হয় না। স্থান বিশেষে পাত্র বিশেষের মুখে করতেছে, বলতেছে মানাতে পারে। যেমন, সুলেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর কৃতজ্ঞতা উপন্যাসে রাজসাহী জেলার এক ঝিয়ের মুখে "কুকী বুলতিছে, করতিছে" প্রভৃতি বসিয়ে দিয়েছেন।

রচনারীতি সম্বন্ধে অধিকসংখ্যক লেখক বা পাঠক-দের অভ্যাসের যদি কোন মূল্য থাকে তা হলে বলতে হয় যে লেখায় "গেলুম খেলুমের" বদলে "গেলাম খেলাম বা গেলেম খেলেম" ব্যবহার করাই ভাল। বাংলা কবিতায় এ পর্য্যন্ত "গেলুম" "খেলুম" স্থান পেয়েছে ব'লে মনে হয় না। উপন্যাসের কথোপকথন অংশে এবং মৌখিক ভাষায় লিখিত নাটক ও ছেলেদের গল্পের বইয়ে এখন পর্য্যন্ত "গেলুম" "খেলুমের" তত বেশী চলন হয় নাই।

বাংলাভাষার চলিত কথা ব্যবহার সম্বন্ধে আমার প্রধান খটকা যেখেছে যা নিয়ে এই বার তা নিবেদন করি।

এখনকার লেখকদের মধ্যে অনেকেই সাধুভাষা সংস্কৃত শব্দের চেয়ে চলিত শব্দই বেশী পছন্দ করেন। যেমন "অন্ন" না লিখে "ভাত", "ব্যঞ্জন" না লিখে "তরকারী", লেখাই আজ কাল বেশী লেখকে বেশী পছন্দ করেন। এই সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেরূপ শব্দের ব্যবহারে কোন গোল হবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মদৈত্য, সূর্য্য, নূতন, সত্য, স্নান, পুত্র প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ আছে যা অনেকে চলিত কথায় বিষ্যুৎ, বেহ্মদত্যি, সুয্যি, নতুন, সত্যি, চান বা ছ্যান, পুত্তুর এই রকম সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত উচ্চারণ ক'রে থাকেন। লেখায় কোন্ শব্দ চালান হবে? যাটি সংস্কৃত শব্দ না তার সংক্ষিপ্ত শব্দ? যদি বিষ্যুৎ, সত্যি, নতুন, ছ্যান প্রভৃতি লেখায় চলে তা হ'লে তা কি কেবল বীরবলী ভাষাতেই চলবে না সকল প্রকার

রচনাতেই চলবে। "কেবল বীরবলী ভাষায়" চলার কারণ হচ্ছে এই যে, স্বয়ং বীরবল মশায় নাকি রাজসাহীর উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির আসন হতে বলেছিলেন যে "সর্ব্বত্র" যে বীরবলী ভাষা চলে না তা তিনি জানেন।" একথা আমাকে রাজসাহী কলেজের একটী ছাত্র বলেন। প্রকৃত পক্ষে বীরবল একথা বলেছিলেন কি না অথবা তাঁর এইরূপ মত কি না তা আমি জানি না।

যদি সকল রকমের বাংলা লেখাতেই বিদ্যুৎবার, সূর্য্য, নোতুন, সত্য প্রভৃতি আটপৌরে পোষাকে বা'র হয়, তা' হলে যাঁরা কেবল মাত্র বাংলাভাষার বা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন তাঁদের ভাগ্যে কি বৃহস্পতি, সূর্য্য, নূতন, সত্য প্রভৃতি পোষাকী চেহারা দেখা ঘটে উঠবে না? বৃহস্পতি, সূর্য্য, সত্য, নূতন প্রভৃতি শব্দ গুলো কি তাহ'লে এখন হ'তে যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেন কেবল তাঁদের একচেটে সম্পত্তি হ'য়ে প'ড়বে? ঐ সকল শব্দ বাংলা ভাষার অভিধানে স্থান পাবে কি না? বাংলা ভাষার প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এখন থেকে যে সব বই লেখা হবে তাতে বিদ্যুৎ, সূর্য্য, নতুন, সত্য লেখা হবে, না, বৃহস্পতি, সূর্য্য, নূতন, সত্য প্রভৃতি লেখা হবে?

তা ছাড়া, বাংলার সকল স্থানের লোকেরও সংস্কৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত উচ্চারণ এবং অনেক চলিত শব্দেরও উচ্চারণ এক রকম নয়। এমতাবস্থায় লেখক-মাত্রেই যদি নিজ নিজ অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে ঐ সকল শব্দ লেখেন তাহ'লে ব্যাপারটা বড় সুবিধের হয় বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিলে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত চলিত কথার ও সংস্কৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত শব্দের উচ্চারণ অনুসারে লেখার দিকে সেই সেই অঞ্চলের লেখকদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে, আর তাহাতে অস্বাভাবিক মনোবাদিজের ও রেষারেষির সৃষ্টি হতে পারে।

কয়েক বছর হ'ল বাংলার প্রত্যেক জেলার চলিতভাষা অবলম্বনে প্রত্যেক জেলার প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা বই লেখাবার প্রস্তাব হয়েছিল মনে হচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হতেই বুঝি এই প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবে বাংলার অধিকাংশ লোকেই আপত্তি করেছিল মনে হচ্ছে। সে সময় "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার মুসলমানদের কথিত ভাষার নিম্নলিখিত নমুনা ছাপান হইয়াছিল,—

কানু। ও মেরা বাই হরষ কৈমন?
আচেচার না যেমোন তেমোন।
সোমেন দেছে গবর্ণমেন্তর,
মোরা আর জজ মেজস্তর,
সেসনের মোকর্দ্দমা,
বিচার হ'রমু পক্ষ দোমা।
বড় হয়রান লাগছে পাছে,
এয়ার কি কোন পথ আছে?
বাবনায় বাবনায় মেরা বাই,
হাঙ্গে রাইতে ওম নাই।

বনু। মেরা বাই বাবনা কি তাই
আছিমগিরি দেছেন আন্নায়।
এহোন কত্তউছিল মোক্তার,
হাত কচলাইবে তোমার দার।
হুজুর হুজুর করিয়া কতো
ঘেংরি গাইবে নানা মতো,
এহোন তুমি জজের দারে
বলা মেকা বাচিয়ার পরে।
বালো হংবাদ মেরা বাই
এহোন মোরা মিডাই চাই॥

উপরে উদ্ধৃতভাষা কোন নাটক বা উপন্যাসের পাত্র-বিশেষের মুখ দিয়ে অবস্থা বিশেষে বলান যেতে পারে। তা ছাড়া ঐরূপ ভাষায় বই লেখা চলবে বলে মনে হয় না।

যে কলকাতার ভাষাকে আদর্শ করবার কথা কেহ কেহ বলেন সেই কলকাতাতে প্রচলিত কথার এমন অদ্ভুত উচ্চারণ আছে যা কোথায়ও চালাতে বীরবলী-ভাষার চরমপন্থীরাও সাহস করেন কি না সন্দেহ। যারা কলকাতার লোকেরা "দুরে" বলেন না বলেন

"দূরে," "ছিল" বলেন না, বলেন "ছেল" বা "ছাল", দুইপ্রহরকে বলেন দুকুর। প্রত্যেক শব্দ যেমন উচ্চারণ করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে লেখা বীরবলী ভাষাতেও চলে নাই। আমরা এতাবদ্ধা প্রভৃতি এখনও কেউ আম্রা, তোম্রা লেখেন নাই।

সংস্কৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত শব্দের উচ্চারণ এবং অসংস্কৃত প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ বাংলার সর্ব্বত্র এক রকম নয় তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এত বৈষম্য যে শীঘ্র বা সহজে দূর হবে তা বোধ হয় না। অথচ বীরবলী ভাষার প্রসার ও প্রচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া যদি বাঞ্ছনীয় মনে হয় তাহ'লে একখানি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার অভিধান সংকলিত হওয়া দরকার। এই অভিধানে এখনকার বাঙ্গলা অভিধানে স্থানপ্রাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ত থাকবেই, তা ছাড়া তাতে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত প্রচলিত কথাও থাকবে। সংস্কৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত যে শব্দ তাও থাকবে। অর্থাৎ সেই অভিধানে বৃহস্পতি থাকবে, বিদ্যুৎ থাকবে, সূর্য্য থাকবে, সুধিও থাকবে, ভানুক থাকবে, ভালুক থাকবে। এতদ্ব্যতীত ক্রিয়া পদের যে সংক্ষিপ্ত আকার তাও সেই অভিধানে থাকবে। এবং করিয়াছি থাকবে, করেছিও থাকবে, করিলাম থাকবে, করলুম, করাম, করেম, কর্‌ও থাকবে। ক্রোধও থাকবে, "রাগ"ও থাকবে। (আধকালকার অনেক বাঙ্গলা অভিধানে "রাগ" কথার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত অর্থ ক্রোধ লিখিত না হয়ে তার আঠার রকম মানে লেখা আছে দেখেছি।) তাতে মনুষ্য থাকবে, মানুষ থাকবে, আর মনিষ্যি থাকবে।

আজকাল যাঁরা বীরবলী ভাষায় লেখেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেখতে পাই যে, সকল জায়গায় তাল ঠিক রাখতে পারেন না। তাঁদের কেউ কেউ কথোপকথনের মধ্যে লেখেন "রাম বল্লে, আমি তাহার নিকট যাইতে পারিব না।" রাম বলিল, "আমি তাহার নিকট যাইতে পারিব না," হল এখনকার কেতাবী ভাষা। রাম বলিল, "আমি তার নিকট যেতে পারব না," কেতাবী ভাষায় এরূপও চলে। বীরবলী ভাষায় হচ্ছে, রাম বল্লে, "আমি তার কাছে যেতে পারব না।" রাম বল্লে, "আমি যাইতে পারিব না।" —এ হচ্ছে না বীরবলী না কেতাবী, দুয়ের বা'র এ রকম ভাষা একবারে অসহ্য।

স্বাভাবিক নিয়মানুসারে লিখিত ভাষা ক্রমশঃই কথিত ভাষার দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু তা হ'লেও লিখিত ভাষা কখনও যে কথিত ভাষার সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবে তা মনে হয় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

হিন্দু ধর্ম্ম।

জগতের মূল কারণ।

সংসারে যাহা কিছু আছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত—যথা দৃশ্য এবং অদৃশ্য। এই বিষয়ের বিচার আমরা ন্যায় সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই। আর কণাদের মতে জগতের মূল কারণ পরমাণু। কোন পদার্থকে বিভাগ করিতে করিতে যখন আর বিভাগ হয় না তাহাই পরমাণু নামে খ্যাত। পরমাণুর সংযোগ হেতুই তাহাতে নূতন নূতন গুণের আবির্ভাব হয়, সুতরাং ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি হইয়া থাকে। মন এবং আত্মারও পরমাণু আছে। যখন ইহারা একত্র হয় তখনই চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুতের পরমাণু স্বভাবতঃই পৃথক পৃথক থাকে। ক্ষিতির মূল পরমাণুতে রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ এই চারিটি গুণ আছে। জলের পরমাণুতে তিনটি, তেজের পরমাণুতে দুইটি এবং বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ দৃষ্ট হয়। জগৎ প্রথম হইতেই সূক্ষ্ম এবং নিত্য পরমাণু দ্বারা পূর্ণ ছিল। যখন তাহাদিগের সংযোগ ঘটিল তখন সৃষ্টির ব্যক্ত পদার্থ সৃষ্ট হইল। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে কাহার কাহার মত এই যে পরমাণু সংযোগের নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বর। এই শ্রেণীর নৈয়ায়িকগণ সেশ্বর নামে খ্যাত। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই পরমাণুবাদের খণ্ডন দেখা যায়। কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রের মত এই যে সংসারে কোন

প্রকার নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। যাহা কিছু দেখা যায় তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ছিল। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুতে যে গুণ দেখা যায়, যে বস্তু হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেও সেই গুণ থাকা চাই (সাংখ্য কারিকা ৯)। বৌদ্ধ এবং কণাদের মতে এক পদার্থের নাশ হইয়া তাহা হইতে নূতন দ্বিতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়, যথা বীজের নাশে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের নাশে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদান্তিদিগের এ মত পছন্দ নয়। তাঁহারা বলেন, বৃক্ষের বীজে যে বস্তু আছে তাহার নাশ হয় না, পরন্তু সেই দ্রব্য ভূমি দ্বারা এবং বায়ু দ্বারা অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে সুতরাং বীজ অঙ্কুররূপে পরিণত হয়। (বেদান্ত সূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ২।১—১৮)। সারাংশ এই যে, যাহা ছিল না তাহার কখনও অস্তিত্ব হইতে পারে না (গীতা ২।১৬)। তবে কি মূলে অনেক পরমাণুই অব্যক্তাবস্থায় ছিল? কি করিয়াই বা পশু, মনুষ্য, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই তাহার উৎপত্তি হইল। পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রেও এখন এ বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্র বলেন, জগতের মূলে ৬২টি মূলতত্ত্ব আছে কিন্তু বিজ্ঞান বলেন যে ইহাদিগের মূলে এমন কোন একটী মূলতত্ত্ব আছে যদ্দ্বারা এইগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র মতে এই মূল পদার্থকে "প্রকৃতি" বলে এবং ইহা হইতে যে পদার্থ সৃষ্ট হয় তাহার নাম "বিকৃতি"। প্রকৃতি এক হইলেও তাহার গুণ এক নহে। ইহা ত্রিবিধ যথা—সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্বাবস্থা উৎকৃষ্ট এবং তম নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্টাবস্থা হইতে উৎকৃষ্টের দিকে যাইবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহাই রাজসিকাবস্থা। প্রকৃতিতে এই গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। পরন্তু যখন উক্ত গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক হইতে থাকে তখন প্রকৃত্যাত্মক রজোগুণের জন্য মূল প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। তখনই সৃষ্টির আরম্ভ। এই জন্য মূল দ্রব্য এক হইলেও গুণভেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাম্যাবস্থান্বিত প্রকৃতিকে সাংখ্য শাস্ত্রে "অব্যক্ত" বলে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রকেই "ব্যক্ত" বলে। যদি আমরা প্রকৃতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অব্যক্ত স্বীকার করি তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণের পরমাণুবাদ মূলতঃ ছিন্ন হয়। কারণ পরমাণু যদি অব্যক্ত এবং অসংখ্য তথাপি প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র অবয়ব হইবার কারণ নৈয়ায়িকগণ বলিতে পারেন নাই। দুইটী পরমাণুর মধ্যে কোন্ পদার্থ অবস্থিত তদ্বিষয়ে প্রশস্তপাদ সম্পূর্ণ মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। সাংখ্যের সিদ্ধান্তমতে প্রকৃতিতে পরমাণুরূপ অবয়ব-ভেদ নাই। ইহা স্বতঃই একের সহিত অন্যটী সংশ্লিষ্ট। অতএব ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বয়ম্ভূ এবং এক। ইহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। এই মূল প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী এবং অব্যক্ত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদান্তিগণের "পরব্রহ্ম" এবং সাংখ্যবাদীদিগের প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল ভেদ। ইহার কারণ এই যে, বৈদান্তিক পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপ এবং নির্গুণ পরন্তু প্রকৃতি জড়রূপা এবং সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী অর্থাৎ সগুণ। সাংখ্যকার "প্রকৃতি" হইতে ভিন্ন আর একটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেটী "পুরুষ"। প্রকৃতি অচেতন এবং পুরুষ সচেতন। সাংখ্যবাদীর মতে এই দুই তত্ত্ব অনাদি। এই জন্য সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলে। ইঁহারা প্রকৃতি এবং পুরুষের অতীত অন্য কোন মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যদ্যপি নির্গুণ পুরুষ কিছুই করিতে পারেন না তথাপি যখন প্রকৃতির সহিত উহার সংযোগ হয় তখন লৌহ যেমন চুম্বকের নিকটে যাইলে লৌহের আকর্ষণ-শক্তি আসিয়া যায় সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বীয় গুণের (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ব্যক্তীভাব পুরুষের সমক্ষে বিস্তার করে (সাং কা ৫৭)।

সৃষ্টি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই বিশ্বসৃষ্টির কারণ। প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলেই গুণের বিস্তার হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে বেদসংহিতা, উপনিষদ এবং স্মৃতি, প্রকৃতিকে মূল না মানিয়া পরব্রহ্মকে বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বেদের মতে হিরণ্যগর্ভ প্রথমে উৎপন্ন হন, তাহার পর তাঁহা হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে

অথবা পূর্ব্বে জল উৎপন্ন হইল, সেই জলে এক অণ্ডের উদ্ভব হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মা হইতে অথবা সেই মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইল (মনু ১।৮—১৩)। অথবা সেই ব্রহ্মার (পুরুষের) অঙ্গ হইতে এক স্ত্রী উৎপন্ন হইল। পরে মিথুন ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রহ্মার এই কন্যা হরণ কথা আমরা শুনিতে পাই তাহা এই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন স্বীয় শরীর হইতে এক স্ত্রী উৎপন্ন করিলেন তখন সে তাঁহার কন্যা হইল এবং পরে যখন মিথুন ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের প্রজা বৃদ্ধি করিলেন তখন কন্যা হরণ হইল, না ত কি হইল। বস্তুতঃ ব্রহ্মা চরিত্রহীন ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় কন্যা হরণ করেন নাই। কথাটা রূপক মাত্র। যাহা হউক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে তেজ, জল এবং পৃথ্বী (অন্ন) এই তিন তত্ত্ব উৎপন্ন হইল এবং পরে তাহার মিশ্রণ হইতে সকল পদার্থ রচিত হইল (ছান্দো ৬।২-৬)। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে আদিতে পরমাত্মার এই ইচ্ছা জন্মিল যে আমি অনেক হইব "বহু স্যাং প্রজায়েয়" এবং ইহার পর সৃষ্টি উৎপন্ন হইল (ছা ৬, ২, ৩, তৈত্তিরীয় ২।৬)। সাংখ্যের মতে প্রকৃতিতে "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" উৎপন্ন হইলেই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। সাংখ্যবাদীগণ প্রকৃতি ও পুরুষকে স্বয়ম্ভূ এবং স্বতন্ত্র বলিয়া মানেন পরন্তু বেদান্তবাদীগণ তাহা মানেন না। বেদান্তীদিগের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ একই পরমেশ্বরের বিভূতি মাত্র।

বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। ইহার উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) দেখা যায়। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে প্রথমে পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমে একটিগুণ পদার্থ উৎপন্ন হইল, তাহা হইতে দুইগুণ এবং পুনরায় তিনগুণ বা ক্রমোধিক গুণ বিশিষ্ট পদার্থের উত্তরোত্তর উদ্ভব হইল। পঞ্চ মহা ভূতের মধ্যে আকাশের প্রধান গুণ কেবল শব্দ—এই জন্য প্রথমে আকাশ উৎপন্ন হইল। ইহার পর বায়ুর উৎপত্তি হয়, কারণ তাহাতে শব্দ এবং স্পর্শগুণ আছে। বায়ুর পর অগ্নির উৎপত্তি হয়, কারণ শব্দ এবং স্পর্শের অতিরিক্ত তাহাতে তৃতীয়গুণ রূপও আছে। এই তিন গুণের উপরে জলে চতুর্থ গুণ রস আছে বলিয়া ইহার উৎপত্তি অগ্নির পরে হইয়াছে এবং অবশেষে উক্ত চারিগুণের উপরে পৃথিবীতে "গন্ধ" আছে বলিয়া জলের পর পৃথ্বীর উৎপত্তি হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে উক্ত ক্রম হইতে মূল পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইলে পর পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনস্পতি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল (তৈ ২।১)। এই সৃষ্টি পঞ্চ মহাভূতের মিশ্রণ হইতে হয় বলিয়া বেদান্তে ইহাকে "পঞ্চীকরণ" বলা হইয়াছে। পঞ্চীকরণ অর্থে পঞ্চ মহাভূত হইতে প্রত্যেকের ন্যূনাধিক ভাগ লইয়া সকলের মিশ্রণ দ্বারা নূতন পদার্থ প্রভৃতি। এইরূপে সাংখ্যের মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অথবা বেদান্তের পরব্রহ্ম হইতে অনেক নামরূপধারী সৃষ্টির অচেতন বা জড় পদার্থ উৎপন্ন হইল। সচেতন সৃষ্টির সম্বন্ধে সাংখ্যের মত ঐ যে যখন মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পৃথ্বী আদি মূল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত হয় তখন তাহা হইতে সজীব প্রাণীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

রমলা।

(সুবিখ্যাত ইংরেজ-লেখিকা জর্জ্জ ইলিয়ট বিরচিত "Romola'র মর্ম্মানুবাদ)

জাহাজ-ডুবো বিদেশী।

(১)

ফ্লরেন্স নগরের ঠিক মধ্যস্থলে যে পল্লীতে মহাকবি ডান্টে বাস করিতেন সেই পল্লীর একটি অট্টালিকার সানবাঁধান বারাণ্ডায় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল প্রাতঃকালে একজন লোক শুইয়াছিল। আর একজন

লোক দাঁড়াইয়া সেই শুইয়া-থাকা লোকটীর দিকে চাহিতেছিল। শুইয়া-থাকা লোকটি হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া চকিত দৃষ্টিতে অপর লোকটীর দিকে মুখ উঁচু করিয়া দেখিতেছিল। দণ্ডায়মান ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিল। তার মাথায় চুল পাকা, বক্ষ দেশ বিশাল। কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে তার কাঁধ হইতে একটা চামড়ার থলি নামাইল,—আর একটা বুড়ি তার কাঁধেই রহিল। সেই বুড়ির মধ্যে পুরাতন কাপড় চোপড় আর ভাঙ্গা লোহা, পিতল, কাচ প্রভৃতি নানা রকম জিনিষ ছিল।

এই ব্যক্তি শুইয়া থাকা লোকটীর হাতের আঙ্গুলের একটী আংটী দেখাইয়া বলিল, "ওহে ছোকরা, তোমার গোঁপ দাড়ী আর একটু বেশী গজালে তুমি অমন দামী আংটী হাতে দিয়ে এমন খোলা জায়গায় শুয়ে থাকা যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারতে। ভাগ্যে আমি তোমাকে প্রথম দেখলাম, সৈলে আর কেও হলে —বুঝলে কিনা? কিন্তু ব্রাটী ফিরা-তিচি চুরি করবার পাত্র নয়। বেড়াল যেমন ন্যাজ ইঁদুর না ধরলে তা খেতে চায় না, তেমনি ব্রাটীও বিনা দামে কোন জিনিষ নেয় না। এই তিন বৎসর হল একদিন একটা কাণা মড়া আমার সামনে পড়ল। তার একটা ভাল টুপী ছিল। দাম না দিয়ে তা নিই কেমন করে বল? তখন মাথায় এক কিস্তির গজাল। ভাবলাম যে, লোকটার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আমি করি। তার টুপিটা নিলে দোষ ধরে না। শেষে তাই হ'ল। সে যাই হ'ক, কিন্তু তোমার এই অল্প বয়স, এই সুন্দর চেহারা, তুমি এই খোলা জায়গায় ঘুমুতে এলে কেন?"

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি এতক্ষণ ব্রাটীর এসব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, কেবল মাত্র ব্রাটী যে তার আংটীর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছিল তাহাই সে যা কিছু বুঝিয়াছিল। বুঝিবা মাত্র সে তার আঙ্গুল হইতে আংটীটি খুলিয়া জামার পকেটে রাখিল এবং দাঁড়াইয়া হাত পা ঝাড়াইতে লাগিল। ব্রাটী একটু ভাবিয়া সেই যুবককে বলিল, "বাপু হে, তোমার এই ছেঁড়া আর ময়লা পোষাকের সঙ্গে তোমার ওই দামী আংটীটি মোটেই খাপ খাচ্ছে না। যে কেউ বলতে পারে যে তুমি কোন মড়ার আঙ্গুল হ'তে ওটী খুলে নিয়েছ,—যদি তাই হয়, তাহ'লে আমি আশা করি যে সে মৃত দেহের সৎকার করেছ। তাহ'লেই ওটা তোমার কেনা হয়েছে বলতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া যেন মুহূর্ত্তমাত্র যুবকের শরীর কোন অজ্ঞাত ভয়ে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্রাটীর দিকে ভ্রূকুটী করিয়া চাহিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে সামলাইয়া লইয়া যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাব দেখাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাপু, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমার পোষাক ঠিক পুরানো পাপের মত দেখাচ্ছে। তা ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম হয়েছে কিনা। এটাকে সমুদ্রের জল বাতাস আর বৃষ্টির জল খেতে হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, আমি সুরেন্দে নবাগত। তাই অনেক রাত্রে অনেক কষ্টে যখন এখানে এলাম তখন মনে হল যে অত রাত্রে কোন অজানা হোটেল মোটেলে গিয়ে কোন শুওার খপ্পড়ে পড়ে প্রাণটি হারাণোর চেয়ে এই বারান্দার এক কোণে শুয়ে রাতটুকু কাটিয়া দেওয়াই ভাল।

ব্রাটী বলিল, "তুমি যে বিদেশী তা বাপু তোমার কথাতেই ধরা পড়ছে। তুমি জেনোয়া থেকে আসছ বলে ত মনে হয় না। তোমার পোষাকের ধরণ দেখে মনে হচ্ছে তুমি তিনিস থেকে আসছ। নবাগত ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "এখন আমি কোথা হ'তে আসছি সে কথা জানার চেয়ে কোথায় গেলে চারটি খেতে পাই, জানা বেশী দরকার হয়ে পড়েছে। তোমাদের সহরের এ পল্লীটা কেমন গোবরা-মুখো বলে মনে হচ্ছে। আমাকে এমন কোন পল্লী দেখিয়ে দিতে পার যেখানে একটু আমোদ আহ্লাদ আছে, অথচ সেখানে গেলে থাকবারও জায়গা মিলে, চারটি খেতেও পাওয়া যায়?

ব্রাটী বলিল, "তা আমি পারি। আমি যে ঘটনাক্রমে এই দিকে এসে পড়েছি এটা তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু তোমাকে সুবিধে মত কোন জায়গা দেখিয়ে দেওয়াতে আমার কি লাভ তাই ভাবি। বুঝলে বাপু, আমি বুঝি ফেল কড়ি, মাখ তেল। অমনি

মুখের কথায় কিছু হয় না। আমি যদি তোমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিই, তাহ'লে তুমি যখন তোমার পোষাক বদলে নূতন পোষাক পরবে তখন পুরানো পোষাকটী আমাকে দিবে প্রতিজ্ঞা কর।"

অপর ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করলাম। এখন বাজারের দিকে চল। এই পুরানো পোষাকটা শীঘ্র বদলে ফেলতে পারলে বাঁচি। ওটার ওপরে তোমার ভারি লোভ পড়েছে দেখছি।"

ব্রাটী বলিল,—"লোভ!—আরে না না।" এই কথা বলিয়া ব্রাটী তার চামড়ার থলেটী তুলিয়া ঘাড়ে ঝুলাইয়া বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—পুরানো লোহা, ভাঙ্গা কাচ, পুরানো পোষাক, ন্যাকড়া আ—আ নেবে গো! পুরানো লো—হা—হা—আ—আ—চাই, পু-পু—রা—গা—না লো—হা—হা—আ—আ, এই চীৎকার করতে করতে খানিক পথ গিয়া ব্রাটী আবার বকিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে পুরাতন বাজারে আসিয়া পড়িল। এখানে সকল রকম জিনিষ বিক্রয় হয়।

সেদিন প্রাতঃকালে কোন অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কারণ দোকানদারেরা তাদের পাট ফেলিয়া বাজারের স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া উত্তেজিত ভাবে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল। দুএকজন কথা কহিতেছিল আর অন্য লোকে হাঁ করিয়া যেন তা গিলিতেছিল। বিদেশীকে সঙ্গে লইয়া বাজারে প্রবেশ করতেই ব্রাটী দোকানদারদের এই অবস্থা দেখিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। সে বলিল, "আ সর্ব্বনাশ, বাজারের সব লোক ক্ষেপেছে নাকি? আবার পোপ মহাশয় আমাদের একঘরে করলেন নাকি? ব্যাপারটা কি জানতে হল। বাপু কোন চিন্তা নাই। যতক্ষণ না তোমার পেটে অন্ততঃ এক পেয়ালা দুধ না পড়ছে ততক্ষণ তোমার পলকে প্রলয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা, আমার সঙ্গ ছেড়ো না। প্রতিজ্ঞার কথা যেন মনে থাকে। তোমার পুরানো পোষাকটী আমাকে দিতে হবে।"

এমন সময় ব্রাটী একটী বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওগো বাছা, তুমি মাথা মুণ্ডু কি শুনছো, এদিকে তোমার সাগাটী যে তোমার সমস্ত তরকারী উলটে ফেলে দিলে। তোমরা সব ক্ষেপেছ নাকি?" বৃদ্ধা এই কথা শুনিবামাত্র ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে তার জিনিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন সে "মর মর, জাহান্নামে যা" বলিতে বলিতে যেখানে দাঁড়াইয়া গল্পগুজব শুনিতেছিল সেস্থান ত্যাগ করিয়া নিজের দোকানের কাছে আসিল। অমনি চট করিয়া তার সেই স্থান ব্রাটী অধিকার করিল এবং তার নিকটে থাকিবার জন্য তার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিল।

সেখানে অনেক কষ্টের পর ব্রাটী বুঝিল যে গত রাত্রে ক্লরেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রের (রিপাবলিকের) অধিনায়ক লোরেন্‌জোর মৃত্যু হইয়াছে। তাই নানা লোক নানা কথা কহিতেছে। কেহ লোরেনজোর প্রশংসা করিতেছে। কেহ তাঁর নিন্দা করিতেছে। যাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিতেছে তাহারা পরস্পর ঝগড়া করিতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক ছিল। তাদের সঙ্গে ব্রাটী নেলো নাপিতকে দেখিতে পাইল। খানিকক্ষণ হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া ভিড় করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সকলেই নিজের নিজের কাজ করিতে গেল। এই অবসরে ব্রাটী নেলো নাপিতের নিকট গিয়া বলিল, "ওহে তুমি যে খুব বক্তৃতা করতে পার, তা বোঝা গেল। আমি আজ এক বিদেশীকে পেয়েছি। সে কোথাকার লোক ঠিক হচ্ছে না।"

নেলো বলিল, "কৈ, তোমার বিদেশী কৈ?" ব্রাটী পিছনে ফিরিয়া বলিল, "ওই যা, পাখী তো উড়েছে! ঠিক ঠিক, সে বেচারির খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। আমি তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এই বাজারেই তাকে পাওয়া যাবে। যেখানে রুটী মাখন বিক্রি হচ্ছে সেই খানে গেলেই পাব। বাছাধন যাবেন কোথা?" নেলো নাপিত বলিল, "তাহ'লে চল, বাজারের চারিদিকে ঘুরে দেখি।" তখন তাহারা দুইজন বিদেশীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

(২)

প্রাতরাশ।

ব্রাটী দলে মিশিল। বিদেশীও সেই উত্তেজনার কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। সেজন্য তার

বিশেষ আগ্রহও ছিল না। ক্ষুধায় তার নাড়ি জ্বলিতেছিল। সে খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে বাজারে ঘুরিতে লাগিল। খাদ্যদ্রব্যের দোকানে কোন দোকানদারকে দেখিলেই তার কাছে খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া খাইবে, এই মনে করিয়া তাহার কোমর হইতে একটী ছোট বটুয়া বাহির করিয়া খুলিয়া হতাশ ভাবে বলিল, "ভাইত, একেবারে শূন্য দেখছি। মনে করেছিলাম, যৎসামান্য আছে। একটী পয়সাও যে নাই। তা'হলে মিষ্টি কথার বদলে প্রাতরাশ যোগাড় করতে হবে দেখছি।"

বিদেশী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিছুদূর যাইবার পূর্ব্বেই সে বাজারের এমন স্থানে আসিয়া পড়িল যেখানে সে যে মূল্যে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে চাহে তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য নাও হইতে পারে। বাজারের এক কোণে দুইটা অশ্বতর দাঁড়াইয়াছিল। তাদের একটার পিঠে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ দুগ্ধপাত্র, আর একটার পিঠে দুইটা ঝোলা, তাতে নানাপ্রকার শাক সবজি, ফল, মূল, রুটী, বিস্কুট প্রভৃতি। যে অশ্বতরটার পিঠের উপর দুগ্ধের পাত্র ছিল, তার গলায় ঠেস দিয়া এক তরুণী দাঁড়াইয়াছিল। এই তরুণীর মুখখানি অতি সুন্দর। তার বয়স ষোল বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু তার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তার বয়স অনেক কম। তার পর পোষাক পরিচ্ছদও তার চেয়ে অনেক কম বয়সের মেয়েদের মত। সেই সময় তার মাথায় একটা বড় রকমের লাল কাপড়ের টুপী ছিল বলিয়া তার মাথার চুল মোটেই দেখা যাইতেছিল না। বোধ হইতেছিল যে ঐরূপ অবস্থায় সে ঘুমাইতেছে। রাত শেষ না হইতেই বাজারে আসিবার জন্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াই বোধ হয় সে ঘুমাইতেছিল। কিন্তু বিদেশী তখন ক্ষুধার জ্বালায় এত অস্থির যে তরুণীকে জাগাইতে দ্বিধা বোধ করিল না। সে ধীরে ধীরে তরুণীকে চুম্বন করিয়া অতি মধুর স্বরে বলিল, "সুন্দরী, তোমাকে জাগানায় বলে ক্ষমা কর। ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যাচ্ছে। তোমার অশ্বতরের উপরে পাত্রে যে দুগ্ধ আছে তা যদি খানিক দাও তো বাঁচি।" সেই তরুণীর কাণে যখন এই কথাগুলি প্রবেশ করিল তখন সে মনে করিল বুঝি সে স্বপ্ন দেখিতেছে। সে চক্ষু মেলিয়া বিদেশীকে দেখিয়া চমকিত হইল। তখন বিদেশী পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ভাষায় তাহার প্রার্থনা জানাইল। তখন তরুণী এক বাটী খাঁটি দুগ্ধ আনিয়া বিদেশীকে পান করিতে দিল। বিদেশী কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি তরুণীর হাত হইতে পাত্র লইয়া আগ্রহের সহিত দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। এই সময় তরুণী সাহস করিয়া বিদেশীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিল যে, "যদিও এই যুবক খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিল এবং ইহার পোষাকও ময়লা আর ছেঁড়া, তথাপি ইহাকে সাধারণ ভিক্ষুকদের মত মনে হয় না।" এই সময় তরুণীর মনে আর কি ভাবের উদয় হইল বলা যায় না। কিন্তু সে কিছু না বলিয়া একখানি রুটী ঝোলা হইতে বাহির করিল। বিদেশী দুগ্ধ পান শেষ করিয়া পাত্র নামাইয়া মাত্র তরুণী রুটীখানি বিদেশীকে দিবার জন্য হাত বাড়াইল। বিদেশী বলিল, "ওটা বোধ হয় তোমার নিজের খাবার জন্য রয়েছে। আমি বিনা পয়সায় যথেষ্ট পেয়েছি। তুমি বড় ভাল, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি।"

তরুণী একথার কোন প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু রুটীখানি বিদেশীর আরও নিকটে আগাইয়া দিল। যেন বিদেশী রুটীখানা না খাওয়াতে তরুণী বিরক্ত হইয়াছে। বিদেশী যখন তরুণীর শিশুর ন্যায় সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইতেছিল, সেই সময় তরুণী সাহসে ভর করিয়া ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং বিদেশীর সহিত তার দৃষ্টিবিনিময় হইল।

বিদেশী বলিল, "তাহ'লে আমি রুটীখানা নিলাম। আমি আর একটু সাহসী হব। এই রুটীটাকে আরও মিষ্টি করবার জন্য তোমাকে আর একবার চুম্বন করিতে চাই।" বিদেশী ভিন্ন ভাষায় কথা কহিলেও তরুণী তা যেন বুঝিতে পারিল এবং লজ্জায় লাল হইয়া তার মুখ হইতে অবগুণ্ঠন সরাইল। বিদেশী তরুণীকে চুম্বন করিবার জন্য যেমন তার দিকে অগ্রসর হইল অমনি অতি নিকটে কোন ব্যক্তির কর্কশ স্বর শুনিয়া পিছাইয়া পড়িল।

"কেরে হতভাগা, নিশ্চয়ই চোর কিম্বা জোচ্চোর। কখনই তুই ভাল লোক নস্। যা, যা, এখান থেকে দূর হ। নৈলে এখনি মজা দেখাব।" বিদেশী যুবক একটু সরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ঐ কথাগুলি একটী মোটাসোটা প্রৌঢ়া বলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বিদেশী যুবকের কোন ভয় বা সংকোচ ত হইলই না, বরং প্রৌঢ়ার পরিচ্ছদের ভঙ্গি দেখিয়া তাহার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল।

প্রৌঢ়ার নাম মোনাষিটা। সে বিদেশী যুবকের হাসিতে ভুলিবার পাত্রী নয়। সে রাগিয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বাঁদরের মত খুব দাঁত বার করতে পারিস। বদ্‌মাইস কোথাকার। তিসা, তুই কি কচ্ছিলি বল, তোর রুটী আর দুধ বিলিয়ে দিচ্ছিলি মনে হচ্ছে। তোর ঘটে একটুকুও বুদ্ধি নেই। ওঠ, জিনিষ পত্তর সব গুছিয়ে নে। নৈলে এখনি মজা দেখ্‌বি।"

তখন বিদেশী যুবক মৃদু হাস্য করিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "না মাতা, একজন ক্ষুধার্ত পথিকের উপরে দয়া করেছে বলে তোমার তিসার উপর রাগ করোনা। আমার থলি একবারে শূন্য। রাগলে তোমাকে যখন এত সুন্দরী দেখাচ্ছে হাসলে না জানি তোমাকে কত বেশী সুন্দর দেখাবে।" মোনাষিটা বলিল, "ওরে যা, যা, তুই যে কি দরের লোক তা বুঝেছি। তোর ও কথায় আমি ভুলি না। শীঘ্র পালা তো পালা, নৈলে তোর মুখে এমন ব্রাগ করে দিব যে—এই কথা বলিয়া মোনাষিটা বিদেশী যুবককে আঁচড়াইবার উপক্রম করিল। ইহার দুএক মিনিট পূর্ব্বে নেলো নাপিতকে সঙ্গে করিয়া ব্রাচী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাচী তখন নেলোকে বলিতেছিল, "নেলো, বল দেখি, বিদেশীর কথা শুনে তাকে জিনিসের লোক বলে মনে হয় কিনা?" নেলো বলিল, "না ব্রাচী, তোমার কথা ঠিক নয়। বিদেশী যুবকটী যদি গ্রীক না হয় ত আমার নাম নেলো নাপিত নয়। ওগো মোনাষিটা, বলি হল কি? এত গাল ঝাড়ছ কেন? এই ছোকরা কি কোন অন্যায় ব্যবহার করেছে?"

ব্রাচী বলিল, "বাঁচা গিয়াছে। সে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসে যদি কোন দুষ্কর্ম করে থাকে ত আমি তার জন্য দায়ী নই। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি যে আমি যখন তাকে বারাণ্ডায় শুয়ে থাকতে দেখি তখন তার হাতে যে আংটী দেখছি তেমন আংটী বার্ণার্ডো রুসিলায়ের হাতেই দেখতে পাই। এই সময়ে নেলো নাপিত, খোসমেজাজে বিদেশী যুবককে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "আমার মনে হচ্ছে যে এই যুবক মোনাষিটার সৌন্দর্য্যের একটু বেশী রকম প্রশংসা করেছে, কি বলেন মহাশয়?"

বিদেশী যুবক হাসিয়া, বলিল, "আপনি দৈবজ্ঞের মত আমার অপরাধ যে কি তা বলে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে প্রথমে মোনাষিটার দেখা হয় নাই। আমি মোনাষিটার কন্যা তিসার কাছে প্রথমে খানিকটা দুধ ভিক্ষা করে নিই, তার পর সে আমাকে একখানা রুটি অমনি দেয়। সে জন্য আমি তিসার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সৌন্দর্য্যের সারভূত এই রমণীর আবির্ভাব হ'ল। এর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে যাওয়া আমার দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল সন্দেহ নাই।" মোনাষিটা নেলোকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "যা যা, তোরা সব এখান থেকে পালা। নরকে গিয়ে পচে মরগে যা। এই তিসা! বেকুব মেয়ে, একটু এদিকে সর, নৈলে ওই গাড়ীটা যে আমাদের ওপোর এসে পড়বে। এই কথা শুনিয়া তিসা অশ্বতরটার লাগাম ধরিয়া টানিল এবং সভয়ে বিদেশীর দিকে একবার চাহিল। বিদেশী যুবক তখন নেলোর সঙ্গে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে ব্রাচী বিদেশী যুবকে বলিল, "আমি তোমাকে নেলোর জিম্মা করে দিলাম। আমার এখন বাড়ীতে কাজ আছে। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে তা যেন মনে থাকে, আমার সাহায্য না নিয়েও তুমি তিসার দেখা পেলে তাতে আমার কোন দোষ নাই। নেলো ফেরাঙ্গিচিতে আমার দোকান তোমাকে দেখিয়ে দেবে। আমি তোমাকে ভুলব না।" বিদেশী যুবক

ব্রাহ্মীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া নেলোর সহিত প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভট্ট।

আমার স্বামীর স্মৃতিকথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সে যাক্, তাঁহারা যেদিন চলিয়া গেলেন সেইদিন সন্ধ্যাকালে প্রায় ৬॥ টার সময় কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া আমার স্বামী আমাকে ছাদের উপর ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পিতা কি চলে গিয়েছেন?" আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু, আমি কে, আমার নাম কি, এই সব তুই কি জানতে পেরেছিস্?" আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "হ্যাঁ।" "আচ্ছা বল দিকি আমার নাম কি?" তখন, লোকেরা যে নামে তাঁকে ডাকে সেই সমস্ত নামটা বল্লেম। (যাই হোক না কেন, তখন লজ্জা কি তা বুঝতেম না) কিন্তু তাহা শুনিয়া মনে হল যেন তিনি একটু সন্তুষ্ট হলেন, এটা আমার খুব মনে আছে। তার পর, আমার বাপের বাড়ীর সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমিও, যা আমার জানা ছিল সমস্ত বলিলাম। লেখাপড়ার কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না। তাই তিনি সেই রাত্রেই এক শ্লেট ও পেন্সিল আনাইয়া "শ্রীগণেশায় নমঃ"—এই পদের প্রথম ৭ অক্ষর এই পাঠ অভ্যাস করিতে দিলেন। তখনো শ্লেটের ১১ অক্ষর আমার পরিচয় না হওয়ায়, ঐ ৭ অক্ষর না দেখিয়া লিখিতে ও চিনিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। তখনো অক্ষর-পরিচয় পাকা হয় নাই। দ্বিতীয় দিন হইতে প্রতিদিন রাত্রে দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমার শিক্ষার জন্য একটা পাঠ-ক্রম স্থির করিলেন এবং মূল অক্ষরগুলি ও অক্ষরের ১২ বর্ণ প্রভৃতি শিখাইয়া প্রায় ১৫ দিনের দিন, আমাকে দিয়া প্রথম পুস্তকের প্রথম-পাঠ পাঠ করাইলেন। সেইদিন মনে হইল যেন তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এইখানে, যে সব কথা সম্বন্ধে আমার মনে পড়িতেছে তাহা বলিতেছি—

আমার বাপের বাড়ীর লোকেদের অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃত মারাঠী চাল-চলন সেই সব আয়ঙ্গীরদারদিগের বংশে, পিতৃগৃহবাসিনী সাত বৎসরের বেশী বয়সের মেয়েরা, গুরুজনদের সম্মুখে ঘরের দাওয়াতেই আসিতে পারে না, তো খেলা কিম্বা গান করা আর কি করিয়া হইবে? লিখিবার ত নামই নাই। আমার এক বড় পিসী, যাঁহার শ্বশুরালয় ব্রহ্মাবর্ত্তে ছিল, তিনি কেবল বেহটেশ স্তোত্র প্রভৃতি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈধব্য ঘটিবার পর হইতে আমাদের বড় খুড়ী স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখা 'সয় না'—বস্। এরূপ শুনিবার পর, লিখিবার কথা শুধু মনে আনিলেও পাপ, হইবে কি কি-হইবে এইরূপ বাড়ীর সব মেয়েদের আশঙ্কা হইতে কি আর বিলম্ব হয়? এই অনুপম্বরে, সব মেয়েদেরই এইরূপ ধারণা হওয়ায়, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকাই স্বাভাবিক। আমার দুই ভগিনীরই বিবাহ ৫ ও ৭ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। কেবল আমার বিবাহই ১১ বৎসরে হইয়াছিল। আমার ভগিনী শ্বশুর-বাড়ী যাইবার পর, আমার খেলিবার সাথী কেহ ছিল না। আমার যে মিত্রাণী ছিল, সে রোজ আসিত না। কারণ আমার পিতার স্বভাবটী বড় কড়া ছিল। তাঁহার মেয়েরা কোথাও গিয়া খেলা করে, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরের মেয়েরাও আসিয়া যে চেঁচামেচি করিবে, টানাটানি করিবে, হৈ-হৈ করিবে, ইহাও তাঁহার ভাল লাগিত না। এইজন্য পিতা ধানের গোলা প্রভৃতি স্থানে গেলেও সেইদিন সেখানে সকলকেই যাইতে হইত। এই কারণে একদিন শরীর খারাপ ছিল বলিয়া, —আমার বড় ভাই বাড়ী ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গ ধরিলাম এবং তাঁহাকে গল্প প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল হইল; এবং কি করিয়া তিনি এই

সব পড়িতে পারেন মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সরকারী কাজে ও ঘোরো মোকদ্দমা মামলার জন্য আমার পিতাকে প্রায়ই মফস্বলে যাইতে হইত। তিনি চলিয়া গেলে তাঁর পত্রাদি পরিতাম। আমার ভাই সেই সকল পত্র মাকে পড়িয়া শুনাতেন। কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য করিতাম না। একদিন আমার পিতা মফস্বলে যাত্রা করিবার পর, আমার ভাই বাড়ীর উঠানে একলা আছেন দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট গেলাম। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কোন ছেলেপিলেই তাঁহার নিকট কখনও যাইত না। কারণ, আমার জন্মাবার পূর্ব্বে এক বৎসর আমার ঠাকুর মা (আজী) জীবিত ছিলেন। তাই তিনি জীবিত থাকিতে কোন ছেলেপিলের সঙ্গে আমার ভাই কথা কহেন নাই। তবে ছেলেপিলের তত্ত্বাবধান করিলেন কি করিয়া? ঠাকুরমার মৃত্যুর পর আমার জন্ম হয়। সেইজন্য পরে, আমাকে খাওয়াবার ও ঘুম পাড়াইবার ভার আমার ভাইকে লইতে হইত, আদর যত্ন করিতে হইত। তিনি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এসে? তোমার কিছু চাই?" আমি বলিলাম,—"তুমি যখন পুণায় যাবে, আমার জন্য পুঁতির পুতুল ও একটা শাড়ী এনো। ভুলো না—এনো।" এ কথা বলিয়াই আমি ছুটিয়া পলাইলাম। তিনি পুতুল আনিবার আগে একথা কাহাকেও জানাইবেন না, এইরূপ আমি মনে করিয়াছিলাম। তদনুসারে কেহ শুনে নাই এইরূপ আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরে দুপুর বেলায় আন্না সাহেব পুণায় গেলেন। "তাকে কি কি জিনিষ তুই আনতে বলিছিস রে" আমার পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কোন কিছু জিনিষ?—কোন কিছু জিনিষ?" কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। খেলিতে চলিয়া গেলাম। পরে ৭।৮ দিনের মধ্যে পুণা হইতে তাঁর পত্র আসিল। এই পত্রের শেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ লিখিয়া—"তোর শাড়ী ও পুতুল নিশ্চয়ই আনিব। ভুলিব না।" এইরূপ লিখিত হওয়ায়, তাহা পাঠ করিয়া "দাজী (?) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে চোট্টী পরশুদিন, পিসিমা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুই পালিয়ে গেলি; কিন্তু তুই আন্না সাহেবকে যে জিনিষ আন্‌বার জন্য বলেছিলি, তা আমি জানি।" আমি বলিলাম,—"জান্‌তে আর হয় না, তুই কি দেবতা? কেবল আমার গণপতিই (আমি রোজ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতাম) জানেন। কিন্তু তিনি ত আমার। ঐটী তিনি কাহাকেও বল্‌বেন না।" সে খুব জোরের সহিত বলিল, "আরে যা। তোর গণপতি কি জানে। আমি জানি, তুই পুঁতির পুতুল ও শাড়ী আন্‌তে বলেছিস ত?" এই কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সে কি করিয়া জানিতে পারিল, ইহা আমার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। একটু পরেই সে নিজ অভ্যস্ত কামরায় চলিয়া গেল দেখিয়া আমি সেখানে গেলাম এবং খুব কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলাম,—"দাজী, এ তুই কি করে' জান্‌লি আমাকে বল্।" সে বলিল,—"ওরে, তাঁর যে পত্র আজ এসেছে তাতেই ওকথা লেখা আছে।" আমি এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—"পত্র এসে থাক্‌বে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি তুই কি করে' জান্‌লি?" সে বলিল—"ওরে, তিনিই লিখেছেন।" আমি বলিলাম—"তিনি লিখে থাক্‌বেন, কিন্তু তুই কি করে টের পেলি?" আমার জিজ্ঞাসার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে নাই; সেইজন্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তবু আমার জেদ্ আমি ছাড়িলাম না। তখন সে আরো বিরক্ত হইয়া আমাকে এমন এক থাপ্পড় দিল যে, সেই দিন হইতে আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইলাম না। ছেলেমানুষ বলিয়া আমি শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম। এখন একটু পড়িতে পারি; এবং তৃতীয় পাঠ্য পুস্তকের ছোট গল্প পড়িয়া তাহার পূর্ব্ব দিবসের গল্প আমার মনে পড়িল ও খুব আনন্দ হইল। যেন অনেক দিনের রুদ্ধ উদ্‌ঘাটিত হইল এইরূপ মনে হইল। সে কথা যাক্।

কিন্তু পরে পুস্তকের ইয়ত্তা (standard) অনুসারে পদ্ধতি ক্রমে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল। ব্যাকরণ, গণিত, মোড়ী অক্ষর ও দেবনাগরী অক্ষর লেখা, পড়া—এইরূপ সুরু হইল। আমার স্বামী রোজ রাত্রে নিয়মিত

দুই ঘণ্টা সময় দিতে পারিবেন না বলিয়া এই শিক্ষা দিবা-ভাগে দিবার জন্য, পরে দুই তিন মাস, "ফিমেল ট্রেনিং কালেজ" হইতে এক শিক্ষয়িত্রী (মাষ্টারণী) রাখা হইল। ঐ পর্য্যন্ত শিক্ষার আনন্দ। সেই মাষ্টারণীকে ভয় করবে কে? তিনি আসিলে পর শ্লেট ও পুস্তকাদি খুঁজিতেই অর্দ্ধঘণ্টা কাটিত। মাষ্টারণী অল্পবয়স্কা। তিনি কি করিয়া আমায় শাসনে রাখিবেন? তাঁকে স্কুলের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতাম। একবার বলিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেন। প্রায়ই "আগে পড়, তারপর গল্প করব" এইরূপ স্পষ্ট বলিবার পর তবে আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম। দুই এক পৃষ্ঠা হইতে না হইতেই ঘণ্টা পূর্ণ হইবামাত্র তিনি চলিয়া যাইতেন। শিক্ষা হইয়া গেল। মাষ্টারণীর আসা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিনে, শ্লেট পেন্‌সীল পুস্তকের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইত না। এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে তিন মাসের ছুটী লইয়া আমার স্বামী এলাহাবাদ, কাশী কলিকাতা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ দেখিবার জন্য, নারায়ণ-মহাদেব পরমানন্দ, রাঃ বালমুকুন্দ ওয়াগ্রে ও রাঃ শঙ্কর-পাণ্ডুরং পণ্ডিত ও আরো কয়েকজন বন্ধুর সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি পুণাতেই ছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে পর, একদিন আমার স্বামী আমার পাঠাভ্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পড়া শুনিলেন। কিন্তু এ কি! আমীর স্বামী পূর্ব্বে যতটা শিখাইয়াছিলেন তাহাই আছে—তাহার বেশী কিছু হয় নাই। ইহা দেখিয়া তার পরদিন মাষ্টারণীকে বলিলেন—"আমি এর শিক্ষার ভার তোমার উপর দিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দেখছি উচিত মত পরিশ্রম করনি।" এইকথা বলিবামাত্র সে রাগিয়া বলিল, "মেয়েটা বড় বোকা, খেলা-ভক্ত, যা বলি তা বোঝে না, কত যেনহৎ করেছি, কিন্তু ওদিকে ওর মন নেই। ওর সব মনটা খেলাতেই পড়ে আছে। খেলার দিকে যার ঝোঁক, তার শিখতে মন লাগবে কি করে? আপনি নিজে শিখালে বুঝতে পারবেন। এর যদি কখন লেখা পড়া হয় তো আমি আমার নাম বদ্‌লে ফেলব। আমি কাল থেকে আর আসছি নে।" এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আমার স্বামী কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, এক পুস্তক হস্তে লইয়া, শান্তভাবে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এই সর্ব্ব প্রথম আমার মন খারাপ হইল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু পাছে কেহ দেখে, এই মনে করিয়া চট্ করিয়া চোক মুছিয়া নীচে চলিয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমার মনে হয় আমার চঞ্চলতা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই "ফিমেল ট্রেনিং কালেজের" সগুণা বাঈদেব নামক এক মাষ্টারণী বাড়ীতে পড়াইবার জন্য রাখা হইল। ইনি শান্তস্বভাব ও সুশীলা ছিলেন। তাঁহার নিকট ১৮৭৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা এম ইংরাজী পর্য্যন্ত ভাল রকম হইয়াছিল।

১৮৭৫ অব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যে বাবা ভাউজীর (ছোট ভাই) পৈতা হইল। এই বৎসর বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা বিবাহ করেন এবং তিনি মহাবলেশ্বরে যাইবার জন্য পুণায় আসিয়াছিলেন। কাছারীতে খুব গোলযোগ হওয়ায়, আমার স্বামী রাত্রিতেই ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুপুর বেলায় আহারের সময় আমার স্বামী আমার ননদকে বলিলেন,—"আজ রাত্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত ও কতকগুলি লোককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছি। মনে থাকে যেন।" সে দিন কাছারী ছিল বলিয়া আমার স্বামীর ও আমার শ্বশুর মহাশয়ের দুপুর বেলায় খাওয়া এক সঙ্গে হয় নাই। কারণ, শ্বশুর মহাশয় ১১ টার পরেই স্নান করিতে উঠিতেন। সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ, জপ, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি শেষ হইতে সহজেই ১২টা বাজিত। সেই জন্য, ১॥ টার সময় আমার স্বামী ও ছেলেদের পাত পড়িত। এই সময়ে শ্বশুর মহাশয়, শাশুড়ী ঠাকরুণ প্রভৃতি সগুণা; বাবা-ভাউজীর পৈতা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তখনো তাঁহারা পুণায় ছিলেন। আমার ননদের নিকট আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, যখন দ্বিতীয় পংক্তি বসিবে তখন সহজভাবে যেন শ্বশুর মহাশয়কে খবর দেওয়া হয়, আজ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিতকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শ্বশুর মহাশয় রাগিয়া গেলেন। কিন্তু এ সময় তিনি কিছু বলিলেন না। ৪॥টা বাজিলে, দেবালয়ে যাইবার সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ ইঙ্গিত

দিয়া বলিলেন, "আজ তুমি পংক্তিতে পরিবেশন করতে যেও না। ঐ মেয়েটাই পরিবেশন করবে, তুমি খেয়ে নেও।" (আমাদের বাড়ী, ব্রাহ্মণ কিংবা মেয়েদের কাহারও পরিবেশন করা ভাল দেখায় না বলিয়া, আমাদের বাড়ীতে, কেবল মেয়েদের দুইবার পরিবেশন করিবার রীতি ছিল।) আমার যেতে যেতে রাত হবে, তুমি খেয়ে নেও। আমার জন্ত অপেক্ষা কোরো না।" এই কথা বলিয়া তিনি সন্ধ্যা হইতে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁরা ১১টা পর্য্যন্ত বাড়ী আসিলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত মণ্ডলী আহারান্তে ইতস্ততঃ চলিয়া গেলেন। শ্বশুর মহাশয় ১১ টার সময় বাড়ী আসিলেন এবং বালভট্টীকে ডাক দিয়া বলিলেন, "কালই আমাদের কোলহাপুরে যেতে হবে। খুব ভোরে উঠে গাড়ী ঠিক করে নিয়ে আসবে"; এই কথা বলিয়া আহার কিংবা অন্ত কোন বাক্যালাপ না করিয়াই শুইতে গেলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্বামী আমার মুখেই অবগত হইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের স্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায়, তাঁহার কোল্হাপুরে যাইবার সংকল্পটা আমার স্বামীর বড় খারাপ লাগিল এবং নিজের বিশেষ হেতু না থাকিলেও ছোট খাট কথা লইয়া এত ক্লেশ হইবে এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার স্বামীর মনে শান্তি আসিল না। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় বারান্দায় বসিয়াছিলেন; আমার স্বামী তথায় গিয়া ভক্তের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্বশুর মহাশয় দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্য নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া কোন কথাই বলিলেন না। আমরা ঘরের লোকেরা শুধু ঠাকুর ঘরের আলি দিয়া দরজার আড়াল হইতে সম্মুখে কি হইতেছে দেখিবার জন্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কারণ, শ্বশুর মহাশয়ের কোল্হাপুরে যাত্রার সংকল্প শুনিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ঐরূপেই কাটিয়া গেল। এই দুজনের মধ্যে কেহ কাহারো সহিত কথা কহিলেন না ও মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্য্যন্ত হইল না; কারণ প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আগে কথা কহিবেন। কিন্তু শেষে শ্বশুর মহাশয় উপর দিকে তাকাইয়া নাম ধরিয়া আমার স্বামীকে নীচে বসিতে বলিলেন। তিনি "মাধব রাও" এই পাঁচ অক্ষর যুক্ত নাম ধরিয়াই সর্ব্বদা আমার স্বামীকে ডাকিতেন। অনেক ক্ষণের পর আবার আমার স্বামীকে বসিতে বলিলেন। তখন আমার স্বামী এই উত্তর দিলেন যে, "আপনি কোল্হাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত করিলেন এই কথা আমাকে বল্লে তবে আমি বসব। আপনারা সবাই যদি কোল্হাপুরে যান, তবে—আমার এখানে কি আছে—আমিও আপনার সঙ্গে যাব, কাল্‌কের কথায় আপনার এত রাগ হবে, আমি মনে করি নি। এ রকম হবে জানলে আমি কোন যোগাযোগ করতেম না," ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার ও শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না। ৯টা বাজিয়া গেল, তখনও আমার স্বামীর প্রাতঃকৃত্য পর্য্যন্ত হয় নাই ও সে দিন কাছারীর ছুটিও ছিল না। কিন্তু বালভট্টী সম্মুখে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে বলিলেন যে, "আপনার কথা মত গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি গাড়ী আসবে।" ইহা শুনিয়াও এতক্ষণ ধরিয়া মিনতি করা সত্ত্বেও শ্বশুর মহাশয় কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমার স্বামীর বড়ই খারাপ লাগিল এবং বালভট্টীর দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "দেখে যাওয়াই বুঝি স্থির হল! আমাকে এখানে রেখে সকলেই চলে যাবে! যে দিন আমার মা যারা যান সেই দিনই আমি অনাথ হয়েছি।" এই কথা বলিয়া সেখানে আর দাঁড়াইয়া রহিলেন না। একেবারে উপর তলায় চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরে, বালভট্টীকে উপরে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনি যদি কোল্হাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত না করেন তবে আমিও কালে ইস্তফা দিয়া রাজিনামা লিখে দেব।" এই কথা বালভট্টী শ্বশুর মহাশয়কে বলার পূর্ব্বেই আমার স্বামী দোতালায় চলিয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের মন খারাপ হইয়াছিল। বালভট্টীর নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই খারাপ লাগিল এবং একেবারেই বলিলেন যে—"কোল্হাপুরে যাচ্ছিনে, সে সঙ্কল্প রহিত করেছি। এখন আমি তবে

স্নান করতে উঠছি, কোর্টের সময় হয়েছে, উপরে গিয়ে তাঁকে বলো।" এই কথা শুনিয়া, আমার স্বামীর মনে এতক্ষণ যে একটা ভার চাপিয়াছিল, এখন একটু কমিয়া গিয়া আবার মন চাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং তাঁহার নিত্য নিয়মিত কাজ আরম্ভ করিলেন। আমার স্বামী আর কখন ঐ রকম অবস্থা ঘটিতে দেন নাই। এই বৎসরেই, যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন সেই বাড়ীটা আমার স্বামী খরিদ করিবার পর (১৮৭৪) জুন মাসে শ্বশুর মহাশয়ের, ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া কোল্হাপুরে গেলেন। পুণায় বাড়ী খরিদ করা হইয়াছে বলিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইল। কারণ সমস্ত কাজকর্ম্মের দরুণ তখন ২৫০৲ টাকা পাইলেও খর্চে-স্বভাব হওয়ায়, তিনি তাঁহার সম্বলের অতিরিক্ত এত খরচ করিয়াছিলেন যে কয়েক হাজার টাকা তাঁর ধার হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা হওয়ায়, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে স্থাবর সম্পত্তি আদৌ খরিদ করা হয় নাই। শ্বশুর মহাশয়ের যে ধার হইয়াছিল তাহা কোন প্রকার সুখভোগ বা আয়েষের দরুণ নহে। তাঁহার স্বভাব নিতান্ত উদার ও দয়ালু হওয়ায় এবং তাঁহার তিন সহোদর ভাই ও তাহাদের খুড়তুতো ভায়ের পরিবারের বিবাহ, উপবীত ও শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়ায় এই ধার হইয়াছিল।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও খরচের টানাটানি হইলে তাহারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া মিনতি করিত ও সেই সময়ে শ্বশুর মহাশয়ের হাতে পয়সা না থাকিলেও তাহারা কর্জ্জ করিয়া তাহাদের মনস্ক মিটাইত, কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিত না। তাঁহার এই উদারতার দরুণ তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার পুণ্যে, তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় আমার স্বামী সমস্ত কর্জ্জ শোধ করিয়াছিলেন ও পুত্রধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয় পেন্সন লইলে পর, সেই পেন্সনের টাকায় খরচ কুলাইত না বলিয়া আমার স্বামী পুণা হইতে ১৫০৲ টাকা প্রতি মাসে খরচের জন্য পাঠাইতেন। আজ পর্য্যন্ত যাহা করা হয় নাই তাহা আজ পুত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইল। তাই, পুণা ও কোল্হাপুরের দুই সংসারের খরচ চালাইয়া ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ না লইয়া আজ পরমেশ্বরের কৃপায় স্থাবর সম্পত্তি হইতে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ হওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের খুব আনন্দ হইল, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রয়পত্রের লেখা পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় সুসংবিদা প্রস্তুত করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। আমার স্বামী তাহা হাতে লইয়া, পড়িয়া দেখিয়া পেন্সিলে তাহার উপর এই কথা লিখিলেন যে, "আমার নাম লেখা হইয়াছে, সেই জায়গায় আপনার নাম থাকে এই আমার ইচ্ছা। এতে আর কিছু বদল করবার মত নেই।" এই কাগজ বাড়ীর নীচের তলায় আসিলে পর, শ্বশুর মহাশয় পড়িয়া দেখিলেন ও 'গম্' হইয়া বসিলেন। আগামী কল্য কবলাপত্র রেজিষ্ট্রী করাইব, সমাগত রেজিষ্ট্রারকে এই কথা বলিয়া তিনি আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর, শ্বশুর মহাশয় ছাদের উপরে যাইয়া আমার স্বামীকে নিরালা ডাকাইয়া বলিলেন যে "আমাদের এত বড় বংশে আজ পর্য্যন্ত কখনও কাটাকাটি কিংবা ভাগাভাগি হয় নি। তার কারণ, বংশের সকলেই সুচিন্তিত ছিলেনই, তা-ছাড়া আমাদের বংশে কেহ হাতে স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেন নি। এখন জগদম্বার কৃপায় আমাদের বাড়ী খরিদ করবার সুযোগ এসেছে, ঐ বাড়ীর কোবলা আমার নামে না করে তোমার নামেই হবে। কারণ এই ছেলের সম্বন্ধ একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় কোবালা তোমার নামেই হবে, তাহলে কোন গোলযোগ থাকিবে না।" এই সমস্ত শুনিয়া লইয়া আমার স্বামী বলিলেন যে, "আমি এরই দিক দিয়া সমস্ত বিচার করেছি। এই প্রথম স্থাবর সম্পত্তির কোবালা আপনার নামে হওয়াই আমি বেশ শোভন মনে করি ও তাহলে মনেও শান্তি পাই। অতএব আপনি 'না' বলবেন না।" এইরূপ বলা হইলে পর, শ্বশুর মহাশয় নীচে চলিয়া গেলেন। এবং তার পর দিন আমার স্বামীর ইচ্ছানুসারে শ্বশুর মহাশয় ঐ বাড়ীর কোবালা করিয়া লইলেন। (ক্রমশঃ)

ভারত মহিলা

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। (মনু)
The woman's cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free :
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ? (TENNYSON.)

বঙ্গানুবাদ :—স্ত্রী-পুরুষের উন্নতি অবনতি একসূত্রে গ্রথিত। নারী অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে পুরুষ কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। (টেনিসন)

"I will be as harsh as truth, and as uncompromising as Justice ; I am in earnest—I will not excuse, I will not retreat a single inch——and I will be heard."(WILLIAM LLOYD GARRISON.)

মর্ম্মানুবাদ :—আমি সত্যের ন্যায় কঠোর ও ন্যায়ের মত অনমনীয় হইব। আমি দৃঢ়সংকল্প, আমি কিছুতেই এক তিলও পশ্চাৎপদ হইব না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। (গ্যারিসন)

১৩শ ভাগ { অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। { ৮ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোম্বাই সেবাসদন।

স্বর্গীয় মহাত্মা মালবারীর চেষ্টায় বোম্বাইএর শিক্ষিতা মহিলাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের জন্য নয় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা হয়। আমরা তখন সাদরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে অভিনন্দন করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বৎসরের পর বৎসর এই সমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসর এই সমিতি ৫০টী দরিদ্র বিধবাকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৬০টি মধ্যবিত্ত মহিলাকে পাঠশালার শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা দিয়াছেন। ১৫০০ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার চিকিৎসা করিয়াছেন। ১০০ প্রসূতির শুশ্রূষা করিয়া তাহাদের পথ্যাদি দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য দুইটি ছাত্রীকে বৃত্তি দিয়াছেন। সমিতি মাসে প্রায় ১২০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে অবরোধ প্রথা নাই, নারীগণের সেখানে কাজ করিবার পথে বাধা অল্প। এদেশে অনেক উচ্চ মহিলার অন্তরেই নানা সাধু সংকল্পের উদয় হয়, কিন্তু অবরোধ প্রথা ও সুযোগের অভাবে অধিকাংশের সংকল্প অন্তরেই বিলীন হইয়া যায়। কলিকাতার মহিলা-সমিতি বাঙ্গালী সৈনিকদিগের সুখসুবিধার জন্য অনেক করিতেছেন। অনেক শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উৎসাহের সহিত এই সমিতির কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের সাময়িক উত্তেজনা থামিয়া গেলে সমিতির মহিলাগণ যদি এদেশের নারীদিগের কল্যাণচেষ্টায় শক্তি নিয়োগ করেন তবে তাঁহারা অনেক কাজ করিতে পারিবেন।

স্ত্রীশিক্ষা।

সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণীর সমালোচনা উপলক্ষে বোম্বাইয়ের "সমাজ-সংস্কারক" (Indian Social Reformer) পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা-বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন, "ভাল মা ও ভাল স্ত্রী গড়িয়া তোলাই ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল।" বর্ত্তমান শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় এই মতের সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "উক্ত আদর্শ বজায় রাখিয়াও বালিকাদিগের মানসিক শক্তি বিকাশের ব্যবস্থা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে। শুধু তাই নয়, বালিকাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদিগকে নূতন নূতন ব্যবসায় (বোধ হয় ডাক্তারী, ধাত্রীবিদ্যাপ্রভৃতি) শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক।"

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, ভাল স্ত্রী ও মা হওয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর একেই নির্ভর করে। জাতীয় মাতৃগণ হইতে কন্যা সন্তানে মাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব সংক্রামিত হয়, ইহা জাতীয় পবিত্র সম্পত্তি। আমরা চাই, আধুনিক বিদ্যালয়ে পড়িয়া বালিকারা আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের উপযোগী শিক্ষা লাভ করুক, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বিবিধ কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ততা লাভ করুক।

শিশু-শাসন।

শিশুদিগকে শাসন করিবার সময় আমাদের কত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, "নূতন শিক্ষাপ্রণালী" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অনেক সময়ই যে আমরা অকারণে বা অনুপযুক্ত কারণে তাহাদিগকে শাসন করি নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।-

"জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মন কখনও শূন্য থাকে না। কোনরূপ চেতনা (Consciousness) সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এই চেতনা মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, এগুলি নানাপ্রকার জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছাদ্বারা মিশ্রিত। কখনও উপস্থিত কোন বস্তুর জ্ঞান, ভাব বা ক্রিয়া দ্বারা মন অধিকৃত হইয়া থাকে, কখন স্মৃতি সাহায্যে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান, ভাব বা ক্রিয়া উদয় হয়। যখন কোন বিষয় আমাদের চেতনায় প্রবল থাকে, তখন ঐ বিষয়টী চেতনার কেন্দ্রস্থলে (Focus consciousness) অবস্থিত থাকে এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী বিষয়গুলি চেতনার পার্শ্বদেশে (Margin of consciousness) অবস্থান করে। যাহা এখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে আছে তাহা পরমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইতে পারে এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্তের পার্শ্বদেশস্থ বিষয়টি কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারে। যখন কোন বালক ব্রহ্মপুত্র নদ মানচিত্রে অঙ্কিত করে তখন ব্রহ্মপুত্র নদ তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে, তীরবর্ত্তী স্থানগুলি পার্শ্বদেশে থাকে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তীরবর্ত্তী স্থানগুলি যেমন, গৌহাটী, ময়মনসিংহ, সাঙ্গলবন্দ ইত্যাদি—তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসিতে পারে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইতে পারে। আমি বিদ্যালয়ে সুরেশের সহিত আলাপ করিতেছি, তখন সুরেশ আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে এবং দেবেন্দ্র ও অপর বালকগণ চেতনার পার্শ্বদেশে রহিয়াছে। পরমুহূর্ত্তে দেবেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন দেবেন্দ্র আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে আসিল, সুরেশ ও অপর বালকগণ আবার চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া গেল।

এইরূপে আমাদের চেতনা বা মানসিক অবস্থা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু এই অবস্থাগুলি মনের ভিতর অনবরত স্রোতের মত বহিতেছে, এবং ইহাদের ভিতর একটা ব্যক্তিগত চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই ব্যক্তিগত চিহ্নদ্বারা আমরা একের মনের অবস্থা হইতে অন্যের মনের অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারি।

খুব সম্ভবতঃ চেতনার সীমার বাহিরেও আমাদের মনে অনেক ধারণা থাকে। যদিও এই ধারণাগুলি আমাদের চেতনার বাহিরে তথাপি ইহারা আমাদের মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটায়। এই স্থানকে আমরা চেতনার প্রচ্ছন্নদেশ (Sub-conscious state) বলিতে পারি।

এইসকল সিদ্ধান্তের সাহায্যে বালকের দৈনিক জীবনের ঘটনাগুলি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহাই দেখান হইতেছে।

একটী বালিকা পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে, স্নানের সময় উপস্থিত হইলে মা তাহাকে স্নান করিতে ডাকিলেন, বালিকা উঠিল না, খেলাতেই ব্যস্ত রহিল। মা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিবার জন্য বালিকাকে শাস্তি দিলেন। বালিকা বিষণ্ণমনে স্নান করিতে উঠিয়া গেল। এখানে কি দেখিতে পাই? বালিকা মায়ের আদেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া খেলাতেই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং মা শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, খেলার পুতুলগুলি তখন বালিকার কেন্দ্রস্থলে ছিল এবং মাতার আদেশ চেতনার পার্শ্বদেশে কিছুক্ষণ থাকিয়া চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে চলিয়া গেল। এ অবস্থায় মাতার আদেশ ভুলিয়া গিয়াছিল, ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করে নাই।

ইহাও হইতে পারে যে বালিকা তাহার পুতুলগুলির প্রতি এত অধিক মনোযোগ দিয়াছিল যে মাতার আদেশ একেবারেই শুনিতে পায় নাই। এ অবস্থায় মায়ের আদেশ বালিকা ভুলিয়া যায় নাই, অবহেলা করা ত দূরের কথা।

সুতরাং আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে মাতার দেখা উচিত ছিল যে তাহার আদেশটী যেন বালিকার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং পুতুলগুলি চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যায়। তাহা হইলে তাঁহার আদেশ বালিকার পালন করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইত। তিনি বলিতে পারিতেন, "খুকী, খেলা রাখিয়া আমার কথা শুন দেখি" তখন মস্তক উত্তোলন করিয়া মাতার দিকে চাহিলে "মা" বালিকার চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকিবে এবং খেলার পুতুলগুলি চেতনার পার্শ্বদেশে চলিয়া যাইবে। তখন মা বলিবেন, "তোমার খাবার প্রস্তুত হইয়াছে, বিলম্ব করিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, শীঘ্র স্নান করিয়া এস, এখন পুতুল খেলা রাখিয়া দেও।" এরূপভাবে আদেশ দেওয়ার পর যদি বালিকা উহা অমান্য করে, তবে সে শাস্তির উপযুক্ত।

অপর একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। পিতা ছেলেকে বলিলেন, "এখন বাহির হইবার সময় হইয়াছে, জামা পর," ঘরের ভিতর তখন কতকগুলি নূতন জামা, কাপড়, অলঙ্কার ইত্যাদি তাহার মা বাক্স হইতে বাহির করিয়াছেন। বালক একবার জামা পরিতে অগ্রসর হয়, আবার নূতন জামা, অলঙ্কার ইত্যাদির দিকে চাহিতে থাকে ও জামা পরিতে বিলম্ব করে। এখানে বালককে কেবল ভৎর্সনা করিলে চলিবে না। প্রত্যেক নূতন বস্তুই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে; কোন বিষয়ে মন স্থির করিবার ক্ষমতা তাহার এখনও জন্মে নাই। কিন্তু যদি বালককে অপর ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, বা যে সকল বস্তু তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, সেগুলি তাহার চক্ষুর অন্তরাল করা যায়, তাহা হইলে বালকের জামা পরিতে বা পিতার আদেশ পালন করিতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখানে পিতার আদেশ বালকের চেতনার কেন্দ্রস্থলে কতক্ষণ ছিল, কিন্তু চিত্তাকর্ষক অন্যান্য পদার্থগুলি তাহার মনোযোগ অন্যদিকে লইয়া গেল। এজন্য চিত্তাকর্ষক পদার্থগুলি তাহার দৃষ্টি হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

ছেলেদের শিক্ষা।

একজন ইংরেজ-মহিলা লিখিয়াছেন, "বিলাতের স্কুলের ছাত্রগণ চঞ্চল ও অস্থির-প্রকৃতি, আর ভারতবর্ষের ছাত্রগণ শান্ত, নিরীহ।" বালকের প্রকৃতিই চঞ্চলতাপূর্ণ, যেখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানেই অস্বাভাবিকতা। এ দেশের অবসাদকর আবহাওয়ার দোষে আমাদের বালকগণ অনেকটা তেজ ও স্ফূর্তিবিহীন, তার উপর এ দেশের স্কুলের স্বাস্থ্যভঙ্গকারী দারুণ পাঠশ্রমে তাহাদিগকে আরও হীনতেজ করিয়া ফেলে। একখানি বাংলা সংবাদ পত্রে বালকদিগের পড়াশুনার গুরুভার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

"ম্যালেরিয়া, ডিস্‌পেপ্‌সিয়াও চিরদারিদ্রের আবাসভূমি বাঙ্গালাদেশে ছেলেদিগকে মানুষ করিতে হইলে, তাহা-

দিগকে ভাল খাইতে দিতে হইবে। কিন্তু শুধু ত খাইতে দিলেই হইবে না। ছেলেরা যে পুস্তকরাশির, তথা শিক্ষণীয় বিষয়-বৈচিত্র্যের 'গুরুভারে' নিষ্পিষ্ট! তাহাদিগকে এত রাশি রাশি পুস্তক পড়ান হয়, এবং এত 'হোমটাস্ক' দেওয়া হয় যে, তাহাদিগের প্রকৃতই নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না। এক দিকে, ভাল খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য যেটুকু গড়িয়া তুলিবে, অপর দিকে, শিক্ষার গুরুভারে তাহাদিগের স্বাস্থ্য দশগুণ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অতএব পাঠ্যের গুরুভার কমাইতেই হইবে। এম্, এ পাস করা এবং শিক্ষকতায় নিযুক্ত পিতামাতাও সংস্কারবশতঃ এবং কেরাণীকুলের দীনাত্মুমি বাঙ্গালাদেশের জলহাওয়ার গুণে সর্ব্বদাই ছেলেদের হাতে বই দেখিতে ভালবাসেন। অথচ যার মনে হয় যে, স্কুলের কথায় কথায় যে ছুটী ওলা হয়, পূজা ও গ্রীষ্মের যে দীর্ঘ অবকাশ হয়, শনিবারে বা পাল পার্ব্বণে যে অর্দ্ধেক অবকাশ হয়—এগুলা নিতান্ত নগণ্যের ফল! অভিভাবকগণ মনে করেন যে, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিতেছেন, আর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা অবকাশবাহুল্য দ্বারা অভিভাবকগণকে ফাঁকি দিতেছেন! কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, ঐ ছুটীর আধিক্য আছে বলিয়াই আজ বালকেরা জীবিত আছে—নতুবা গৃহে পিতামাতার ও বাহিরে বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়ের তাড়নায় এতদিনে অনেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত! সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই শিশুকে টানিয়া তুলিয়া পাঠে বসান হয়। সে পাঠ নয়টা সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত চলে। তাহার পরে, একাদিক্রমে সাড়ে দশটা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার পর যখন সে বাড়ীতে আসে, তখন তাহাকে হয় হস্তলিপি নতুবা 'হোম-টাস্কের' সমাধানে নিযুক্ত করা হয়—নতুবা সন্ধ্যা করিয়া সেই শিশুর প্রাইভেট-শিক্ষক স্কুল বা আপিসের ফেরত আসিয়া জুটায়, বালককে বাধ্য হইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাল আবার পাঠে রত থাকিতে হয়! এ রোগের প্রতীকার করা এখনই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে! স্কুল আন্দোলন আতীত ইহার প্রতীকার সম্ভবপর নহে! ইহার প্রতীকার করিতে হইলে, এই গুলি করাইতে হইবে:—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দুই রকম বিভাগ থাকিবে—একটা স্কুল-সমাপ্তি-সূচক (school final) অপরটি উচ্চশিক্ষামূলক। পূর্ব্বটিতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, মোটামুটি ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারা চাই, অঙ্কশাস্ত্রে শুধু পাটীগণিতে অধিকার থাকা চাই, এবং ভূগোলেও জ্ঞান থাকা চাই। বর্ত্তমান সময়ে, ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ আছে, তাহাই শেষোক্ত বিভাগের উপযুক্ত। (২) স্কুলগুলিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হউক। প্রথম বা উচ্চতন চারিটি শ্রেণী লইয়া হাই স্কুল থাকুক, এবং অবশিষ্ট পাঁচটি শ্রেণী লইয়া মধ্য-বিদ্যালয় গঠিত হউক। এই উভয়বিধ বিদ্যালয়ই প্রাতে তিন ঘণ্টা মাত্র বসিবে—অন্ততঃ মধ্য-বিদ্যালয়ে কোনও ক্রমেই তিন ঘণ্টার বেশী অধ্যাপনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। (৩) মধ্য-বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে ছাপান ইতিহাস, ব্যাকরণ, সংস্কৃত, ভূগোল, ইংরাজী, বা বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক বাদ দিতে হইবে। উচ্চ-বিদ্যালয়ে, যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য যে বিষয় লইবে, তাহাকে মধ্য-বিদ্যালয়ে বর্জ্জিত সেই সেই বিষয়গুলি শিখিতে হইবে। (৪) শারীর-তত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৫) যে সকল মেধাবী ছাত্র পারিতোষিকের প্রার্থী শুধু তাহাদিগেরই মধ্যে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বাকী ছাত্রগণের পক্ষে একমাত্র পাক্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে, সকল বিদ্যালয়েই পাঠদান কার্য্য না হইয়া পাঠগ্রহণই হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ায়, সুযোগ প্রাইভেট-শিক্ষক রাখা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। ভবিষ্যতে, এই রীতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরাই প্রত্যহ পাঠ দান করিবেন, এবং পক্ষান্তে সেই পাঠ গ্রহণ করিবেন। এই পাক্ষিক পরীক্ষার সমষ্টি ফলের উপর ছাত্রদিগের উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া নির্ভর করিবে। এরূপ করিলে বার্ষিক ও বাণ্মাসিক পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে না।

দেবী।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিঠির নাম শুনিয়া অবধি ঘরের মধ্যে দেবীর প্রাণটা তীব্র উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ডাকহরকরার সহিত ভিকুর যে সমস্ত হাস্যোদ্দীপক বাদানুবাদ চলিতেছিল, তাহা দেবীর মোটেই ভাল লাগে নাই! এমন কি শেষের দিকটায় দেবীর সমস্ত সহিষ্ণুতা, অন্তিম-যন্ত্রণা নিষ্পীড়নে সত্য সত্যই অসহনীয় পরিতাপে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। চিঠিখানা হাতে পাইবার পরও ভিকু দেবীর কাছে না আসিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাবে ডাকহরকরার সহিত কথাবার্ত্তায় মনোযোগী হইয়াছিল, তাহাতে দেবীর ইচ্ছা হইতেছিল,—উঠিয়া গিয়া ভিকুর গালে চড় বসাইয়া দিয়া তাহার ব্যবহারিক বুদ্ধিকে একটু সচেতন রাখিতে উপদেশ দেয়, কিন্তু তাহা পারিল না, কারণ নূতন ডাকহরকরাটি নিতান্তই তরুণবয়স্ক, এবং সম্পূর্ণই অপরিচিত, কাজেই তাহার সামনে বাহির হইতে পারিল না। তার পর পুনশ্চ ভিকু যখন তাহার সম্মতিগ্রহণের অপেক্ষামাত্র না করিয়া—স্বচ্ছন্দে তাহার নামে বেলপাতা পাড়িয়া দিবার জন্য ডাকহরকরাকে আদেশ দিল,—এবং দিব্য অসঙ্কোচে দেবীর পত্রখানা শুদ্ধ লইয়া, যখন বেলপাতা সংগ্রহ করিবার জন্য চলিয়া গেল, তখন নিরুপায় দেবী ক্রোধে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ভিকুর মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। বাস্তবিকই ভিকুর স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা আজকাল আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে, এবার কিছু দমন করা আবশ্যক।

ভিকু ত জানে,—খুব ভাল রকমেই জানে, আজ পনের দিন ধরিয়া ঐ একখানা পত্রের জন্য দেবীর প্রাণ কতদূর উৎকণ্ঠাব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। পুনের দিন ধরিয়া সে প্রতিদিন প্রতি পত্রাশাসূচক মুহূর্ত্তগুলি গণিয়া গণিয়া কাটাইতেছে। 'ওগুদৌত্যে সুপটু ভিকুকে' বার বার কত কৌশলে সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু কোন দিন কোন সন্ধান পায় নাই! তাহার চিরসহিষ্ণু হৃদয় মন, বেদনায়, বিস্ময়ে আতঙ্কে অস্থির হইয়াছে,—ভিকু কি তাহার কিছুই বুঝে না? তবুও সে দেবীকে জব্দ করিবার জন্য ভাব সাজিয়া মাথামুণ্ড কাজের অছিলায় কোন চুলায় ঘুরিতে গেল কি দুর্ভোগ!

পরীক্ষার পর রক্তামাশয় রোগে অত্যন্ত পীড়িত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় জন্য দেবীর স্বামী রমেশকে তাঁহার পিতৃবন্ধু অক্রূর বাবু তাঁহার রাঁচির বাড়ীতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করাইতে লইয়া গিয়াছেন, সে আজ দুই মাসের কথা। তার পর রমেশ ভাল আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, প্রতি সপ্তাহে রমেশ দেবীকে পত্র লিখিয়াছে,—কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে পনের দিন, কে জানে কিসের জন্য তাহাদের কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই। উষির মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ চার দিন হইল উত্তরের জন্য মাশুল দিয়া টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ আনাইয়াছেন. "রমেশ ভাল আছে।"—ইহা ছাড়া আর কোন সংবাদ কেহ জানে না।

অবশ্য ইহার অতিরিক্ত প্রার্থনীয় সংবাদ দেবীর পক্ষে আর কিছুই নাই। কিন্তু তবুও—মানুষের মন ত, রমেশ হঠাৎ দুই সপ্তাহ চিঠিপত্র বন্ধ করিয়া কেন যে সবাইকে ভাবাইয়াছে সে কথাটা সবিস্তারে জানিবার জন্য দেবীর মন একেবারে উদাসীন হইতে পারে নাই। তাই শুধু ঐ চিঠিখানার জন্য এত উদ্বেগ।

দেবী ঘন ঘন দ্বারের পানে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধশ্বাসে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, কাহারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছে কি না, কিন্তু না, একটি প্রাণীরও দেখা নাই! অত্যধিক প্রয়োজনের সময় এমনই হইয়া থাকে! ভিকুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একটিও মানুষ পাওয়া যাইতেছে না!

রমেশের চিন্তালোচনার ব্যাঘাত আশঙ্কায় পাছে পিতা বা অপর কেহ ক্ষুণ্ণ হন বলিয়া, রমেশের সহিত পত্র-ব্যবহার ব্যাপারটায় দেবী অত্যন্তই কুণ্ঠিত থাকিত। পাছে ডাক হরকরা বাহিরে শ্বশুরের মোসাহেবদের হাতে পত্র দিয়া যায়, পাছে পিতার হাতে সেই পত্র পড়ে,—

এই, ভয়ে দেবী সর্ব্বদাই সতর্ক সন্ত্রস্ত থাকিত। সেই জন্য এ সকল ক্ষেত্রে ভিকু তাহার বড় কাজে লাগিত, ভিকুর বুদ্ধিবলে দেবীর পত্রাদি এমন নিঃশব্দে যাতায়াত করিত যে, অন্তর্য্যামী না হইলে, স্বয়ং ভগবানও তাহা জানিতে পারিতেন না! কিন্তু আজ ভিকুর অতি বুদ্ধির প্রতাপে দেবীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছে! নিজের গরজে ভিকু আজ ঠিক যেন ফাঁসুরে হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন দেবীর প্রাণটা যে খাবি খাইয়া মরিল।

কাজে আর দেবীর হাত চলিতে চাহে না। ধান খুঁটিতে গিয়া অন্যমনস্কে চালগুলা বার বার ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, 'আট ঘর' গণিতে নয় ঘর গণনা হইল, সতের চালের বারগায় তের চাল হইয়া গেল, দেবী বিরক্ত হইয়া উঠিল. কিন্তু উপায় নাই,—কষ্টে দেবী ধরিয়া শান্ত শুদ্ধভাবে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে অদূরে পথের উপর ভিকুকে দেখিতে পাওয়া গেল। এক বোঝা দগু ভাঙ্গা বেল গাছের শাখা দুইহাতে ধরিয়া ভিকু দ্রুতপদে আসিতেছে। তাহার মুখখানা গর্জ্জনোন্মুখ মেঘের মত উগ্র ক্রোধে ভীষণ গম্ভীর!

সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, কিছু বেশী রকমের শব্দ পদশব্দ সহকারে ঘরে ঢুকিয়া, বেলপাতার বোঝা সজোরে দেবীর সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ভিকু দারুণ কোপ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল "এই নাঃ—ও!"

দেবী নিজের উৎকণ্ঠা ভুলিয়া গেল! সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, ভিকুর মুখ চোখের অবস্থা আদৌ সুস্থ স্বচ্ছন্দ নহে!—তাহার ঘনঘর্ম নিঃশ্বাসে স্ফীত নাসারন্ধ্র ও দ্রুত কম্পিত অধরোষ্ঠে অসহ্য ক্রোধের তীব্র উৎক্ষেপ-লক্ষণ স্পষ্ট জাজ্বল্যমান।

দেবী বুঝিল, যা-হোক কিছু একটা হইয়া গিয়াছে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনতিকাল পূর্ব্বে দুষ্ট ভাকহরকরার সহিত ভিকুর সৌজন্য শিষ্টাচার অভিনয়টা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হইল, আবার তেমনিই একটা কিছু-বাঁধা ঘটিয়া থাকিবে! কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আবার কি হয়েছে?"

সশব্দে মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বেলপাতা গুলার দিকে চাহিয়া, ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতে ফুঁসিতে ভিকু সজোরে উত্তর দিল, "কি আবার হবে, কিছু হয় নি!"

কিছু যে একটা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে দেবী এবার নিঃসন্দেহ হইল! "কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া খোঁচাখুঁচি করিবার মত ধৈর্য্য তাহার ছিল না, বিশেষতঃ রহস্যটা জানিবার জন্য বেশী জেদাজেদি করিলে, তাহার ফলে ভিকুর বর্ব্বর ক্রোধ যে আরও বেশী রুক্ষ, কঠিন হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধেও লেশ মাত্র সংশয় ছিল না! কাজেই কথাটা উল্টাইয়া তাড়াতাড়ি আর একটা কিছু বলিবার জন্য, দেবী সামনের বেল পাতা গুলার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল. "ভিকু, হলুকাকাকে তখন অত গাল দিচ্ছিলি, কিন্তু এখন দেখছেযি, তোরও আন্দাজের জোরত খুব! এযে তিন দিনের পূজার বেলপাতা রে! এত কি হবে?"

সগর্জ্জনে ভিকু উত্তর দিল, "ও আমি কি করে জান্‌ব? যে পেড়েছে, তাকে বল গে!"

কথাটা অন্য কাহারও মুখে শুনিলে যেরূপ আস্বাদনই লাগুক,—ভিকুর মুখে কিন্তু সম্পূর্ণই স্বাভাবিক বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট রহস্যও যেন কিছু স্পষ্ট হইয়া গেল! ভিকুর এই দুর্জ্জয় ক্রোধের মূল লক্ষ্যটা যে কোথায়—তাহা কিছু কিছু যেন বুঝিতে পারা গেল! কিন্তু এখন সে কথা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে গেলে,—হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনাটা খুব বেশী। অতএব ভিকু বেচারাকে একটু ঠাণ্ডা হইবার সুযোগ দেওয়া—আগে চাই। কাজেই দেবী ভিকুর কথাটা শুনিয়াও শুনিল না, ব্যস্তভাবে বলিল. "ওরে, আমার চিঠি—"

মুহূর্ত্তে—প্রচণ্ড ক্রোধে বিরাট গম্ভীর ভিকু,—শতমত খাইয়া লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল! "ওঃ ভাইত!—" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া শক্ত গেরো বাঁধা আঁচলের কোণ হইতে খুলিয়া, চিঠিখানা দেবীর সামনে সরাইয়া দিল,—জোরে নয়, বেশ ধীরে!

রাগের চোটে, এই অত্যাবশ্যক চিঠিখানার কথা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই বলিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অনুতাপ হইয়া থাকিবে,—সেই জন্য তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া লইয়া, একটু আগ্রহের সহিত নরম সুরে বলিল, "চিঠিখানা আগে পড়ত পিসিমা, পিসেমশাই কেমন আছেন জানো ত।"

এতক্ষণ,—এই অবশ্যম্ভাবী আগ্রহের গুরুত্বটুকু সুবোধ বালিকা যে কেন স্মরণ রাখিতে ভুলিয়াছিল—সে প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর গ্রহণের অবসর দেবীর ছিল না। বিনা বাক্যে পত্রখানা তুলিয়া লইয়া ত্রস্তে খাম ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দেবী বলিল, "ভিকু ঐ দোর গোড়ায় দাঁড়া, দেখিস্ যেন কেউ এসে পড়ে?"

এটুকু দেবীর সনাতন অভ্যাস,—আর ভিকুও এ প্রহরায় সুন্দর সুপটু। কাজেই, ক্ষণমধ্যে সে নিঃ[redacted] তুড়ুক করিয়া গিয়া, বাহিরের দিকে দুয়ারের চৌকাঠের উপর গম্ভীর মুখে দাঁড়াইল। কিন্তু ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টিটা রহিল দেবীর দিকে। হায়রে, পিসিমার প্রত্যেক ছোট বড় সুখ দুঃখটার সহিত, তাহার হৃদয়ের সম্বন্ধ যোগ যে কত ঘনিষ্ঠতম—তাহা সংসারের মূঢ় লোকগুলা কি জানিবে, ... দুষ্টগ্রহের পাকচক্রে আজ না কি তাহার নিতান্তই বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে নাহক বিড়ম্বনা ভোগের দিন, তাই ঐ কালামুখো ডাকহরকরাটা কোথা হইতে জুটিয়া তাহাকে মিছামিছি দুদ্দ কথা শুনাইয়া 'নাকাল' ত করিলই, তাহার উপর এই জরুরী পত্রখানা যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছান'র পক্ষে বিলম্ব ঘটাইয়া আরো বিগ্রহ বাধাইল!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভিকু বলিল "পিসে মশাই ভাল আছেন, পিসিমা?

চিঠি পড়িতে তন্ময় দেবী সংক্ষেপে উত্তর দিল "হুঁ—" পলক মধ্যে ভিকুর সমস্ত দুর্ভাবনা জল হইয়া গেল। কাজেই নিশ্চিন্ত চিত্তে,—সেই দুষ্ট ডাকহরকরার সম্বন্ধে দুর্ব্ব্যবহারের শোক দ্বিগুণ উল্লাসে উল্লেলিত হইয়া উঠিল। ঘটনাগুলার কথা ভিকুর যত মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাহার ধৈর্য্যশক্তি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল চোখে জল পড়ে আর কি!—নিগূঢ় অন্তর্দাহের তাড়নায় অতিষ্ঠ চিত্তটা ক্রুদ্ধ কেউটের মত ফণা বিস্তার করিয়া নিষ্ফল আক্রোশে অধীর হইয়া বারম্বার নিজকেই চোটাইতে লাগিল।

কিন্তু তাহা হইলেও ভিকুর একটু বুদ্ধি ছিল। পিসিমার ঐ চিঠিপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতেই হইবে,—সেটুকু মনে রাখিতে ভুলিল না, সে লৌহের মত শক্ত ও পাহাড়ের মত স্তব্ধ থাকিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবী দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে চিঠি পড়িতে লাগিল। রমেশ সংক্ষেপে লিখিয়াছে, "অক্ষয় বাবুর গুরুতর পীড়া হওয়ায় সেই গোলেমালে ব্যস্ত থাকার জন্য নিয়মিত পত্র লিখিতে পারে নাই, অক্ষয়বাবু এখন ভাল আছেন। টেলিগ্রাম পাইয়া এখানে সকলে চিন্তিত আছেন বুঝিয়া সে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছে। যাহাই হউক ভাবিবার প্রয়োজন নাই, সে শারীরিক ভাল আছে। আর শুভানুধ্যায়ী অক্ষয়বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া, বিপত্ত কন্যা রাঁচি হইতে রওনা হইয়া, আজ দুপুরের সময় গাকুড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিবে, তার পর এখানে সকলের সহিত দেখা করিয়া দুই চারি দিন পরেই কলিকাতা যাইবে, কারণ শীঘ্রই তাহার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে।

অপ্রত্যাশিত হর্ষোচ্ছ্বাসে দেবীর সমস্ত বুক উচ্ছল সান্ত্বনায় ভরিয়া গেল! কি সুসংবাদ! এত দিনের পর সে তাঁহাকে আজ দেখিতে পাইবে। সেই এক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় শ্বশুরের আদ্যশ্রাদ্ধের সময় নদীয়ায় শ্বশুরালয়ে গিয়া,—সেই ছোট কয়টি দিনের দেখা,—তারপর আজ এক বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই!

তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছে, তের বৎসরের বালিকা দেবী এখন ষোল বৎসরের হইয়াছে। লজ্জাশীলা নববধূর বেশে সে যেদিন রমেশের সহিত তাহার গৃহে প্রথম গিয়াছিল, সে দিন হইতে আজিকার এই দিনে,—তাহার দেহমনে প্রচুর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রমেশের ভাব চির অপরিবর্ত্তনীয়! পড়াশুনার ঝোঁকে মাতিয়া সে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সংবাদ

ভুলিয়া গিয়াছে। নিজের স্মৃতিরই সে সব সময় মর্য্যাদা রাখিতে পারে না, ক্ষুদ্র দেবীর ক্ষীণ স্মৃতির কেমন করিয়া মনে রাখিবে? তবুও কর্ত্তব্যবোধে সে যতটুকু যাহা মনে রাখিত, তাহা বাস্তবিকই দেবীর হৃদয়ের নিকট বড়ই লজ্জা ও লুণ্ঠার বিষয়! দেবীর মনে হইত, রমেশ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাউক, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু সে যেন রমেশের খুঁটিনাটি সংবাদ শুনিতে পায় তাহাতেই সে তৃপ্ত সার্থক হইবে!

দেবীর মনস্ত ছিল না। শাশুড়ি অনেক দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, কাজেই বৃদ্ধ শ্বশুর বিবাহের পর দুই বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেও, বালিকা পুত্রবধূকে একটি বারের, বেশী নিজালয়ে লইয়া যান নাই। রমেশ পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া কোথাও বাহির হইতে চাহে না, সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় খুবই অল্প। তবুও সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে ছোট খাট আবরণের ভিতর দিয়া, পরস্পরেই পরস্পরের প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়াছিল। উদ্দাম যৌবনের মত আবেগ তাড়নার নহে, —যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতিতে, দুইজনে দুইজনকে ভালবাসিত। দুর্ভর কর্ত্তব্য দায়িত্বের অনুরোধে চোখে দেখিবার লালসাটুকু উভয়ের মধ্যেই ক্ষীণস্রোতে বহিত। বাহিরের লোকে ভাবিত,—দাম্পত্য প্রেমধর্ম্মের প্রভাব হইতে এই অপোগণ্ড দুইটি বহুদূরে আছে!

অল্প বয়স হইতে একাগ্র অধ্যবসায়ের জোরে বছর বছর সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজিতে এম, এ, পাস করিয়া, রমেশ পুনশ্চ বিজ্ঞান পড়িতেছে, এই বছর সে বি, এস্, সি, পরীক্ষা দিয়াছে।

রমেশের পত্রখানা দেবী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দুই তিন বার পড়িল। বিপুল পুলকাবেগে আর্দ্রকোমল চিত্তে গভীর আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে ভিকুর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িল,—মমতা-বিগলিত-হৃদয়া দেবী তাড়াতাড়ি চিঠিখানা সেমিজের বোতাম খুলিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "ভিকুমণি, কি হয়েছে বলত মা—"

ভিকুর ক্রোধ সমুদ্রে এইবার নিদারুণ অভিমানের তুফান হাঁকিল। তাড়াতাড়ি দ্বার প্রান্ত ছাড়িয়া, পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিয়া উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাস দমনের জন্য, সশব্দে ঘনঘনী নিঃশ্বাসে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "কিছু হয় নি!—"

রহস্য-স্মিত দৃষ্টিতে ভিকুর অভিমান-তরঙ্গিত আরক্ত মুখ খানির পানে চাহিয়া দেবী অধিকতর কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ—আমার কাছে মিছে কথা!—"

ঐ ক্ষুদ্র-ভৎর্সনার মিষ্ট স্বরটুকু ভিকুর প্রাণে গুরুতর আঘাত দিল। উচ্ছল চিত্তাবেগ কাণায় কাণায় ভরিয়া টলমল করিয়া উঠিল,—সরলমতা জিনিসটা যতই স্নিগ্ধ আনন্দদায়ক হউক, কিন্তু অনুপানের গুণমাহাত্ম্যে তাহাও ব্যক্তি বিশেষের নিকট অসহনীয়!—দেবীর মুখপানে ছলছল দৃষ্টি তুলিয়া দারুণ ক্ষোভ পূর্ণ কণ্ঠে সে বলিল, "যাও, তুমি কেন আজ আমায় নাইতে বারণ করেছিলে বল ত?—"

অদ্ভুত কৈফিয়ত! পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সহিত এ উত্তরের যে কি সম্বন্ধ যোগ আছে, দেবী তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। আজ মঙ্গলবার,—সকলের দেখাদেখি, ভিকুও জয়-মঙ্গলবারের ব্রত পালন করিয়া থাকে, অবশ্য তাহার ব্রতাচরণের মধ্যে ভাবী পতির কল্যাণ কামনার আগ্রহ কতটুকু ছিল, বলা কঠিন, তবে সে যে দেবীর কার্য্যানুসরণ করিয়া চলে,—এ ব্যাপারে ইহাই তাহার পক্ষে পরম আনন্দ! ব্রতের দিন বলিয়া আজ সকালে সে যখন স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সদ্য-বিগলিত কপালের কোঁড়ার তৈলাক্ত কেশ-সংঘর্ষণের ফল আরাম দায়ক হইবে না বলিয়া দেবী তাহাকে সে কার্য্যে নিরস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সেই সামান্য ব্যাপারের জন্য এতক্ষণের পর—কেন যে ভিকুর এমন নির্ম্মম আক্ষেপের উদয় হইল, দেবী তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সবিস্ময়ে বলিল, "কেন, তাতে কি হয়েছে? না নেয়েও ত মঙ্গলবার করা চলে, এই যে বৌদির কাল শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই আজ নাইলে না, তার জন্য—"

ভিকুর আর আত্মদমনের ধৈর্য্য রহিল না। সজোরে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "হুঁ, দেখ দেখি আমার মাথার

চুলগুলো কি যাচ্ছে তাই হয়ে রয়েছে, ঠিক যেন—" সর্জ্জনশীল কোতে,—মনোজ্ঞ সিত খাস প্রশ্বাসের অন্তরালে অস্ফুটায়িত উপমা উহ্য রহিয়া গেল! দেবী হাসিয়া বলিল, "এর জন্যে এত! কাজ সারা হোক, আমি এখুনি গিয়ে তোমার চুল বেঁধে দিচ্ছি।

"আর এখন দিয়ে কি হবে? কিছু দরকার নাই!—" অপরিসীম দুঃখে ভিকুর ইচ্ছা হইল দুই হাতে সমুদয় চুলগুলা নিষ্ঠুর ভাবে ছিঁড়িয়া তখনই দেবীর সম্মুখে সমূলে বিসর্জ্জন দেয়! যেন ইহ জন্মের মত সেগুলার স্মৃতি-সম্পর্ক আর মনে উদয় না হয়, কিন্তু তাহা হইবার পক্ষে সুলভ উপায় তেমন কিছু চোখের সামনে দেখা গেল না, কাজেই নিরুপায় ভাবে পা দুইটা সম্মুখে ছড়াইয়া— সজোরে মাথাঝোড়া দিয়া দুইহাতের দশটা নখরের কঠি সন্তাড়নে মস্তক-বক্ষের এ প্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ষণে যন্ত্রণাদায়িত করিয়া তুলিল, রাগে চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল।

দেবীর দৃষ্টি পরিষ্কার হইল,—এবারে যে ঐ কেশ বিশৃঙ্খলা লইয়া বিপন্ন বাধিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ রহিল না! হাসিয়া বলিল, "তুই রাগিস্ কেন? কুচো চুল বেরিয়েছে, তাই একটুতেই মাথাটা বাবুই'এর বাসার মত টোকাপানা হয়ে উঠে,—"

"হুঁ! বাবুইয়ের বাসা, এতক্ষণ বলনি কেন?"

"সেটা তোমায় বলবার যে বিশেষ দরকার আছে, তা আমি মনে করিনি,—কেন, ঐ ডাকপিওন বুঝি কিছু বলেছে?"

"ডাক পিওন বুঝি কিছু বলেছে! হুঁ, নিজে যেন কিছু জান না,—"

দেবী এবার সত্যই আশ্চর্য্য হইল, বলিল "বাঃ, তা আমি কি করে জানব?"—

ভিকু রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে বলিল "হুঁঃ! এখন আমি কি করে জানব বৈ কি?—"

এই ক্ষুব্ধ ভৎর্সনাসূচক প্রতিধ্বনিগুলার মূলে যতই করুণ রস শঙ্কিত থাক, কিন্তু ইহার ঠেলায় দেবীর হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল! অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া দেবী প্রশ্ন করিল, "কি বলে সে?"—

ভিকু ঘাড় ঘুরাইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "এতক্ষণে হচ্ছে,—কি বল্‌লে টস্? কি বল্লে না ... ... আমায় বলে কিনা ভৈরবী! হুঁ, আমি যেন সত্যিকার পাগল, তাই কিছু বুঝতে পারি না, অনামুখো নচ্ছাড়া কোথাকার—"

বিরক্তির সহিত দেবী বলিল, "আঃ কেন খামকা গাল দিস্! তুইও তাকে নিশ্চয় কিছু বলেছিলি. কেমন?"

ঘাড় চুলকাইয়া, গোঁজ গোঁজ করিয়া ভিকু বলিল, "আমার বেলায় যত দোষ! ... ... কেন বল্‌ব না? ডাকাত সর্দ্দারের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রাখতে পারে, আর লোকে বল্‌তে পারে না? খুব করেছি, বলেছি বেশ করেছি আরো বল্‌ব!"

ভিকুর কণ্ঠস্বরে ব্রজকণা খেলিয়া গেল, দেবী দেখিল গতিক ভাল নয়। নরম সুরে বলিল "একখানা চিঠি নিয়ে তুই তাকে কম নাকালটা করেছিস? জানিস, নিজের মান নিজের কাছে, আর কেউ হলে চটে গিয়ে ঠাস্ করে তোর গালে চড়িয়ে দিত, সে ভাল মানুষ তাই তোর অসভ্য বেয়াড়াপনা সহ্য করে গেছে, আমি বুঝি তোকে অমনি করে চিঠি আন্‌তে বলে দিয়েছি?—"

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগ দমনের জন্য ঢোক গিলিতে গিলিতে ভিকু বলিল, "তাত বল নি,—আচ্ছা তোমার কাছে 'খাট হয়েছে' মানছি, ... কিন্তু তাবলে ও আমায় ভৈরবী বলবার কে?"

"তুমি তাকে ডাকাত সর্দ্দার বলবার কে?" দেবী হাসিয়া ফেলিল।—

ঐ যাঃ! এতক্ষণের পর সব মাটি হইল। ভিকুর সমস্ত সহিষ্ণুতা সমূলে লোপ পাইল!—হা পরমেশ্বর, বড় আশার উত্থাপিত অকাট্য অভিযোগের উত্তরে এমন নিষ্করুণ প্রতিযোগের অতর্কিত বজ্রাঘাত! সে যে ইহা মোটেই প্রত্যাশা করে নাই!—ভিকুর চোখে জল টল টল করিয়া উঠিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা বলবে বই কি! তুমিই ত সবাইকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলছ, না হলে কি আর—" আর বলা হইল না, টস্ টস্ করিয়া চোখের জল করিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ

সে দ্রুত পলায়নোদ্যোগ করিল। স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে দেবী বলিল, "শোন, শোন, পালাস নি, আমি আবোরা দিয়ে মাথায় তুলসুম কেমন করে,—বুঝিয়ে দিয়ে যা—"

দ্রুত বহির্গমনোন্মুখ ভিকু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সবেগে দ্বারের দিকে ছুটিল, কিন্তু চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়াই হঠাৎ কি যেন কিসের একটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া ঘরের মধ্যে ফিরিল। দেবী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখের পথ দিয়া সোপন বাক্যহারারঞ্জিত অধরে স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষে দ্বারের দিকে চাহিতে চাহিতে অনতিকাল পূর্বে দৃষ্ট সেই তরুণ ডাকবরকরাটি দিব্য স্বচ্ছন্দ-গমনে পুনশ্চ ফিরিয়া চলিয়াছে?—ভিকু সরিয়া যাইবামাত্র, মুক্ত দ্বারপথে গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তিনী দেবীকে দেখিবামাত্র সে অপ্রস্তুত কুণ্ঠিতভাবে সসম্ভ্রমে [illegible] মাথা নোয়াইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তাহার মুখের হাসি আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

অভিনব কৌতূহলের সহিত, একটা স্নিগ্ধ আনন্দ স্পর্শে দেবীর অন্তঃকরণের একাংশ স্নেহনুত হইয়া উঠিল! আহা ছেলেটি ত দেখিতে বেশ, পরিচ্ছন্ন সুন্দর উহার আকর্ণচুম্বিত কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশরাশি থাকুক, কিন্তু ভিকুর প্রদত্ত ভীষণ কুৎসিত বিশেষণের সহিত ঐ সুকুমার পৌরুষ-শোভা-বিকাশোন্মুখ তরুণ মূর্ত্তির কোন সামঞ্জস্য আদৌ সম্ভবে না! না না, ভিকু বড়ই অবিচার করিয়াছে!

চকিতে দেবীর চিত্তের উপর একটা অভাবনীয় আকাঙ্ক্ষা সবেগে ঝাঁকুনী দিয়া গেল! আহা, ভিকুর জন্য যদি অমনই একটি ছেলে পাওয়া যায়! তাহা হইলে বেশ মানায়! সদাচঞ্চলা, স্নেহে অভিমানে সরল আনন্দ উচ্ছ্বাসে মুখরিত-প্রকৃতি, ভিকুও যেমন মনোহর শ্যামশ্রী শোভনা বালিকা 'কণে'টী হইয়াছে—ঐ স্মিতহাস্য প্রফুল্ল-বদন, উজ্জ্বল শ্যামসুন্দরকান্তি তরুণ যুবাটিও ঠিক যেন তাহার উপযুক্ত সুশোভন বর! দেবী মুখ ফিরাইয়া ভিকুর জন্য ঘরের চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কোথায় সে? বাহিরের দুয়ার দিয়া পলাইতে গিয়া দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে সদ্য পরাভবকারী প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখের পথে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ক্রোধে জ্বলিয়া সবেগে ফিরিয়া তখনই সে অন্তঃপুরের দ্বারপথে নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে?—দেবী আপন মনেই একটু হাসিল, কৌতুক মন্দ নয়!

ক্ষণপরে অন্য চিন্তা আসিয়া দেবীর হৃদয় অধিকার করিল, হাত দিয়া বুকের সেমিজের মধ্যে সেই চিঠিখানা একবার দেখিল, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে বেলপাতা গুছাইতে গুছাইতে সোপন আগ্রহ উত্তেজনায় ঘনস্পন্দিত বক্ষে, লজ্জারাঙ্গিত আরক্তমুখে,—সহস্র আশা-সংশয়ে দ্বন্দ্ব উদ্বেলিত চিত্তটা অতীত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যতের মধ্যে সঙ্কোচস্খলিত গমনে, শৃঙ্খলাছন্দহীন ভাবে দ্রুত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে অধীর ঔৎসুক্যে দুইদিকের দ্বারপথে, লজ্জাচকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ আসিতেছে কি না, অবশ্য তদন্ত লইতে ভুলিল না। কে জানে এতক্ষণ যদি পিতার নিকট রমেশের কোন পত্র আসিয়া থাকে, যদি সকলে রমেশের আসার সংবাদ শুনিয়া থাকে, ... আর, কি জানি যদি কেহ দুষ্টামী করিয়া সে কথাটা তাহাকে শুনাইবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আঃ—ছিঃ! আপনা আপনি তাহার আকর্ণ-লোহিত হইয়া উঠিল! কেহ কোথাও নাই, তবুও লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়া দেবী ঘাড় হেঁট করিয়া বেলপাতা ছিঁড়িয়া—"এক, দুই, তিন—" গণিতে অত্যধিক মনোযোগ প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া পড়িল!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বাড়ীর মধ্যে গোলমাল বাধিয়া উঠিল, দেবী শুনিল, ছোট ভাই সুধীর ব্যগ্র উৎসাহিত কণ্ঠে, উচ্চ চীৎকারে সকলকে শুনাইতেছে, "ওগো সুখবর শোনো, জাইবু,—মানে রমেশ বাবু, আজ এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ট্রেণে আসছেন, আমি তাঁকে আন্‌তে ষ্টেশনে যাব, ছোটমা, শীগ্রী আমার ভাত দিতে বল, আমি খাইতে চল্লুম—"

ক্ষণমধ্যে বাড়ীর চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র কণ্ঠে ব্যস্ত কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল। যুগপৎ বহুকণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের দ্বন্দ্ব সংঘাতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, কোন কথা স্পষ্ট বোধগম্য হইল না। একটু পরে, উৎকর্ণ দেবী শুনিতে পাইল—ভ্রাতৃজায়া

বলিতেছেন, "একেই বলে ঘোরের ফের! বাড়ী শুদ্ধ লোক জেনে আড়ষ্ট, অথচ রমেশ ঠিক সময়েই চিঠি লিখেছে, ন'দিনের পর আজ সেই চিঠি সাত জায়গার ছাপ খেয়ে, এখানে এসে পৌঁছুল,—"

—তৎক্ষণাৎ আবার একটা প্রকাণ্ড গোলমালের সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কবে, কোথায়, কাহার কোন আত্মীয়ের পত্র কিরূপ বিভ্রাটে হস্তান্তরিত হইয়া, বহুদিন-ব্যাপী অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণের পর, অকস্মাৎ মালিকের নিকট আবির্ভূত হইয়া কিরূপ অদ্ভুত বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, সে বিষয়ে শত শত সালঙ্কারবর্ণনা বিবৃত হইয়া গেল। সুধীর মাঝে পড়িয়া উপস্থিত রহস্যের মীমাংসা সমাধান করিয়া বিজ্ঞ কণ্ঠে বলিল, "ওসো না, ভাসুর ঘরের দোষ কিছু নাই, জাঁইবু'ই তাড়াতাড়িতে ভুল করে "ডিষ্ট্রীক্ট বাহুড়া"—লিখতে গিয়ে "বাঙ্কিপুর" লিখে বসে ছিলেন তাই অত খানি ঘোর-ফের ঘরে গেল!"—

আরো অনেক গুলা প্রশ্নোত্তর ও তর্ক মন্তব্যের ভিতর হইতে দেবী শুনিতে পাইল, অক্ষয় বাবুর পীড়ার জন্য রমেশ চিঠি লিখিতে সময় না পাইলেও, কয়দিন পূর্ব্বে সংক্ষেপে সংবাদ জানাইয়া একখানা পোষ্টকার্ড পিতাকে লিখিয়াছিল, সেই পত্র খানাই উক্ত বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, এবং সেই পুরাণ পত্র খানা আর একটা সদ্যলিখিত পত্রের সহিত আজ একযোগে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কীয়া সকলের মধ্যে মধ্য উল্লাসে হাস্য পরিহাস সুরু হইয়া গিয়াছে শোনা গেল, পৌরাঙ্গনাগণ একযাত্রায় জটলা করিয়া, রমেশ বাবুর আগমন সূত্র উপলক্ষ্যে পরস্পরকে,—প্রচলিত গ্রাম্য রসিকতায় উপহাসতাড়িত করিয়া তুলিয়াছে! ঠাকুর ঘরের দালানের দিকে দুম্ দুম্ পদশব্দে আসিতে আসিতে, কাদিনী দিদি দেবীর জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিজয়ের স্ত্রীকে বিদ্রূপবক্রত কণ্ঠে বলিতেছে,—দেবী শুনিল "ভাসোদ কাশীপুর থেকে দেশে এসে যৌতাকুরুণ জামাইবাবুকে 'নিমন্তর' করেছিলে, তাই তিনি আর 'সোধা' করতে পারলেন না, তোমার মান রাখতে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছেন! নইলে, আমাদের বরাত দেখ, সেই তিন বছর আগে বিয়ের রাতে কবে একটিবার দেখেছি ভাল মনেও পড়ে না,—তা এদ্দিনে, এত 'ব্যাগোরতা'তেও তিনি একবার এসে দেখা দেবার অপ্সর পেলেন না, একি কম দুঃখের কথা!—"

বাড়ীর দ্বারের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দেবী, উদাসীনভাবে নিজের কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, দেখিল—বাহিরের দুয়ারের নীচে সম্মুখের সেই পথ দিয়া—তাহাদের পশ্চিমা নফর ছত্তনসিং মাথায় লালপাগড়ী পাগড়ী জড়াইতে জড়াইতে, বগল-দাবায় লাঠি চাপিয়া ধরিয়া, বুক ফুলাইয়া লম্বা লম্বা পাদক্ষেপে কোথায় চলিয়াছে, দূর হইতে কে একজন উচ্চ কণ্ঠে তাহাকে সুধাইল "কাহা রে ছকুয়া, কাঁহা?—"

উল্লাসের হাসিতে ছত্তনের প্রকাণ্ড মুখ খানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সগর্ব্বে সে উত্তর দিল, "কাহার্ লোগ্‌কো বোলানে যাঁতে ভেইয়া! বাবুজীকো দামাদ্ টিশনসে আয়েন যো—"সমস্ত কথাটা শোনা হইল না, দেবী সসঙ্কোচে আস্তে ঠেলিয়া কপাটটা ভেজাইয়া দিল,..... না বাপু, আজ যেন তাহাকে কেহ না দেখিতে পায়, 'বাবুর জামাই আসিতেছেন' সেই ভাল, কিন্তু দেবীর সহিত এ ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে, তাহা যেন কেহ না সন্দেহ করিয়া বসে, ছিঃ কি লজ্জা!—

"কি গো সিদ্ধি, আজ ঠাকুর ঘর ছেড়ে বেরুবার ফুরসুৎ পাবে না নাকি?....." বাঙ্গ পূর্ণ প্রশ্ন শব্দে চমক-স্পৃষ্টা দেবী পিছনে চাহিয়া দেখিল—এতক্ষণ লজ্জাবেগস্পন্দিত হৃদয়ে যে দুঃসহ সঙ্কোচ-পীড়িত মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবার তাহাই সম্মুখে আবির্ভূত! বাড়ীর দিদি ও বৌদিদিগণ সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া গোপন-বিদ্রূপ-হাস্যবর্ষী অধরে, ভিতরের বারেন্ডা দিয়া ঠাকুর ঘরে আসিতেছেন। লজ্জায় দেবীর সমস্তমুখ ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বেলপাতা লইয়া আলিপনার ডিজা আঁকা ঘরে ঘরে ধরে সাজাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বহুকণ্ঠের রঙ্গ-কৌতুক ঝঙ্কার, বিশেষতঃ রস-বোধ খ্যাতিতে সুপ্রসিদ্ধা বাড়ীর বুড়ী সেজ ঠান্‌দি মহাশয়ার নিপুণ রসাভাস বর্ণনা পারিপাট্যে মেয়েদের দলে খুব একটা হাসির রোল উঠিয়া, তখনই

সহসা অর্দ্ধস্তব্ধ ভাবে থামিয়া গেল। দেবী আশ্চর্য্য হইল, সাহসে ভর দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—মালা হাতে লইয়া প্রদক্ষিণ করিতে ছোটমা সেই দিকে আসিতেছেন! দেবী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল. যাক্ ছোটমার সামনে তু. ইহারা অশ্লীল কৌতুকে বাচালতা প্রকাশ করিতে পারিবে না,—বাঁচা গিয়াছে!—

বলাই চাকরকে পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার কথা বলিতে বলিতে, ছোটমা আসিয়া ঠাকুর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। ছোটমা মানুষটি বেঁটে-খাট, ব্রত-উপবাস-কৃশ শরীরে তেমন শক্তিকীর্ত্তির লক্ষণ ছিল না। কিন্তু নিঃসন্তান বালবিধবার সুস্থ স্বাস্থ্য এই এই প্রৌঢ় বয়সেও তাঁহাকে সংসারের সমস্ত শ্রমসাধ্য কার্য্যে শক্তি যোগাইত। বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সংসারের শৃঙ্খলা সাধনে, অবাধ্য দাসদাসী শাসনে তাঁহার বেশ দৃঢ় তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। মুখে একটি সরল মমতাময় শান্তভাব চির বিদ্যমান; ইনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ, শৈশবে মাতৃহীন সুধীর ও দেবী ইঁহারই কোলে মানুষ হইয়াছে, ইনিই এখন অন্তঃপুরের কর্ত্রী।

লজ্জাকুণ্ঠিতা দেবীর স্নিগ্ধআনন্দময়ী মূর্ত্তির উপর এক বার স্নেহসজল দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া ছোটমা বলিলেন, "গোছান হল সব? এবার তুই বেরিয়ে আয়, কামিনী ওদের ডাল পালা ঝেঁটে দিয়ে মুক্ত করছে।"

দেবী দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল! ছোটমার সামনে ইহাদের হাত এড়াইয়া পলাইতে পারিলে হয়!—কোন মতে আত্মদমন করিয়া, গোপন যন্ত্রণার অস্ফুট হাস্যগুঞ্জননিরত গৌরাঙ্গনাগণের পাশ কাটাইয়া, নিঃশব্দপদে পলায়ন করিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া, ছইপুষ্ট উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি—সরল হাস্যোৎফুল্ল সদা-আনন্দময়-চিত্ত চতুর্দ্দশ বর্ষীয় ভ্রাতা সুধীরকুমার সন্তরণের পর মাথা মুছিতেছিল, দেবীকে দেখিয়া সোৎসাহে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দিদি, আমার ভাই একটা নতুন শার্ট বের করে দাও, আর এক-খানা কাপড়—স্নানের কেতাবগুলি লাগিয়ে দিও ভাই, লক্ষ্মীটি!—জাঁই-বু'কে আনতে ষ্টেশনে যাব বুঝলে?"

দিদি বোকাবুঝির সম্বন্ধে স্বীকার অস্বীকার কোন লক্ষণই না দেখাইয়া ঈষৎ স্খলিতপদে দ্রুত চলিল—মুক্ত উঠান পার হইয়া, বারেন্দায় উঠিয়া,—এদিক ওদিক চাহিয়া—কেহ নাই দেখিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "তুই ষ্টেশনে যাবি—বাবু, আর দুপুর বেলা যে পণ্ডিত মশাই তোকে পড়াতে আসবেন।"

সগর্ব্বে ঘাড় ঘুরাইয়া, বাবু—ওরফে সুধীর বলিল, "ওঃ—সে আমি ঠিক ঠাক করে নিয়েছি দিদি, বাবা পণ্ডিত মশাইকে চিঠি লিখে হলু-কা'কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তিনি আজ আর আসবেন না—শুধু সেই সন্ধ্যে বেলায় মাষ্টার মশাই আসবেন।"

সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেবী বলিল, "তুই নাই বা ষ্টেশনে যেতিস্ বাবু—অনর্থক একটা দুপুরের পড়া কেন নষ্ট করলি—"

"নষ্ট আর কি দিদি,—সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটিটাই তো আমি সমানে বাড়ীতে পড়ছি, একদিন কি ছুটি নিতে নাই?—"

ঈষৎ হাসিয়া দেবী বলিল "কিন্তু এই এক দিনের দামটা কত জানিস তো—আজকের সময়টা কাল আর ফিরে পাবি না—"

ক্ষুণ্ণ হইয়া—অনুনয়ের স্বরে সুধীর বলিল, "না ভাই দিদি আজ আর বাধা দিও না, কাল দুপুর বেলা ডবল খেটে এই জৈতিটা পুষিয়ে নেব,—আজ কিন্তু ভাই ষ্টেশনে যাই; আহা জাঁই-বু কদ্দিনের পর এখানে আজ আসছেন বল দেখি,—তোমার কি এ'টুকু খানি মায়াও হয় না?—"

দেবীর ইচ্ছা হইল, সে উত্তর দেয় যে, 'মা'. অন্যায়ের পক্ষ সমর্থনের জন্য সত্যই তাহার 'এ'টুকু' খানি মায়া-ও নাই, দয়া-ও নাই!—কিন্তু উত্তর দিবে কি? নির্ব্বোধ সুধীরের যে সত্য সত্যই এতটুকুর দ্বন্দ্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই,—সে ঐ 'মায়া' কথাটুকু ব্যবহার করিল,—শুধু তাহার দ্বিপ্রহরের পড়াশুনা অবহেলার প্রতি—দিদির নির্ম্ম-কটাক্ষপাতটা লক্ষ্য করিয়া,—'কিন্তু' কথাটা সে এমন একটা দুরূহ বাক্যাংশের পর—একটানা ভাবে জুড়িয়া দিয়াছে,—যে তাহার উপর বক্তব্যটুকু করিতেও, দেবীকে

ফাঁকরে পড়িয়া ভাবিতে হয়!—কিন্তু না, সাবধানতার মুখ চাহিয়া, এখন ঐ উত্তরটাকে মনের মধ্যে জমা রাখিয়া রাখা যাক্ উহার পর কোন সূত্র অবলম্বনে—বেশ শোভন সংযতরূপে উহা সুদ সমেত ওয়াশীল দিবেই চলিবে!—দেবী কোনো কথা না বলিয়া অগ্রসর হইল।

পশ্চাত হইতে সুবীর সান্ত্বনার সুরে সাফাই গাহিল "তুমি রাগ কোরনা ভাই-ঝিদি,—বাবা কিন্তু আমায় একটি বারও বারণ করেন নি,—তিনিই বরং বল্লেন যে, 'বাবু শীগ্‌গী নেয়ে নেবে,—ষ্টেশন চলে যা—' জানলে?"—

ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া,—গ্রীবা সঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক, দেবী সিঁড়ির দুয়ারে উঠিয়া ঝাঁপ ছাড়িল; কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছে,—এমন সময় দুম্, দুম্ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া —ভিকু উপর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সজোরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাহ্লাদে বলিল, "পিসে মশাই আসবেন—কই আমায় তো তখন বল্লে না পিসিমা-?"

দেবী সস্নেহে তাহার কপোলদেশ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া,—তাহার মুখখানা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া —ভিকুর আনন্দ-উজ্জ্বল দৃষ্টির পানে চাহিয়া, প্রীত মুখে একটু হাসিল, সে হাসির অর্থ—সে সৌভাগ্য পুলকাবেগের উচ্ছ্বাস, আমার ক্ষুদ্র বুক ছাপাইয়া কূপাইয়া পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল রে ভিকু,—সেই জন্য যে আমি জোর করিয়াই, নিজের চপল রসনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলাম; না হইলে এ প্রবল সুখের উল্লাসঙ্কার কি একটা বুকে বহিতে পারা যায়? ইহার অংশ, দিকে দিকে—সকলকে ভাগ করিয়া না দিলে যে স্বস্তি মিলে না!—কিন্তু কি করিব? নিরুপায় আমি যে লজ্জার সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য একান্তই দায়গ্রস্ত, তাইত এত বড় ব্যাপারটাও নিঃশব্দে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

দেবী নিরুত্তরে মৃদু মৃদু হাসিতেছে দেখিয়া ভিকু অনুযোগের স্বরে বলিল "নাঃ, তুমি ভারি দুষ্টু পিসিমা,—কেন আমায় তখন বল্লেনা বল দেখি?"

কোনই যুক্তিসঙ্গত সদুত্তর দেবীর মনে পড়িল না, কাজেই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সে পাল্টা প্রশ্ন করিল, "এতক্ষণ, কোথায় ছিলি ভিকু?"

মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া দুঃখের সহিত ভিকু উত্তর দিল, "বড্ডই রাগ হয়েছিল পিসিমা, পাছে কেউ দেখতে পায় বলে, তেতলার ছাদে গিয়ে শুয়ে পড়েছিনু, যখন বাবা কি কাপড় শুকুতে দেবার জন্যে ছাদে গিয়েছিল, তার কাছে ঐ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে আসছি। লাফিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে পা-টা ছিঁড়ে গেল। অমনি—"সে নিজের ডান পা ঈষৎ তুলিয়া সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। দেবী দেখিল আঘাত-বিক্ষত নখের মুড়ি দিয়া সত্য সত্যই রক্তপাত হইতেছে!

মৃদু ভৎর্সনার স্বরে দেবী বলিল "রাক্ষুসী কোথাকার! নিজের হাত পা গুলোর ওপোরো ছাই দুখ-দরদ্ নাই? যা এখনি পায়ে জলপটি দিগে যা,—হাঁরে ভিকু শোন, রাগটা এখন পড়েছে?—"দেবী স্মিতমুখে ভিকুর পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

"যাঃ—ও!" বলিয়া দেবীর হাত ছাড়াইয়া ভিকু ছুটিয়া পলাইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আমার স্বামীর স্মৃতিকথা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

এইরূপ বলিবার তাহারা একটা উপলক্ষ্য পাইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকল মেয়েরাই পিছনের উঠানে বসিয়াছিল, আমি বাকঘরের ঘুলা ঝাঁট দিতেছিলাম। আধা-আধি ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে, সেই জঞ্জালের মধ্যে ইংরেজী সংবাদপত্রের একটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। প্রথমেই আমার ছেলেমানুষির দরুণ,—কোন এক বিষয় আরম্ভ না করিয়াও তাহা করিতে আমি সমর্থ এইরূপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটাটা নীচে রাখিয়া

সেই কাগজের টুক্‌রোটা হাতড়াইয়া পাতড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথম বই আরম্ভ করিয়া পুরা পনেরো দিনও হয় নাই, ইহার মধ্যে কি আমি ইংরাজী পড়িতে পারি? কিন্তু কেবল পাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অক্ষরগুলিই দেখিতে লাগিলাম। আমি যে নীচের ঘরে আছি তাহা আমার মনেই ছিল না। এই সময় আমার উপর আমার দিদি শাশুড়ীর নজর পড়িল। তিনি নিকটে আসিয়া চুপি চুপি মেয়েদের ইশারা করিবা-মাত্র দুই তিন জন দরজার কাছে আসিয়া আমাকে দেখিল; কিন্তু আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। আমার নিজের খেয়ালেই ঐরূপ নিমগ্ন আছি দেখিয়া আমার ননদের খুবই রাগ হইল এবং সে চড়া গলায় আমাকে বলিল—"তোমার আপি[illegible] দোতালায়। সেখানে গিয়ে তুমি পাঠ কর, কি ন[illegible] কর—যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু খবরদার আমাদের অপমান কোরো না! আমাদের প্রথম বৌদিদি কি ছিল না? তাকে দাদা লেখা পড়া সব শিখিয়েছিলেন। সে আমাদের এক-বয়সী ছিল, তবু সে আমাদের সামনে এমন কি এক অক্ষরও পড়েনি। তাকে ইংরেজী শেখা-বার জন্য দাদা খুবই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে বেচারীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ত তাঁরই স্ত্রী ছিল। তাকে কোন বিষয় দশবার বললে তবে সে একবার করত। কিন্তু হাজার বল্‌লেও সে এ রকম বেহায়াপনা করত না।" পদে পদে এই রকমের খোলচাল চলিত। এইজন্য, ইংরেজী শিক্ষা কেন আরম্ভ করিলাম এইরূপ মনে করিয়া সময়ে সময়ে আমার কান্না আসিত ও কখন কখন খুব বেশী হইলে একান্তে গিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু এ কথা আমার স্বামীর কাছে একটুও বলি নাই। কারণ আমি যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসি তখন বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই উপদেশ দিয়ে-ছিলেন "দেখ, তুই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস। আপনার সপত্নী কুটুম্ব সম্পর্কের দশরকম মানুষ আছে। তুই আমার মেয়ে। যতই কষ্ট হোক না, নিজ কুলীন বংশের যোগ্য আচরণ করে সব সহ্য করবি। এমন কি চাকর-বাকর-দের কথাতেও পাল্টা জবাব দিবিনে। এই এক কথা আর এক কথা মনের কষ্ট অসহ্য হলেও, কারও নামে লাগিয়ে স্বামীর কাছে বলতে যাসনে। লাগালাগি করাতে শুধু পরিবার কেন—রাজাও বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমি বলচি, এই দুই ব্রত পালন করলে তোর কখনই কোন অভাব হবে না। তুই ভাগ্যবতী। সমস্ত থাকলে তোর বুদ্ধি আরও বাড়বে ও আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ তোর সার্থক হবে। আমার এই কথা-গুলি মনে রাখিস। এর মধ্যে কিছু করেছিস শুনতে পাই, তাহলে আর কখনই তোকে আমার বাড়ী নিয়ে আসব না।" আমার পিসী বড়ই কড়াকড় ও বুদ্ধিমতী লোক বলিয়া আমার বিবাহ ব্যাপারে তাঁর কথাগুলি আমার মনে খুব বসিয়াছিল। তাই এই দুই ব্রতই আমি পালন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। ইহার দরুণ আমার খুব কষ্ট করিতে হইয়াছিল।

এই ব্রত পালনের দরুণ আমার কান্না ও শুষ্ক মুখ যাতে আমার স্বামীর নজরে না আসে এইজন্য খুব সহ্য করে থাকতে হত। তবু তাঁর নজরে আসিত। মনুষ্যের যাতনা বা কষ্ট বেশীমাত্রায় হইলে, কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা ভিন্ন মন হালকা হয় না এইরূপ উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার সুযোগ না হওয়ায়, সমস্ত দিনের কষ্টে সন্ধ্যা-কাল পর্য্যন্ত যেন কোড়া-কাটার মত বোধ হত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, রাত্রে দোতালার ঘরে গেলে পর এই সব কথা আমি একেবারেই বিস্মৃত হইতাম। যেন কখন দিন কোন কষ্টই হয় নাই। যাক্। "আগে অমুক সময়ে তোমাকে ওরকম কেন দেখা যাচ্ছিল? কেউ কিছু কি বলেছে? যেন কাঁদছিলে এই রকম মনে হচ্ছিল" এ-রূপ অনেক কথা আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও, "আমার ছোট ভাই বোনদের মনে পড়েছে, মাকে মনে পড়েছে এই রকম" কোন কিছু বলিতাম। কারণ, একবার যদি অন্য কিছুও বলি, তাহা হইলে তিনি সেই সূত্র ধরিয়া সব কথা বাহির করিয়া লইবেন, অগত্যা আমার মুখ হইতে সহজে বাহির হইয়া যাইবে।" যাহাই হউক না কেন, ইহার দ্বারা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে; তাছাড়া আমাদের প্রকৃত সুখশান্তির সময়টা এই সব

কথার বড়টা অতিরঞ্জিত হইবে, ততটাই আমাদের সুখের হ্রাস হইবে? আর তাঁকোন লাভ নাই, এই রূপ আমার ধারণা হইয়াছিল। তথাপি, আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের স্বভাব আমার স্বামীর ভাল রকম জানা থাকায়, আসল ব্যাপারটা কি, তখন তাহা অনুমান করিয়া লইতেন এবং তদনুসারে আমায় বুঝাইতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহার সেই প্রীতিপূর্ণ শান্তিপ্রদ কথাগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার মনের উপর এরূপ কাজ করিত যে, সমস্ত দিনের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া আমার মত সুখী কেহই নাই এইরূপ মনে করিয়া সকাল পর্য্যন্ত আনন্দে থাকিতাম। সকালে, নীচে যাইবার সময় আবার আমার আতঙ্ক হইত। তখন আমার স্বামী আমাকে সাহস দিয়া বলিতেন যে "এ[illegible] সহ্য করতে শিখবে; উত্তর না দিলেই হইল। আ[illegible] কি তোমাকে তিরস্কার করে কখন কোন কথা বলি? আর কেউ কিছু বল্‌লে তুমি কেঁদো না।" এই রকম সাহস দিবার পর, সমস্ত দিনটা বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইত। এই উপদেশ অনুসারে আমাদের বাড়ীর সব মেয়েদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বাক্যযন্ত্রণা সমস্তই সহ্য করিতাম, কিন্তু পাঠাভ্যাস ছাড়ি নাই। এই সমস্ত যখন সহ্য করিতাম, আমার দুই দেবর, এই কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে, আমার প্রতি মমতা ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাকে বলিত,—"বড় মেয়েরা যখন রাগ করবে তখন তুমি ভয় পেয়ো না।" এই বলিয়া তাহারা আমাকে সাহস দিত ও আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট নানা কথা বলিত। আমি যে সমস্ত সহ্য করিতাম, আমার স্বামীপ্রদত্ত প্রীতিপূর্ণ গম্ভীর উপদেশই তাহার মূলীভূত কারণ। এইরূপ না হইলে এমন্বিধ কষ্ট যন্ত্রণা, আমার মত অল্পবয়স্কা ও অল্পবুদ্ধি মেয়ে কখনই সহ্য করিতে পারিত না; অথবা গৃহে বাস করিবার মত সুখশান্তি থাকিত না। কারণ আমার মন ক্রমাগত কষ্ট পাইয়া সর্ব্বদাই উদাস থাকিত। বাহিরের লোক যতই সহানুভূতি করুক বা না করুক,—ভালবাসার লোকেরা পরস্পরকে যেমন সহজে ও ভাল রকমে চিনিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

তাই, আমার স্বামীরও খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার মনের শান্তি কমিয়া গিয়াছিল। এবং এইরূপ ভাবে যদি আরো কিছু দিন চলিত, তাহা হইলে, এই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পুণ্য বল ছিল বলিয়া, সেরূপ কোন বিভ্রাট না ঘটিয়া, শীঘ্রই "নাসিকে" আমাদের বদলী হইল। কিন্তু এই বদলীর দরুণ, আমার স্বামীর ও পুণ্যানগরস্থ মিত্রমণ্ডলীর মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাঁহাদের ভাল লাগিল কি খারাপ লাগিল; এই এক বদলী করিবার দরুণ সরকার-বাহাদুরের কত উলট-পালট করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় আমার কল্পনাতেও আসে নাই। আমাদের বদলী নাসিকে হইয়াছে, এখন আমরা সেইখানে যাইব। সেইখানে এরূপ করিব, ঐরূপ করিব প্রভৃতি ভাবী আনন্দের কল্পনায় দুই এক সপ্তাহ মগ্ন হইয়া ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমরা দুজন ও "আধা" ভাই আমরা নাসিকে গেলাম। ইচ্ছা করিয়াই বড় মেয়েদিগের কাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল না। তাহার দরুণ আমার স্বামীরও শিখাইবার উৎসাহ বেশী হইল, এবং আমাদের উভয়েরই আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নাসিকে যাইবার পূর্ব্বে পুণার কিছু বৃত্তান্ত দিতেছি।

১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে পুণার সার্ব্বজনিক আন্দোলনের একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল। মল্‌হার রাও গায়কবাড়ের বিষপ্রয়োগ মোকদ্দমার, মোকদ্দমা চালাইবার খরচা সংস্থান (State) মঞ্জুর করে নাই, তথাপি এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ দিবার জন্য পুণা প্রস্তুত। মহারাজা শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবেন, এই মর্ম্মে, পুণার লোকেরা বড়োদায় তার পাঠাইলে, এই বিষয়ের উপর সরকারের কড়া নজর পড়িল। বলা বাহুল্য, এই সময় সার রিচার্ড টেম্পলের শাসন-কাল ছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মূলে কেহ আছে ভাবিয়া কোন বরিষ্ঠ কর্ম্মচারী জেলিয়ার ন্যায় জাল ফেলিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতেছিলেন। কোন উপায়েই স্পষ্ট সন্ধান না পাওয়ায়, কোন বিশেষ মণ্ডলীকে সরকার-বাহাদুর সংশয়দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এবং পুণায় এই সমস্ত আন্দোলন থামাইবার জন্য পুণা হইতে কোন বিশিষ্ট মণ্ডলীকে

উঠাইয়া লইতে হইবে এইরূপ মৎলব করিয়া, এখান হইতে আমাদিগকে বদলী করিবার জন্য, তিন বা পাঁচ বৎসরের পর একই সহরে একই জায়গায় থাকিবে না—বোম্বাই এলাকা সংক্রান্তে এই নূতন আইন প্রয়োগ করিয়া, তদনুযায়ী আমাদিগকে বদলী করা হইল। এই বদলী হইবার চারি মাস আগে কোন এক বিদেশী গৃহস্থ মুষাফেরের ভাণ করিয়া পুণায় আমরা অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার ছোট বড় বিদ্বান অবিদ্বান প্রাচীন ও নব্য অনেক লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—বাহ্যতঃ এইরূপই দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহার অন্তরে কি অভিসন্ধি ছিল সে তিনিই জানিতেন। তিনি যে বাসায় ছিলেন, তাহারই এক কামরায় পান সুপারীর থা[illegible] পানের খিলী, চুরোট দশ পঁচিশ, "পত্রিকা"-তাস, দা[illegible] বেজিক্, ও সেতার এই সমস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আমাদের পুণার মণ্ডলী এই বিষয়ে একটু বেশী আসক্ত সত্য। ইহার দরুণ তাঁহার বেশ সুযোগ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন মধুমক্ষিকার ন্যায় সেখানে একেবারে লাগিয়াই থাকিত। ইহাকে অনুসরণ করিয়া কতকগুলি লোক সকাল সন্ধ্যায় ঐ গৃহস্থের ঘরে আড্ডা করিল। এই সব লোক কোন-না-কোন খেলায় একেবারে নিমগ্ন থাকিত। এই মণ্ডলীর মধ্যে সীতারাম-হরি চিপড়ুনকরের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছিল। তিনি এই সময় সার্ব্বজনিক সভার সেক্রেটারী ছিলেন, এবং সভার ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধ লিখিয়া লইবার জন্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ী আসিতেন। কিন্তু আজ কাল ঠিক সময়ে আসিতেন না, দেরীতে আসিতেন। কাজ কর্ম্মে তাঁহার খুব দৃঢ়তা ছিল, কখন ক্লান্ত হইতেন না। কিন্তু আজকাল একটু আলস্য করিতে দেখিয়া, ও জাগাইয়া দিবার জন্য, আমার স্বামী সীতারামপন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল তোমার কি-রকম ভাবগতিক?" তখন, তিনি এই ভদ্রলোকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। কিন্তু আমার স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমার স্বামী নিজেই তাহার খোঁজ খবর লইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং "আমাকে না জানাইয়া সেই ব্যক্তির সহিত সার্ব্বজনিক সভা সম্বন্ধে কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না, নিরর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবে। ঐ ব্যক্তি একজন পোয়েন্দা এইরূপ আমার অনুমান হয় ও তাই ঠিক"—এইরূপ আমার স্বামী বলিলেন। একদিন, কতকগুলি লোক আমাদের বাড়ী আসিলে তাঁহারা এই নবাগত ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"এই আগন্তুক ভদ্রলোকটি ভারী সৌখীন, সদানন্দ, মিশুক ও বিদ্বান।" তখন আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার নাম ধাম কি? কোথায় থাকেন? এখন কি কাজ করেন? লেখা পড়া কতটা জানেন? এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাদের জানা আছে কি?" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল—"লোকটি ভারী লাজুক ও মুখচোরা। নাম, ধাম, ব্যবসায় ও কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা হয়েছে, এ সমস্ত তিনি কিছুই বলেন না, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কেবল হাসেন, আর বলেন—আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার নাম ধাম জেনে তোমাদের কি হবে? এইরূপ বলে' তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন; কিন্তু কিছুই বলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনম্রী বলিয়া আমাদের এই প্রশ্নগুলি তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি যে ভাল বংশের লোক ও বিদ্বান তা বেশ মনে হয়।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন—"তোমাদের অনুমান অনুসারে ঐ ভদ্রলোকটি সজ্জন ও বিদ্বান্; কিন্তু আমি বলি, তোমরা যা বলচ তা ঠিক কি না, আগে অনুসন্ধান করে আমাকে বল, তারপর অন্য কাজ কর; কিন্তু ইনি কে, তোমরা খোঁজ করে জানবে। কাল সকালে উঠেই উঁহার ডাকের পত্রাদির খোঁজ নিও। পত্রের উপর কোন্ গ্রামের ছাপ থাকে, ইনি যে পত্র পাঠান, তাহা কোন গ্রামে যায় এই সমস্ত ভাল করে দেখে, দুই একদিনের মধ্যে এখানে এসে আমাকে জানাবে।" তাঁহারা "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তৃতীয় দিনে সকাল বেলায় সীতারামপন্ত চিপলুনকর আসিয়া বলিলেন—"পরশু ও কাল আমি ডাক-পত্রের সমস্ত খোঁজ নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকের ডাকের চিঠি ডাকঘরওয়ালার হাত দিয়ে আসে না। তিনি প্রভাতে উঠে বেড়াতে যাচ্ছি বলে বাহিরে যান। তিনি

প্রথমে এক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে, তারপর আর একটা বাঁকা রাস্তা ধরে শেষে জেনারেল পোষ্ট আফিসে যান—সেখানে গিয়ে ডাকের চিঠি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দেন। কাল আমি অনেকটা অন্তর থেকে, তাঁর পিছনে পিছনে চলেছিলুম। তাই, যেতে যেতে পথের মধ্যে তাঁর এক ছেঁড়া পত্রের মোড়ক কুড়িয়ে পেলুম। মোড়কের উপর সিমলার ছাপ আছে। সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার যে সংশয় হয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে—আমাদেরও এখন মনে হচ্ছে।" তাছাড়া, আমার এক পোষ্ট আফিসের বন্ধু আমাকে এখনই বল্লেন, "এই ভদ্রলোকটির পত্রব্যবহার, কলিকাতা ও সিমলার গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে চলছে এইরূপ মনে হয়। কারণ, তাঁর নামে এঁর অনেক চিঠিই যায়।" এতটা হইবার পর, এই সব কথা আমাদের সমস্ত লোকের কা[illegible] আসায়, সকাল বেলায় ও সকাল হইতে পর দিনের সন্ধ্যাকালে এই ভদ্রলোকটির ঘরে পূণার যে সব লোক আসিয়া জমিত, তাহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহা হইতে লোকেরা ধরিয়া পড়ায়, তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার আসল স্বরূপটা বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মনে করিয়া, পাছে তাঁর অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, "বিদেশী মুসাফেরের" ছদ্মবেশী এই ভদ্রলোকটি কাহাকেও না জানাইয়া তৃতীয় দিনের রাত্রে বোচকা বুচকি লইয়া সিট্টান দিলেন।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দয়ানন্দ সরস্বতীর আগমন। (পৃঃ ১৮৭৫)

লাহোর হইতে স্বামীজীর পূণায় আসা অবধি, "বুধ-বার" অঞ্চলে বেলবাগের সম্মুখস্থ "ভিড়" মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিদিন বক্তৃতা হইত। আমার স্বামীর সায়াহ্নের আড়াই ঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেই অতিবাহিত হইত। বক্তৃতা শেষ হইলে, দয়ানন্দজী স্বস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, তাঁহার সম্মানার্থ একটা মিছিল বাহির করা যাইবে, এইরূপ একদিন আমাদের গৃহে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া স্থির করিলেন। এবং ইহা দুই তিন দিন পূর্ব্বে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ইহা জানিবার পর বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা ইহা লইয়া খুব ঘোঁট করিতে লাগিল। এই সময়ে বিরুদ্ধপক্ষ অর্থাৎ গ্রাণ্টীক্ষিত আপটে শাস্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান হওয়ায় তাঁহার সহিত গ্রামের অনেক লোক ছিল। এই সুযোগ পাইয়া আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জিনিষটা কি—এসম্বন্ধে কোন চিন্তা পর্য্যন্ত যাহাদের মনে আদৌ প্রবেশ করে নাই এরূপ কতকগুলি লোক এই সময়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত মিলিয়া দয়ানন্দজীর ও তাঁহার পক্ষের মানহানি ও বিড়ম্বনা যাহাতে কোন রকমের হয় সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শেষে তাহাদের বুদ্ধি অনুসারে তাহারা শকুনী মামার মত এক মৎলব আঁটিল। সেই মৎলবটা সবার খুব পছন্দ হইলে পর, তাহার পরদিন উহা আমলে আনিবে বলিয়া স্থির করিল। এইরূপ উত্তম-রূপে দয়ানন্দজীকে অপমান করিবার যুক্তি স্থির হইলে, ঐ সকল লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাল কখন রাত পোহাইবে, কখন এই যুক্তি আমলে আনিবে এই চিন্তাতেই তাহারা মগ্ন ছিল। এদিকে অপর পক্ষের লোকেরা আমাদের বাড়ীতে একত্র হইয়া কালই মিছিল বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পরদিন সকালে ৬টার পূর্ব্বে, বরাবর ব্যাণ্ড ও ২০।২৫ জন পৌরার লোকের ঠাটসহ সুসজ্জিত "পর্ণভানন্দাচার্য্যের পোরারী" কালো পাথরের জলের-হাউজ হইতে যাত্রা করিয়া সহরের ভিতর দিয়া বাহির হইল। যেখানে সেখানে ঠাট্টা তামসা ও হাসহাসি সুরু হইল। প্রায় সাড়ে ৬টা কিংবা সাতটার সময় এই খবর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছে এইরূপ কতকগুলি লোক এই সমারোহ ব্যাপারের উত্তমরূপে বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া এই সমস্ত লোকেরও খুব হাস্যোদ্রেক হইল। অবশ্য ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ চেষ্টা আছে। তখন যাহাতে দয়ানন্দের উপর কোনরূপ আক্রমণ না হয় তার জন্য বেশী রকম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, এইরূপ স্থির হইল। একদল পুলিস আনাইবার জন্য গঙ্গারাম তাউ প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অনু-

মোদিত হইবামাত্র তিনি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিলেন। এদিকে পর্দানসীন মিছিল যাহা সকাল ৬টা হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সারারাত্রে ৬টা পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে চলিতেছিল। যে সকল লোক মিছিলের সঙ্গে ছিল তাহারা "শ্রীরামানন্দ স্বামী কি জয়" এইরূপ জোর গলায় প্রত্যেক ৩।৪ পদ অন্তর জয়ধ্বনি করিতেছিল। শোভাযাত্রার অনুগামী লোকেরা ইহা পর্দানসীনের মিছিল বলিয়া কতদূর জানিত কে জানে। পরদিন দয়ানন্দ স্বামীজী আসন পাতিলেন, কি সমাধিতে বসিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন, জানা গেল না। এই রকমে চারিটা বাজিল, ৪॥০টা হইল, সবাই "ভিড়" মহাশয়ের বাড়ীতে রীতি-অনুযায়ে বক্তৃতা শুনিতে সমবেত হইল। স্বামী দয়ানন্দজী একজন উচ্চ সরল বক্তা ছিলেন। তাঁহার বাণী শক্তির ছিল, তাঁহার ভাষণপদ্ধতি খুব মর্ম্মস্পর্শী ও কখন কখন আলঙ্কারিক হইত। তাহার দরুণ, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাহারা আদিত তাহারা একেবারে তন্ময়ীন হইয়া যাইত। স্বামী দয়ানন্দজী স্বীয় অলঙ্কৃত বক্তৃতা শেষ করিয়া কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং এতদিন তাঁহার বক্তৃতা সকলে মন দিয়া যে শুনিয়াছে ও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে তজ্জন্য তিনি অল্প কথায়, আলঙ্কারিক ও বিনোদী ভাষায়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পান সুপারি মালা প্রভৃতি স্বামীজীকে অর্পণ করিবার পর, স্বামীসহ সমবেত মণ্ডলী নীচে নামিয়া আসিলেন। রাস্তার উপর হাতী পাল্কী প্রভৃতির ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। সেই পাল্কীর মধ্যে গ্রন্থ রাখিয়া ইঁহারা দয়ানন্দজীকে হাতীর উপর বসাইলেন এবং মিছিল আরম্ভ হইবামাত্র উপরি উক্ত বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকেরা এই সমারোহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও ভীড় করিয়া আবুল-তাবল যা তা বলিতে লাগিল ও চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। এই পক্ষের উৎসাহদাতা ভদ্র ও কুটিল লোকেরা সভ্যতার খোলস পরিয়া কিছু দূরে, স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল; এবং আক্রমণকে দাঙ্গা করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিল। সেই দিন খুব বৃষ্টি পড়ায়, রাস্তায় কিছু কাদা হইয়াছিল। এই দাঙ্গার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কিংবা কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া, এই মিছিল ঢিমা চালে চলিতেছে দেখিয়া ঐ সব গ্রাম্য গুণ্ডারা নিরাশ হইয়া চটিয়া উঠিল। স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান প্রতিনিধিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠায়, যার হাতে যা ছিল তাহাই শোভাযাত্রার লোকের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের হাতে কিছু ছিল না, তাহারা উপর নীচে হইতে কাদার গোলা তৈরী করিয়া, তাহাই ঐ সকল লোকের পিঠের উপর দমাদ্দম মারিতে সুরু করিল। মিছিলে আমাদের পক্ষের লোক এত ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, কাদার গোলা পিঠের উপর ও পায়ের উপর ধপাধপ পড়িতেছে তবু কেহ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মিছিলের লোকেরা শান্তভাবে চলিতে লাগিল। পুলিসের লোক যাহারা ছিল তাহাদিগকে এরূপ বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে না বলিলে যেন ইহারা ভিতরে না আসে, মিছিলের সহিত শুধু মিছিলের দলই থাকিবে। দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া কাদামাটি ফেলিবার পর, "আদিত বাজের" চৌকা হইতে "দারুওয়ালা"র পুল পর্য্যন্ত মিছিলের ঠাট পৌঁছন পর্য্যন্ত এই কর্দ্দম নিক্ষেপকারী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাঠি ও পাথর ফেলিতে সুরু করিল। তাহার দরুণ যদিও কোন প্রধান লোকের অনিষ্ট হয় নাই তথাপি শুধু পাঁচ ছয় জন গরিব লোকের গায়ে আঘাত লাগিয়াছিল ও তাহারা জখমও হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া পুলিস আসিয়া পড়ায় এই গুণ্ডালোকেরা পলাতক হইল। এবং তাহার পর এই শোভাযাত্রা শান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঔষধোপচার করিবার জন্য জখমী লোকদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইল। তাহার পর, আল্লার স্বামী বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কাপড় চোপর কাদার গোলায় স্থানে স্থানে ভরিয়া গিয়াছে; তখন সমস্ত কাপড় ফেলিয়া অন্য কাপড় পরিলেন। কাপড় ছাড়িবার পর নিকটস্থ ঘরের লোকেরা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল পুলিস বরাবর সঙ্গে ছিল তবু তাঁর কাদা লাগিল কি

করিয়া ? তখনই তিনি হাসিয়া বলিলেন.—"কেন লাগিল ? সকলের মধ্যে আমি যখন ছিলুম তখন আমার পায়ে লাগবে না কেন ? মশামাছির কাজে এইরূপ ই হয়ে থাকে। অপর পক্ষের লোকেরা ছোটই হউক কি বড়ই হোক্, তারা কি কারও পরোয়া রাখে ? এই সমস্ত মান-অপমানের বিচার আমাদের মনেই না আসবে কেন ? এই সব বিষয় এই রকম করেই চালাতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দু ধর্ম্ম।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম।

পাপ পুণ্যের বিচার করিতে যাইলেই কর্ম্ম ও অকর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রশ্ন উঠে। এগুলির নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু সংসারে সকল সময়ে এই নীতির আশ্রয় করিয়া লোক চলিতে পারে না। মানবের মধ্যে সু ও কু উভয় আছে। যদি সকল সময়েই উক্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া চলা যায় তবে স্থলবিশেষে ধর্ম্মও অধর্ম্মে পরিণত হয়। মনে কর অহিংসা একটী পরম ধর্ম্ম। কিন্তু কোন শত্রু আসিয়া তোমার পরিবারবর্গকে আক্রমণ করিল, তখন তুমি কি অহিংসা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই আক্রমণকারীকে ছাড়িয়া দিবে ? যদি এরূপ কর তবে অহিংসা ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত হইল। সত্যের উদাহরণ দিতেছি। মনে কর কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কোন বদমায়েস বধ করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে। সে প্রাণভয়ে কোন স্থলে লুক্কায়িত হইল। অনুসরণকারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! অমুক ব্যক্তিকে এই দিকে যাইতে দেখিয়াছেন কি ? তুমি যদি সেই ব্যক্তির লুক্কায়িত স্থান জান তবে কি তুমি সত্যের আশ্রয় করিয়া সেই গুপ্ত স্থান দেখাইয়া দিবে ? যদি তুমি না বল তবে তোমার মিথ্যা বলা হইল এবং যদি বল তবে নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ যায়। এরূপস্থলে কি করা কর্ত্তব্য ? মহাভারতের সত্যানৃত অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছিলেন যে যদি মিথ্যা বাক্যে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে মিথ্যা বলাই শ্রেয় এবং যদি বলা আবশ্যক হয় তবে এরূপ স্থলে সত্য বলাই প্রশস্ত। (মহা. অধ্যায় ১০৯।১৩।১৬) যদ্দ্বারা লোকের হানি হয়, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অথবা তাহা অহিংসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মহাভারতে অনুশাসন আছে যে পরিহাসের সময়, স্ত্রীগণের সহিত, বিবাহ সময়ে প্রাণাত্যয় কালে, সর্ব্বস্ব রক্ষার্থে, মিথ্যা বলা পাপ নহে। (মহাভারত আদি ৮২।১৬ এবং শান্তি পর্ব্ব ১০৯) একথা মনে করিও না যে রমণীগণের নিকট সত্য করিবে না। শাস্ত্রকার স্থলবিশেষে মিথ্যা বলিবার আজ্ঞা দিয়াছেন মাত্র। সে স্থলটী কিরূপ ? যখন সত্য সর্ব্বভূত-হিতের বিরোধী। কিন্তু তথাপি যেরূপ স্থলে যে সামান্য পাপ অর্শে তাহা নিরাকৃত করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। মোট কথা এই যে, কোন একটি নীতিসূত্র ধরিয়া সংসারে চলা যাইতে পারে না। সেই জন্য কার্য্যের পরিণাম এবং দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা চাই। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম মতে যাগ যজ্ঞই কর্ম্ম, ইহা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, চাই ইহা অজ্ঞানতার সহিত অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর। এই যাগ যজ্ঞ ব্যতীত চাতুর্ব্বর্ণের ভেদানুসারে আবশ্যক কর্ম্ম মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত পুরাণে ব্রত ও উপবাসাদি কথিত আছে। এই পুরাণকথিত কর্ম্মেরও তিনটি ভেদ আছে, যথা নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য। মোট কথা মানব সংসারে যাহা কিছু করে তাহাই কর্ম্ম নামে খ্যাত। চাই তাহা কায়িক, বাচিক এবং মানসিক হউক (গীতা ৪।৮।৯) তবে কর্ম্ম বলিলে "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" বা "বিহিত কর্ম্ম" বুঝাই উচিত (গীতা ৩।১৬) । এই কর্ম্মের দুইটি মার্গ আছে, যথা নিবৃত্তিমার্গ এবং প্রবৃত্তি মার্গ। সাংখ্য নিবৃত্তি মার্গ এবং যোগ প্রবৃত্তি মার্গ। এই দুই মার্গ লইয়া গীতায় সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাস বলে তাপসকে এবং যোগ বলে মিশ্রনকে। পাপ-পুণ্যে অলিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিবার যে সমত্ব-বুদ্ধি (গীতা ২।৫০) তাহাই গীতোক্ত যোগ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে:—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্য পরিপন্থিনৌ॥

গীতা ৩।৩৪।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্বীয় স্বীয় উপভোগ্য অথবা ত্যাজ্য পদার্থ বিষয়ে যে প্রীতি বা দ্বেষ তাহা স্বাভাবিক। ইহার বশ হওয়া উচিত নহে। কারণ রাগ এবং দ্বেষ আমার শত্রু।

যাহা করিবে তাহা আসক্তি বিরহিত হইয়া করিবে। তাহাতেও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের তারতম্য লঘুতা গুরুতা দেখিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিবে। (মহা, বন ১৩১।১১-১২ এবং মনু ৯।২৯৯) ইহাই কর্ম্ম যোগ।

কর্ম্ম কেন করি।

মানব যাহা কিছু করে তাহা সুখের জন্য করে। ঐহিক সুখই মানবের পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং সুখ প্রাপ্তির লঘুতা ও গুরুতা দেখিয়াই কার্য্য করা উচিত। এবম্ভূত কথা কেবল স্বার্থসুখবাদিগণই বলিয়া থাকেন। ইহাদের মতে পরলোক এবং পরোপকার সবই মিথ্যা—স্বার্থই সত্য। এরূপ মতের নেতা চার্ব্বাক। রামায়ণে জাবালি অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তে রামচন্দ্রকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভারতের (মহা, আ ১৪২) কণিকনীতিও এই মার্গমূলক। সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ ধর্ম্মই হউক বা পরোপকারই হউক—তাহা আমার উপভোগের জন্য। আমি ছাড়া দুনিয়া নাই। স্বার্থবাদীদিগের একদল বলেন যে স্বীয় সুখ প্রধান হইলেও যদি তাহা অন্যের সুখভোগে বাধা দেয় তবে অন্যেও স্বীয় সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। মনে কর যদি স্বীয় সুখের জন্য আমি অন্যকে বধ করি তবে তাহার কুটুম্বরাও ক্রোধে আমাকে হনন করিবে, সুতরাং আমার সুখভোগের অন্তরায় ঘটিবে। ততএব পরের স্বার্থের সহিত আমার স্বার্থ বিজড়িত। এই স্বার্থ-বিজড়িত হইয়া সংসারে পরোপকার, দয়া, মমতা, ইত্যাদি গুণের সৃষ্টি হইয়াছে। পরার্থকে যিনি নিজের স্বার্থ করিয়াছেন তিনিই সর্ব্বোত্তম পুরুষ। মানব মাত্রেরই সুখপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য হইলেও শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। এই প্রকার সুখকে শান্তি বলে। কঠোপনিষদে লেখা আছে যখন মৃত্যু নাচিকেতাকে পুত্র, পৌত্র, পশু, ধান্য, ভূমি ইত্যাদি অনেক প্রকারের সাংসারিক সুখ দিতে উদ্যত হইল তখন নাচিকেতা বলিলেন যে আমার আত্মবিদ্যা আবশ্যক—আমি সম্পত্তি চাহি না। সুতরাং ইন্দ্রিয়সম্য বাহ্য সুখাপেক্ষা বুদ্ধিগম্য আন্তরিক সুখের শ্রেষ্ঠতা অধিক। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শারীরিক সুখ দুঃখকে আধিভৌতিক এবং মানসিক সুখদুঃখকে আধ্যাত্মিক বলা যায়।

সুখ দুঃখ কিরূপে হয়।

মহাভারতে আছে যে তৃষ্ণার প্রভাবে দুঃখের উৎপত্তি এবং সেই দুঃখের পীড়ার দ্বারায় সুখ উৎপন্ন হয়। (শা ২৫।২২) মনে কর, একটি বাসনার সৃষ্টি হইল, তদ্দ্বারা দুঃখ ঘটিল। তখন মানব সেই দুঃখ নিবারণ করিল—ইহাই সুখ নামে অভিহিত। এরূপ মতের যাহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে সাংসারিক প্রবৃত্তি মাত্রেই বাসনাত্মক। যতক্ষণ সাংসারিক কর্ম্মকে ত্যাগ না করা যায় ততক্ষণ বাসনা বা তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত হয় না এবং যতক্ষণ না তৃষ্ণা বা বাসনার মূল নষ্ট হইবে ততক্ষণ নিত্য সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২ এবং বেদান্ত সূত্রে ৩।৪।১৫) যদি বাসনাই দুঃখ হয় তবে পৃথিবীতে দুঃখ বই আর কিছুই নাই। কিন্তু তা বলিয়া কি তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে গিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা নহে। ত্যাগ মন্ত্র উপভোগ করিবার শক্তি ইন্দ্রিয়ের আছে। এই ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া কালে যদি অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হয় তবে সুখ দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। এইরূপ বিষয়প্রাপ্তি ইচ্ছা থাকিলেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং না থাকিলেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য গীতা (২।১৪) বলিয়াছেন যে, মাত্রাস্পর্শ

হইলেই শীত, উষ্ণ আদি অনুভব হইতে সুখ দুঃখের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির বাহ্য পদার্থকে মাত্রা বলে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে সুখ দুঃখের জন্য বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া আবশ্যক কিন্তু সুখ দুঃখের অনুভবের জন্য মনের সাহায্য আবশ্যক করে। যেমন মন অন্যত্র থাকিলে চক্ষু দ্বারা দেখিলেও দর্শন হয় না (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৩।৩) সেইরূপ সুখ দুঃখের অনুভবের জন্য মনের সাহায্য অনিবার্য্য। যদি এ কথা সত্য হয় তবে মনের নিগ্রহে সুখ দুঃখের দমন হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। এই জন্যই গীতা বলেন যে আমাকে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা মনোনিগ্রহের সহিত করিতে হইবে এবং তাহার ফলাশা ত্যাগ করিয়া সুখ দুঃখে সমভাব হইয়া করিতে হইবে। এরূপ করিলে না আমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে আর না আমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। নতুবা ফলাশা প্রাপ্তির বাঞ্ছা রাখিয়া কার্য্য করিলে বিষয়-সঙ্গ নিবন্ধন কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ উৎপন্ন হইবে এবং অবশেষে মনুষ্যের নাশ হইয়া যাইবে (গীতা ২।৬২।৬৩)। অতএব বুঝা যাইতেছে যে অচেতন পদার্থ কর্ম্ম মানবের সুখ দুঃখের হেতু নহে—ফলাশাই সুখ দুঃখের কারণ মাত্র। অতএব কর্ম্মত্যাগের কোন আবশ্যক নাই। গীতার মতে (২।৬৪) যে মনুষ্য ফলাশা ত্যাগ করিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষ্কাম বুদ্ধির সহিত উপভোগ করে সেই ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ। সংসারে কর্ম্ম করিতেই হইবে। প্রকৃতি বলপূর্ব্বক জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে কারণ ইহাই প্রকৃতির স্বীয় ধর্ম্ম। মানুষ কেবল মাত্র অযুক্তি নিবন্ধন সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। অতএব মনোনিগ্রহ পূর্ব্বক ফলাশা ত্যাগ করিয়া সুখ দুঃখে সমত্ব রাখিয়া নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা লোকহিতের জন্য শাস্ত্রোক্ত রীতানুসারে কার্য্য করাই আদর্শ মার্গ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

রমলা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(৫)

অধ্যাপক ও তাঁহার কন্যা।

ডাব্‌ডি বাড়ি নামক রাস্তা ফ্লরেন্সের ইতিহাসে বিখ্যাত। এই রাস্তায় একটী পুরাতন প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বার্ডোডি বাড়ি নামক এক বৃদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি কিছুদিন হইল অন্ধ হইয়াছিলেন। বার্ডোডি বাড়ি ধনিয়াদী বংশের লোক। বাড়ি বংশের লোকের কীর্ত্তিকাহিনীতে ফ্লরেন্সের ইতিহাস মুখরিত। বার্ডোডি বাড়ির আভিজাত্যের অহঙ্কার ব্যতীত পূর্ব্বেকার ঐশ্বর্য্য কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। বার্ডোডি বাড়ি নিজে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য দর্শনাদিতে মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তাহা সুরক্ষিত করা বার্ডোডি বাড়ির জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর একটী বড় পুস্তকালয় ছিল। তিনি সকল সময় প্রাচীন সাহিত্যদর্শন ইতিহাসের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই বার্ডোডি বাড়ির নিকট টিটো মিলিথাকে নেল্লো লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

বার্ডোডি বাড়ির বাড়ীতে তিনি, তাঁহার কন্যা রমলা এবং ভৃত্য মাসো ব্যতীত আর কেহ বাস করিত না।

বার্ডোডি বাড়ি তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকালয়েই সর্ব্বদা থাকিতেন। তিনি একটী টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন। তাঁর পাশে আর একখানি চেয়ারে রমলা বসিত এবং প্রাচীন গ্রীক লাটিন পুস্তক হইতে বার্ডোর অভিপ্রেত বিষয় পড়িয়া শুনাইত। মাসো গৃহস্থালীর কাজ করিত।

নেল্লোর সহিত টিটো মিলিথার সাক্ষাৎ হইবার পর কয়েক দিবস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে পিতাপুত্রীতে পুস্তকালয়ের নিয়মিত স্থানে বসিয়া আছেন। এমন সময় মাসো

সেখানে গিয়া রমলার দিকে তাকাইল। রমলা মায়ের দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া বলিল, এই যে মায়ো ফিরে এসেছ। তা বেশ। আমরা কিছু চাই নাই। মায়ো চলিয়া গেল। রমলা একখানি প্রাচীন লাটিন পুস্তক হইতে পড়িয়া তাহার পিতাকে শুনাইতে লাগিল। এইরূপ পড়িবার সময় বার্ডো তাঁর দুই মুঠার মধ্যে রমলার এক হাত ধরিয়া থাকিতেন। রমলা পড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ এক জায়গায় বার্ডো রমলার হাত ছাড়িয়া দিয়া হাত উঠাইল। রমলা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গ্রীক ভাষায় লিখিত একটী কবিতা পড়িতে উদ্যত হইল। এমন সময় বৃদ্ধ বলিলেন, "রমলা, একটু থাম। আমার নিজের বইখানা দাও ত। আমার বইখানাই বিশুদ্ধ ভাবে লেখা বলে মনে হচ্ছে। আমি তাতে এমন সব টীকা টীপ্পনি দিয়েছি [illegible] এখন সব ভুল শুদ্ধ করেছি যে তা এখন পর্য্যন্ত পণ্ডিত-সমাজে টের পায় নাই। ঐ বইখানা লেখা আমি ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে শেষ করি। সেই সময়ই আমার চোখের নজর খারাপ হইতে আরম্ভ হয়।"

রমলা রাজ্ঞীর ন্যায় পদবিক্ষেপে সেই বৃহৎ কক্ষের একপ্রান্তে চলিয়া গেল।

বার্ডোডি বার্ডি বলিলেন, "দেখতো রমলা, বইখানা ঠিক জায়গায় আছে কিনা?" রমলা বলিল, "হ্যাঁ বাবা! এই ঘরের পশ্চিম কোণে, তৃতীয় দেরাজে, হাড়িয়ানের মূর্ত্তির পিছনে।"

রমলার এ কথা শুনিতে ঈষৎ অবসাদের সুর ধ্বনিত হইল। কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিবার মত লোক সেখানে কেহ ছিল না। রমলা বইখানি লইয়া তাহার পিতার দিকে অগ্রসর হইবার সময় দেখিল যে তিনি বইখানি লইবার জন্য উত্তেজিত ভাবে হাত বাড়াইয়া আছেন। তাহা দেখিয়া রমলার চক্ষু দুইটী করুণায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি তাহার পিতার নিকট গিয়া তাঁর কোলের উপর বইখানি রাখিয়া দিল এবং তাঁর পার্শ্বে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বার্ডো রমলার স্নেহ ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টির কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ব্যগ্র-ভাবে বইখানির আশে পাশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "রমলা, বইখানি এই তের বছরের মধ্যে হতচ্ছাড়া হয়ে গিয়েছে।"

রমলা মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ বাবা, কিন্তু তোমার হাতের লেখাগুলি বেশ কাল আর পরিষ্কার রয়েছে। রোমান আর গ্রীক অক্ষরগুলি কি সুন্দর ঝকঝকে! তোমার হাতের অক্ষর, তোমার কেনা পাণ্ডুলিপির অক্ষরের চেয়ে ঢের ভাল।" এই বলিয়া বইখানি খুলিয়া বৃদ্ধের জানুর উপর রাখিল।

বার্ডোডি বার্ডি বলিলেন, "তাতো ঠিক। ভাড়াটে লেখকের হাতের অক্ষর কি তার অক্ষরের মত হয়? যে ব্যক্তি লাভ লোকসান না খতিয়ে ভক্তি ভাবে লেখে? তার হাতের এক একটী অক্ষর তার গায়ের রক্তের [illegible]। একটু ভুল কি অস্পষ্ট হবার যো নাই।" তার পর রমলা তার পিতার জানুর পার্শ্বে একটী নীচু টুলে বসিয়া তার পিতার কথামত সেই বইখানি নিজের কোলে রাখিয়া তা খানিকটা পড়িল। তারপর পঠিত বিষয়ের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বৃদ্ধ বার্ডো রমলাকে অনেক কথা বলিলেন। তাঁর অভাবে তাঁর পুস্তকালয়টীর কি হইবে, সোবেনজো মরিয়া গেলে কে তাঁহাকে বার্ডির নামে চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিবে, তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র থাকিলে তাহার দ্বারা জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইত, কিন্তু হায় অকৃতজ্ঞ পুত্র সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া তার শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই নষ্ট করিতেছে। সে ছেলে বাড়ীতে থাকিলে তাহার আর ভাবনা কি, তিনি আর কতদিন রমলাকে এমন ভাবে অবিবাহিত রাখিবেন। রমলার বিবাহ শীঘ্র না দিলে চলিতেছে না। এজন্য রমলার ধর্ম্মপিতা বার্ণার্ডো বার্ডিকে কতই বকেন। না, রমলার জন্য যোগ্যপাত্র খুঁজিতে হইবে। তাহা না হইলে আর চলিবে না। ইত্যাদি অনেক কাণ্ডনিই বৃদ্ধ গাহিতে লাগিলেন। রমলার বিবাহ সম্বন্ধে কথা শুনিয়া সে বলিল, "না বাবা, তুমি কি করবে বল? আর চেষ্টা করেই বা কি হবে? তুমি অপেক্ষা কর না। কেউ না কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে।"

বার্ডো বলিলেন, "না বাছা, তা পিতার কর্ত্তব্য নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তা মনে করতেন না। আর এ বিষয়ে ক্রেসেন্সবাসীরা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

রমলা কৌতূহলপূর্ণ চক্ষে বলিল, "কিন্তু আমি খুব মন দিয়া পড়ব। আমি কালাসাণ্ড্রা ফিডিনির মত পণ্ডিত হব। তোমার পুত্রের মত আমি তোমার কাজে লাগবার উপযুক্ত হতে চেষ্টা করব। তাহ'লেই কোন না কোন পণ্ডিত লোক আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন। যৌতুকের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। তিনি তোমার কাছে এইখানে থাকবেন। তিনি তোমার পুত্রের মত হবেন। তাহলেই আমি মেয়ে পরে তোমার দুঃখ থাকবে না।"

বার্ডো রমলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন, "না বাছা রমলা। আমি তা বলি নাই। অকৃতজ্ঞ ছেলেটার ওপোর রেগে তার উদ্দেশ্যে দুচারটা কটু কথা বলে থাকতে পারি, তা বলে একথা কখনই আমার মনে হয় নি যে তুমি আমার স্নেহময়ী কন্যা রমলা না হয়ে আর কিছু হ'লে ভাল হত। কোন্ ছেলে আমার নিত্য অসুখ আমার এমন সেবা করত? তুমি যা লেখাপড়া শিখেছ, এখনকার মেয়েদের পক্ষে তাও বড় কম নয়। তুমি চেষ্টা করলে আর একটু উন্নতি করতে পারতে। কিন্তু তোমার স্মরণশক্তি তেমন প্রখর নয় তবু সুখের কথা এই যে তোমার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে কোন ঝোঁক নেই। মেয়ে মানুষ পোষাক পরিচ্ছদের ঝোঁক আর গহনাগাঁটির চাকচিক্যকেই তাঁদের জীবনের একতারা মনে করে থাকে। তুমি আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার যখন ছ বছর বয়স সেই সময়ে তোমাকে যা দেখেছি। তারপর আমার চক্ষু হারিয়েছি। এখন তুমি সতের বছরের হয়েছ। তোমার ধর্ম্মপিতা বার্ণার্ডো বলেন যে তোমার সৌন্দর্য্য শতগুণে বেড়েছে। তুমি এখন লম্বা প্রায় আমার সমানই হয়ে পড়েছ। এস একটু বেড়াই।"

বার্ডোডি বাড়ির স্নেহপূর্ণ কথায় রমলা খুসী হইয়া তাহার পিতার এক হাতে ধরিয়া উঠাইল এবং তাঁর অপর হাতে একগাছি ছড়ি দিল। বার্ডো এক হাতে ছড়ি লইয়া আর এক হাতে রমলার হাত ধরিয়া সেই ঘরে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতে লাগিলেন এবং রমলাকে পূর্ব্বকালের সম্বন্ধে কত কথাই বলিতে লাগিলেন তার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মাসো সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "নেলো নাপিত যে গ্রীক যুবকের কথা সেদিন বলে গিয়েছিল, তাকে সঙ্গে করে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে এনেছে।"

বার্ডোডি বাড়ি বলিলেন, "আচ্ছা, তাদিকে আসতে বল।" মাসো চলিয়া গেল। এদিকে রমলা তার পিতাকে তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসাইয়া দিয়া তাঁর পার্শ্বে সযত্নে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৬)

আমার সরকার।

আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া মাসো পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। নেলো প্রথমে রমলাকে সসম্মান নমস্কার করিয়া টিটোকে সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া দিল এবং বৃদ্ধ বার্ডোডির দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনার সঙ্গে এই গ্রীক পণ্ডিতের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাঁকে এখানে এনেছি। এঁর নাম টিটো মিলিমা। জাহাজ ডুবিতে ইনি বড় বিপন্ন। আপনার অনুগ্রহ লাভ করতে পারলে ইঁহার অবস্থার উন্নতি হতে পারে।"

যুবক টিটোকে দেখিয়া রমলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কারণ যে সকল পণ্ডিত রমলার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত তারা হয় বৃদ্ধ না হয় প্রৌঢ়। রমলার বুদ্ধি হওয়ার পর হইতে সে তাহার বৃদ্ধ পিতা, তার বৃদ্ধ ধর্ম্মপিতা এবং চাকর মাসো ভিন্ন আর কোন পুরুষ মানুষকে ভাল করিয়া জানিত না। তাহার ভ্রাতার কথা তাহার ভাল করিয়া মনে নাই। তাহার পিতার সহিত যে সকল বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় সাক্ষাৎ করিতে আসিত তাহাদিগের সহিত রমলা অসঙ্কোচে কথা কহিতে বা মিশিতে পারিত না। কোন অপরিচিত পুরুষ দেখিলেই রমলার হৃদয় কেমন কঠিন হইয়া পড়িত। কিন্তু তরুণ যুবক টিটোকে দেখিয়া রমলার

মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। কিন্তু সে তা প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইতে দিল না। টিটো সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রমলাকে অভিবাদন করিল, রমলাও অভিবাদন করিল। রমলার মনে কোন ভাবান্তর হইল না। কিন্তু টিটো যখন রমলার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল, তখন রমলার মন একটু নরম হইল। তারপর যখন নেলো বৃদ্ধ বার্ডোর সহিত কথা কহিতেছেন সেই সময় টিটো সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া রমলার দিকে চাহিল। অমনি রমলার মুখ কিয়ৎক্ষণের জন্য লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে রমলা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু টিটোর চক্ষু রমলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হইল। তা দেখিয়া তাহার প্রতি রমলার মনও একটু নরম হইল। বার্ডো একটু মুরুব্বি [illegible] স্বরে টিটোকে বলিলেন, "আসুন মশায় আসুন। গ্রীক বিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি আমার অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। মশায়, আপনি গ্রীসের কোন্ অঞ্চল থেকে আসছেন? বসুন মশায় বসুন। নেলো বস। আপনি গ্রীসের কোন অঞ্চল থেকে আসছেন মশায়?"

টিটো বলিল, "আমি সব শেষে নপ্‌লিয়া থেকে জলপথে যাত্রা করি। আমি কনস্‌টাটিনোপল এবং থেসালোনিকা এই দুই স্থানেই বাস করেছি। আমি এমন অনেক দেশ দেখেছি, যা তুর্কীবিজয়ের পর হতে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানেরা খুব কম দেখেছেন। তবে আপনাকে একথা বলে রাখা ভাল যে গ্রীসে আমার জন্ম হয় নাই। আমি বারিতে জন্মগ্রহণ করি। আমার জীবনের প্রথম ষোল বৎসর আমি ইটালী এবং সিসিলিতে যাপন করেছি।"

টিটোর কথা শুনিতে শুনিতে বার্ডোর মনে কি হইল বলা যায় না, তিনি একটু ঝুঁকিয়া রমলার দিকে হাত বাড়াইলেন এবং যেন রমলার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিলেন, তারপর মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না। আপনি কি অল্পবয়স্ক?"

টিটো বলিল, "আমার বয়স তেইশ বৎসর।"

বার্ডো বলিলেন, "হুঁ, আপনার পিতা বোধ হয় বাল্যকালে আপনাকে যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজেও বোধ হয় পণ্ডিত ছিলেন।"

বার্ডোর কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে টিটো একটু থামিল। কিন্তু রমলা ও নেলো লক্ষ্য করিল, সে উত্তর দিবার পূর্ব্বে টিটো যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন কোন কষ্টকর বিষয় তার মনে পড়িয়াছে।

টিটো বলিল, "হাঁ, আমার পালক পিতা আমাকে শিক্ষা দেন। তিনি নিওপলিটান ছিলেন এবং গ্রীক ও লাটিনে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু, কিন্তু —আমি তাঁকে হারিয়েছি। আমার সঙ্গে ভিলোসা যাবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করে তিনি জাহাজ ডুবে মারা গিয়েছেন।"

বার্ডো মিলিমার মনে কষ্ট হইবে মনে করিয়া তাহাকে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। টিটোর কথা শুনিয়া বার্ডোর মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা রমলা বুঝিতে পারিল। কিয়ৎক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। এই অবসরে নেলো বলিল, "সত্যি কথা বলতে গেলে বলতেই হবে যে এই যুবক গ্রীক ও লাটিনে খুব ভাল শিক্ষা পেয়েছে। কেননা সিগ্নিরা এঁকে এরি মধ্যে তাঁদের গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংশোধন করবার ভার দিয়েছেন। সিগ্নিরা ভাল করে পরীক্ষা না করে কোন লোককে সে কাজে নিযুক্ত করেন না। আমার এখন অন্য কাজ আছে, আমি বিদায় হলাম। মাসোকে দিয়ে ডাকালেই আমি আপনার কাছে এসে হাজির হব।" নেলো প্রস্থান করিল।

বার্ডো একটু স্থির হইয়া টিটোকে বলিলেন, "যুবক, অধ্যয়ন শেষ করার পর যে তুমি দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ তাতে আমি খুব খুশী হইলাম। প্রাচীনকালের বহুমূল্য তথ্য সংগ্রহও আশা করি তোমার দেশভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল?

টিটো বলিল আজ্ঞা হাঁ, নিশ্চয়ই ছিল। আমার পালী —আমার পিতা প্রাচীন তথ্য সংগ্রহের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না।"

বার্ডো আগ্রহের সহিত বলিলেন, "আমি আশা করি তাঁর গবেষণার ফল তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

টিটো বলিল, "তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু জাহাজ-ডুবিতে সে সমস্তই নষ্ট হয়েছে। সে সব গবেষণার যা কিছু রয়েছে তা আমাদের—আমার স্মৃতিতে রয়েছে।"

বার্ডো অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বাপুহে, যা তোমার মনে আছে, তা শীঘ্র কাগজে লিখে ফেল। অনেক কথাই বোধ হয় তোমার বেশ মনে আছে কেননা তুমি সেগুলি একবার লিখেছ। আমার বেশ মনে হচ্ছে যে আমি যৌবনকালে যা লিখতাম তা আমার মনে গাঁথা থাকতো, কিছুতেই ভুলতাম না। কি আমার মেয়েটার স্মরণশক্তির দুর্বলতা দেখে নিরাশ হই। সে কোন কোন কথা বেশ মনে রাখে, আবার কতকগুলা কথা তার মোটেই মনে থাকে না। তোমার সম্বন্ধে বোধ হয় সে আশঙ্কা নাই।" বার্ডো যে সময় তাঁর কন্যার স্মৃতিশক্তির কথা বলিতেছিলেন সেই সময় টিটো সাহস করিয়া রমলার দিকে চাহিয়াছিল। তার পর বার্ডো যখন রমলার স্মৃতিশক্তির দোষ দিতেছিলেন সেই সময় টিটোর মুখ বিমল হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। টিটোর সেই উজ্জ্বল হাসির কিরণ রমলার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। ইহাতে রমলা বড় আনন্দ বোধ করিল। ইহার পূর্ব্বে রমলা কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই যে পৃথিবীতে এমন কোন পণ্ডিত থাকিতে পারেন যিনি রমলার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার উল্লেখে অমন মধুর হাসি হাসিতে পারেন, অথচ সেজন্য রমলা নিজেকে কত অপরাধী মনে করিত। টিটোর এই হাসি রমলার মনে একটী নূতন ভাব আনিয়া দিল। ইহাকে সাধর্ম্যের ভাব বলা যাইতে পারে। তারা দুইজনে পরস্পর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল না, কেননা তাদের মধ্যে কেহই লুকাইয়া কাহারও প্রতি চাহে নাই বা হাসে নাই। তাহারা উভয়ে প্রকাশ্য ভাবে এবং সরলভাবে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল।

টিটো ভাবিল, "এই মেয়েটীকে দেখে যেমন অহঙ্কারী আর অমিশুক বলে মনে হচ্ছিল, বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়।"

রমলা ভাবিল, "এই যুবকও আমার মত ভুল করে নাকি? তাহ'লে সে আমার বাবাকে বিরক্ত করবে।"

অবশেষে টিটো বার্ডোর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁর কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইল। টিটো বলিল, "পাণ্ডুলিপি নকল করার অভ্যাস আমার খুব আছে। তবে যে সব ঘটনার বিষয় প্রস্তরখণ্ডে চিত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে সেগুলির সব কথাই যে আমার ঠিক মনে আছে তা বলতে পারি না। তবে কতক যে মনে আছে তার সন্দেহ নাই। আমার চেয়ে যার পাণ্ডিত্য অধিক এমন কোন ব্যক্তির সাহায্য পেলে আমার যৎসামান্য বিদ্যা কাজে লাগতে পারে।

বার্ডো খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ বলেছ বাপু, আমার কাছ থেকে তুমি যদি কোন সাহায্য চাও, তা আমি যথাসাধ্য করতে প্রস্তুত আছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি যে পুস্তক লিখবে তার যশ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হবে। তবে প্রথম প্রথম আমাদিগকে কিছু লোক-নিন্দা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে। তা, যারা প্রাচীন সাহিত্য দর্শন ইতিহাস নিয়ে কারবার করে তাদের ভাগ্যে সচরাচর তা ঘটে থাকে। আচ্ছা বল দেখি, তোমার পিতা কি খুব ধনী লোক ছিলেন? তাঁর কি অনেক বন্ধু ছিল?"

টিটো বলিল, "না, বরং তাঁর অনেক শত্রু ছিল। তিনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন বলে অনেকে তাঁর শত্রুতা করত। সেজন্য তিনি তত বিখ্যাত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি কোন লোককে তোষামোদ করতে জানতেন না বা কেউ তাঁর ক্ষতি করলে তাকে ক্ষমা করতে জানতেন না।

বার্ডো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "হুঁ"।

তারপর টিটো তার নিজের সম্বন্ধীয় কথা এড়াইবার জন্য অন্যান্য নানা কথা পাড়িল। ক্রমে এথেন্সের কথা পাড়িল। আরিষ্টটলের কথা আসিল। তারপর কথায় কথায় এথেন্সের খৃষ্টান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা উঠিল।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বার্ডো বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঐ সন্ন্যাসীগুলা আর তাদের গাঁজাখুরি গল্পের কথা আমাকে বলো না। ওদের কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে।"

টিটো বলিল, "ঠিক বলেছেন। আমারও তাদের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। সাপের বিষদাঁত যারা গলায় পরেছে তাদেরই ওসব ভাল লাগে।"

তারপর বার্ডো এবং টিটো এই দুইজনে মিলিয়া কোন্ প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতেছেন তাহা লইয়া সে-সম্বন্ধে খানিকক্ষণ চলিল। কথায় কথায় টিটো বলিল, "আপনার ন্যায় সুপণ্ডিতের সাহায্য পেয়ে আমি খুব উপকৃত হব কিন্তু আমার সাহায্য আপনার বোধ হয় দরকার হবে না। কারণ আমি নেরোর কাছে শুনেছি আপনি আপনার এই কন্যাকে বেশ সুশিক্ষিত করেছেন।"

রমলা বলিল, "না আপনি ভুল করেছেন। আমি সামান্য লেখাপড়া জানি। আমার মত বিদ্যা নিয়ে আমার বাবার মত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজে কোন সাহায্য করা চলে না।"

বার্ডো বলিলেন, "না রমলা তা নয়। তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। মেয়েদের সচরাচর অত বুদ্ধি দেখা যায় না। রমলা তার সাধ্যানুসারে আমার সাহায্য করে থাকে। সে আমার পুত্রের কাজ করছে। আমার একটী পুত্র ছিল"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বার্ডো চুপ করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পুত্র সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতে বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধ টিটোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত আমরা কেবল বাজে কথাই বলছিলাম। তুমি আজ যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ সে কথার কিছুই বলা হয় নাই। নেরো আমাকে বলেছে যে তোমার কাছে কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন আছে সেগুলি তুমি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করতে চাও। সেগুলি নিতে পারেন এমন কোন ধনী লোকের সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করে দিই, তুমি ত এই চাও?"

টিটো বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, সিসিলির পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন করার কাজ আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমি যা উপার্জ্জন করি তা দিয়ে আমার প্রাণাচ্ছাদনের যে কোন রকমে নির্ব্বাহ হয়। ঘর ভাড়া দিতে পারি না। নেরো দয়া করে তার একটা ঘরে আমাকে কয়েক মাসের জন্যে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়েছে।"

বার্ডো বলিলেন, "নেরো লোকটা ভাল। তা তোমার রত্নগুলি কি তোমার সঙ্গে আছে? আমি সেগুলি একবার স্পর্শ করে বুঝতাম সেগুলি কি রকমের। অবশ্য তার দরকার নাই। আমার সেগুলি কিনবার সামর্থ্য নাই। না থাক তাতে কেবল কষ্ট বাড়বে।"

টিটো একটা ছোট বটুয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, "আমার কাছে দুইটা অতি সুন্দর"—এই সময় রমলা গম্ভীর ভাবে টিটোর দিকে তাকাইয়া তাহার ওষ্ঠাধরে একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া টিটোকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। রমলা বেশ জানিত যে বার্ডো বধির ব্যক্তিরও বুঝিতে পারেন যে রত্নগুলি টিটোর নিকট রহিয়াছে তাহা হইলে টিটোর মুখে সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনলেন এবং সেগুলি কিনিতে না পারিয়া তাঁর দুঃখের সীমা থাকিবে না। রমলা টিটোকে ঐরূপ ইঙ্গিত করিয়াই একটু লজ্জিত হইল। প্রথমে হইল যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে পিতার দুর্ব্বলতার বিষয় প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। কিন্তু রমলার সে সঙ্কেত উক্তিমাত্র হইল।

টিটো, রমলার ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বটুয়া হইতে হাত টানিয়া লইয়া, অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিল, "আমার গুলা বড়রাস্তার ডানদিকে, সিসিলির কাছে থাকে। তিনি তা তাঁর জাহাজে নিয়ে গেছেন। তাঁর মতে সেগুলির দাম পাঁচ শত ডুকাটের কম নয়।"

বার্ডো বলিলেন, "অ্যাঁ, বল কি? পাঁচশত ডুকাট, তা হলেত রত্নগুলি খুব ভাল। পাঁচশত ডুকাট, এর চেয়ে অল্প অর্থে যে একজন লোককে দাসত্ব হতে মুক্ত করা যায়।"

এই কথা শুনিয়া বীর টিটো ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। তাহা অন্ধে বুঝিতে পারিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে বার্ডোর দৃষ্টিহীন চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারই

মনে হইল বৃদ্ধের শেষোক্ত কথাগুলির কোন বিশেষ অর্থ এক্ষেত্রে আছে কিনা। কারণ, কোন লোককে অর্থ দাসত্ব হইতে মুক্ত করা তখন খুব সাধারণ ঘটনা ছিল। পরমুহূর্ত্তেই বার্ডোর মনের ভাব বুঝিবার জন্যই যেন টিটো রমলার দিকে চাহিল। রমলাও তাই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "বাবা, তুমি ত জান আলাসান্দ্রা কালা বৃদ্ধ খুব ভালবাসেন। তিনি বৃদ্ধকে তাঁর পিতৃকালের ভুল বলেন। আলাসান্দ্রার যদি পছন্দ হয় তাহলে সেক্রেটারী কালা আপনার বস্ত্রগুলি নিশ্চয়ই কিনবেন। তাছাড়া তিনি নিজেও অনেক বস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি সেগুলি ধারণ করেন। তাঁর বিশ্বাস যে সেগুলি ধারণ করলে বার্দ্ধক্য রোগের উপশম হয়।"

বার্ডো বলিলেন, "ঠিক ঠিক, বার্টোলোমেয়োর রোগ উপশম করার ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব বিশ্বাস আছে। প্লিনির পুস্তকেও অতটা লেখে না। রমলা, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আচ্ছা, আমি বার্টোলোমেয়োর কাছে যাবার ছাড় দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তোমার বস্ত্রগুলি কি রকমের তা বল, তা আমি চিঠিতে লিখে দিই, তাহলে সেগুলি কিনবার জন্যে কালার বেশী আগ্রহ হবে।"

রমলা সত্বরে বলিল, "তোমার চিঠিতেই কাজ হবে বাবা। তাহলেই কালা বুঝবেন যে ইনি পণ্ডিত লোক, আর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন।

বার্ডো সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ। আমি বার্টোলোমেয়োকে যা বলবো তার সমর্থনে প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। আমার আশা হয় যে আমার যুবকবন্ধু একবার সেখানে প্রবেশ লাভ করতে পারলে নিজগুণে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।" বার্ডো নীরব হইলেন। কিন্তু তাঁর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল যে তিনি যেন কি একটা কথা বলিবেন কিনা সেজন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন। অবশেষে সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আজ আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তখন আমার পত্রের উত্তরে সেক্রেটারী তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দেওয়ার বিষয় জানতে পারবে। কিন্তু তুমি আজ চলে যাবার পূর্ব্বে,—তুমি আমাকে একবার তোমার হস্তস্পর্শ করতে দাও। অনেক দিন হয় আমি কোন যুবকের হস্তস্পর্শ করি নাই।" বৃদ্ধ তাঁহার দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। টিটো তাহার হাতের অঙ্গুল বৃদ্ধের হাতের মুঠার মধ্যে স্থাপন করিল। বৃদ্ধ তা চাপিয়া ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "রমলা, এই যুবকের গায়ের রং কি তোমার দাদার গায়ের রংয়ের মত কর্সা?"

রমলা অনেক কষ্টে তার উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ দমন করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, "এঁর চুল কাল, গায়ের রংও ময়লা।" মনে মনে বলিল, "বাবা কি তাতে আপত্তি করবেন? তা কি বাবার পছন্দ হবে না? আর ইনি কেমন শান্ত, শিষ্ট কেমন দাদাদিদে এঁর ধরণ।" তার পর প্রকাশ্যে বলিল, "বাবা, বাবাকে আপনার মাথায় হাত দিয়ে আপনার কেশস্পর্শ করতে দিবেন কি?" এই বলিয়া মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে টিটোর পানে চাহিল, টিটোও রমলার পানে উজ্জ্বল এবং মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই দিব।" তারপর টিটো বার্ডোর হাত লইয়া নিজের মাথার উপর রাখিল। বার্ডো অনেকক্ষণ ধরিয়া টিটোর মাথায় হাত বুলাইলেন, তার পরে কপালে হাত বুলাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে হাত নামাইয়া টিটোর ঘাড়ে হাত রাখিয়া বলিলেন, "হুঁ; এ যুবকের সঙ্গে তোমার দাদার কোন সাদৃশ্য নাই রমলা। তাতেই বল। তুমি বাজে বোধ স্বপ্নটপ্ন দেখ না।"

এমন সময় দুয়ার খুলিয়া গেল এবং পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী এক শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃদ্ধ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তিনজনকে ভগবদ্ধ্যানে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত রহস্যটুকু গেল। বার্ডো টিটোর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া লইলেন। টিটো সোজা হইয়া বসিল। রমলা উঠিয়া আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইল। আগন্তুক

রমলার ঘাড়ে হাত দিয়া বলিলেন, "বেশ ভাল আছ ত বাছা! মামো বলে যে তোমাদের সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। তবু আমি এসে পড়লাম।"

বার্ডো বলিলেন, "ও বার্নার্ডো তুমি? ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়েছ। যুবক (এই সময় টিটো উঠিয়া বারনার্ডোকে অভিবাদন করিল) ইনি হইতেছেন, ক্লরেন্সের একজন প্রধান ব্যক্তি। এঁর নাম বারনার্ডো ডিল নিরো। ইনি আমার পুরাতন এবং বলতে গেলে একমাত্র সুহৃদ। তুমি যদি এঁর সুনজরে পড় তাহলে শীঘ্রই উন্নতি করতে পারবে। বার্নার্ডো এই যুবকের বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। অথচ তুমি যা জানতে চাও এমন অনেক খবর সে তোমাকে দিতে পারে। যদিও এ যুবক পণ্ডিত তথাপি এ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছে, আর যে প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপির ওপর তোমার তেমন শ্রদ্ধা নাই সেই পাণ্ডুলিপি ছাড়াও এ অনেক জিনিষ দেখেছে।

বারনার্ডো টিটোর অভিবাদনে মাথা নাড়িয়া টিটোর আপাদ মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিলেন, "ও, ইনি বুঝি গ্রীক। অল্পদিন হল ক্লরেন্সে এসেছেন। মশায়ের নাম, অথবা নামের কোন অংশ। নিশ্চয়ই আপনার নামটি খুব লম্বা হবে।"

টিটো সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "ঠিক তার উল্টো। আমার নাম খুব ছোট, যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত। আমার নাম টিটো মিলিমা।

বারনার্ডো থামিয়া, অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "তাই নাকি? আমি মনে করেছিলাম যে আপনার নাম একটা নগর, একটা নদী, একটা প্রদেশ আর একটা সাম্রাজ্য একত্র করিলে যত বড় হয় তত বড় হবে।" তারপর টিটোর সম্বন্ধে আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ভাব দেখাইয়া এবং পূর্ণের অবজ্ঞার ও সন্দেহের স্বর বজায় রাখিয়া দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বার্ডো তাঁর সমাধি ঘরে গেল।"

বার্ডো সেইরূপ দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আহা, ক্লরেন্সে আবার নূতন যুগ এল, বোধ হয় অন্ধকার যুগ এল। লোরেন্জোর উত্তরাধিকারী তেমন বিচক্ষণ নন।"

বারনার্ডো বলিলেন, "ঠিক তা নয়। পিয়ারো ডি মেডিসির যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। তার দোষের মধ্যে এই দোষ যে সে বড় হঠকারী। আমি ছোকরাকে পছন্দ করি। সে চিরকালই আমার কাছে ছোকরা থাকবে। আর আমি তার কাছে তার ছোট বাপ থাকবো।"

বার্ডো বলিলেন, "তবুও যারা সর্ব্বদাই নতুন চায়, তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমার আশঙ্কা, আবার সেই রকম দলাদলি বিবাদ আরম্ভ হবে।"

বারনার্ডো বলিলেন, "মারামারি কাটাকাটি না করে যদি নতুন কিছু হওয়া সম্ভব হত, তাহলে আমি জানি যে আমি কোন দলের লোক নই। আমি দেশবাসী মাত্র। কিন্তু দলাদলির কথা উঠলেই আমি মেডিসি দলভুক্ত। আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত তা থাকব।"

বার্ডো ও বারনার্ডোর মধ্যে যখন এই সব কথা হইতেছিল সেই সময় টিটো উঠিয়া বিদায় লইল। তাকে বার্ডো বলিলেন, "কাল আমার ঐই সময়ে এসো। তাহলে বারটোলোমো কি উত্তর দেন জানতে পারবে।"

টিটো চলিয়া গেল। কক্ষের দুয়ার বন্ধ হইবার পর বারনার্ডো বার্ডোকে বলিলেন, "আকাশের কোন্ অংশ হতে এই যুবক তোমার কাছে অবতীর্ণ হল?" বারনার্ডো এই কথাগুলি তুচ্ছস্বরে একটু জোর দিয়া বলিলেন। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে তাঁর কথাগুলি শুনিলে আপাততঃ যা মনে হয়, তার অর্থ তার চেয়ে অনেক বেশী।

বার্ডো। উনি পণ্ডিত লোক। আমাকে তুমিতে সম্বোধন করেছেন। কেবল কয়েকটী বই রক্ষা করতে পেরেছেন। সেগুলির খরিদদার জোটার জন্য আমাকে ধরেছেন। আমি ওঁকে বারটোলোমো আলার কাছে পাঠাব মনে করছি। তুমি ত জান যে এখন আমার পক্ষে ওদব আর কিনতে না যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।"

বারনার্ডো ঘাড় নাড়িয়া রমলাকে বলিলেন, "রমলা

দেখ তো আমার চাকরটা বাইরে রয়েছে কিনা? আমি তাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলে এসেছি। তারপর রমলা যথেষ্ট দূরে চলিয়া গেলে, বারনার্ডো বার্ডোর দিকে ঝুঁকিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বার্ডো, মনে থাকে যেন, তোমার নিজের একটা মত আছে। সাবধান, যে তার মূল্য বোঝে না, এমন কোন লোক যেন তা না পায়। ঐ সুন্দর প্রাণীটার এমন সোণারেম ভাব দেখলাম যে সে যেখানে ইচ্ছা করবে সেইখানেই আসা যাওয়া পারে।"

বার্ডো চমকিত হইলেন। তাঁর নির্বুদ্ধিতা পুত্রের সহিত টিটোর সাদৃশ্যের বিষয় চিন্তা করিবার সময় রমলার কথা মনেই হয় নাই। কিন্তু পর মুহূর্তে প্রতি- [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইল। বারনার্ডোর সতর্কবাক্যকে বার্ডো আপনার হৃদয়ের চাপিয়া ধরিলেন। [illegible] বলিলেন, "বারনার্ডো, তা'হলে আপত্তি কি? ঐ যুবক যদি যোগ্যতার পরিচয় দেয়, সে ত বেশ পণ্ডিত: তা'হলে তোমার বিয়ের যৌতুকের জন্য এতেমন বেগ পেতে হবে না।" যৌতুকের জন্যই ত তুমি সর্ব্বদা চিন্তিত থাক।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

উপবাসের উপকারিতা।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলাল বসু, এম্ বি, এফ্, সি এস্, লিখিত—

("স্বাস্থ্য" পুস্তকের ৩য় সংস্করণ হইতে গৃহীত)

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যদেশসমূহে রোগবিশেষে উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। আমাদের দেশে উপবাস একটী নূতন জিনিস নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ সংযম ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য উপবাসের প্রয়োজন বুঝিয়া, উপবাস ধর্ম্মসাধনের একটী প্রধান সহায় বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু স্ত্রী-পুরুষ, বার, ব্রত, পূজা ও তিথি উপলক্ষে উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দুর বারমাসে তের পার্ব্বণ, সুতরাং প্রাচীন-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক নর-নারীর মাসের মধ্যে ২৪ দিন উপবাসে কাটিয়া যায়। এদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুবিধবাগণ মাসের মধ্যে দুইদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। হিন্দু রমণীগণ পতি, পুত্র আত্মীয় স্বজনগণের মঙ্গলকামনায় 'মানত' করিয়া 'সোমবার', 'শুক্রবার' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বারে আহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শুধু হিন্দুধর্ম্মে কেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও 'রোজা' প্রচলিত আছে, এই পার্ব্বণ উপলক্ষে একমাসকাল তাহাদের দিবাহারে নিষিদ্ধ। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহারা এই সময়ে রাত্রিকালেও অল্প ভোজন করিয়া থাকেন। তবে অনেক মুসলমান দিবাভাগে আহার না করিলেও রাত্রিতে এত অধিক আহার করেন যে, উপবাসের জন্য তাঁহাদিগকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না।

ইহুদী ও প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপবাসপ্রথা প্রচলিত আছে। ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু মোজেস্ (Moses) নির্জ্জন অরণ্যে চল্লিশ দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের পর্ব্বাদি উপলক্ষে এখনও উপবাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধেরাও তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত দিবসে নিরশন ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, উপবাস ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে উপবাসের উপযোগিতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, মানুষ যদি আজীবন পরিমিতভোজী হয়, শরীর পোষণের জন্য যে পরিমাণ যে জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহ-পুষ্টির জন্য গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (Toxins)

উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উপদংশ, পেটে-বেদনা, বমন, উদরাময়, জ্বর, প্রভৃতি নানা রোগের একটী কারণ—অন্নের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের সংযোগ। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অম্লশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায়—উপবাস। আমরা আহার বিষয়ে যত সাবধানই হই না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় যত অল্পপরিমাণ আহার গ্রহণ করি না কেন, আমরা অধিকাংশ সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। অনেক স্থলে মোটের উপর খাদ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত না হইলেও বিভিন্নজাতীয় খাদ্যের মাত্রা আমরা ঠিক রাখিতে পারি না। হয় ত ভাত মিষ্টান্ন, (শর্করা জাতীয় খাদ্য) অল্প খাইয়া ঘি মাখন (মাখনজাতীয় খাদ্য) অধিক গ্রহণ করি, অথবা মাছ মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অম্বিময়ের বশবর্ত্তী হই। কোন একজাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে তাহা পরিপাক না হওয়ায় উহা হইতে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, এবং বাত রোগ (Rheumatism, gout), পাথরী রোগ (Gravel), বহুমূত্র রোগ (Diabetes) প্রভৃতি নানাবিধ অজীর্ণঘটিত রোগ জন্মিয়া থাকে।

উপবাস করিলে এই সকল দূষিত দ্রব্যের পরিমাণ দেহমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া, যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাইবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা নিঃশ্বাস গৃহীত অক্সিজেন সংযোগে দেহমধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া (slow combustion) ক্রমশঃ তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদন করে। যদি উপবাস করা যায় তাহা হইলে নূতন খাদ্যের অভাবে পূর্ব্বসঞ্চিত খাদ্যাংশ ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের অপকারিতা দূর হইয়া দেহ নির্ম্মল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। দীর্ঘ-উপবাসে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু দুই চারিদিনের উপবাসে শরীর ক্লেদমুক্ত হইয়া যথোচিত স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কতদিন মানুষ উপবাস সহ্য করিতে পারে? এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মানুষ কেবল উপবাস করিলে দশ বারদিন এবং জলপান করিয়া শুষ্ক আহার ত্যাগ করিলে একমাস পর্য্যন্ত, নিরুদ্যমরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ উপবাসের পর তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে সে দুই একদিনের অধিক বাঁচে না। প্রবল দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ ঘটনার সমাবেশ বিরল নহে।

বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে অধিক বা অল্পদিন উপবাস সহ্য করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ লোকেরা যুবা অপেক্ষা এবং যুবকগণ বালকদিগের অপেক্ষা অধিক দিন উপবাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারে। স্থূলকায় ব্যক্তিগণ কৃশ লোকের অপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিতে পারে। টেলারের (Taylor) মেডিক্যাল্ জুরিসপ্রুডেন্সে (Medical Jurisprudence) উল্লেখ আছে যে, নিরম্বু উপবাসে মানুষ কতদিন পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। তিনি তাঁহার পুস্তকে এক জন প্রৌঢ় প্রকৃতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে মাঝে মাঝে এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইত যে, কিছুতেই তাহাকে জাগাইতে পারা যাইত না। একবার ঐ ব্যক্তি ৪ দিন ৪ রাত্রি উপর্য্যুপরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাকে এক ফোঁটা জল বা এক চিমটা আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করাইতে পারা যায় নাই। এই সময়ে তাহার মৌচ প্রস্রাব বন্ধ থাকিত। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিত, তখন সে সহজ মানুষের মত ব্যবহার করিত এবং নিদ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ঘটনা তাহার মনে থাকিত। সচরাচর দুই বা তিন দিন ব্যাপিয়া

একটুকরা পাঁউরুটি তাহাকে অতিরিক্ত করিত।

৮। ডাক্তার গাই (Guy) তাঁহার পুস্তকে একখানি সমুদ্রগামী জাহাজের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৮ জন আরোহীর মধ্যে ২ জন মাত্র বিনা জল ও আহারে ১৮ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। অবশ্য উহাদিগকে ১৮ দিন সমুদ্রের উপর কড় বৃষ্টি, রৌদ্র, বিষম শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাহা না হইলে হয় ত আরও কেহ কেহ এতদিন নিরন্ন উপবাস সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইত। ডাক্তার লায়ন্ (Lyon) তাঁহার মেডিকেল্ জুরিস্ প্রুডেন্স লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক জন পাগল শুদ্ধ জল পান করিয়া ৪৭ দিন বাঁচিয়াছিল এবং আর এক পাগল মাঝে মাঝে একটু মেবুর রস ও জল [illegible] ৬৮ দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

আমেরিকার ডাক্তার টানার্ তাঁহার নিজ দেহে উপবাসের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে প্রচুর জল পান করিতেন। দীর্ঘ উপবাসের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। উপবাসের সময় কতকগুলি ডাক্তার দিবারাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তিনি গোপনে আহার করেন কি না, তাহা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা টানারকে কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখেন নাই। তথাপি তাঁহারা মানুষ যে এত দীর্ঘকাল উপবাস করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু ইহার পর অনেক প্রামাণিক ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে টানারের পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্জাবের হরিদাস সাধুর ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৪০ দিবস পর্য্যন্ত মাটির নীচে নিরন্ন উপবাস অবস্থায় আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার জীবন নষ্ট হয় নাই।

'মেডিকেল্ গেজেট' নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

এক জন সুস্থকায় বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘটনাক্রমে ২৩ দিন একটী কয়লার খনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই ২৩ দিন সে একবারেই অনাহারে ছিল। কেবল মাঝে মাঝে নিকটে যে কিয়ৎপরিমাণ পচিল জল ছিল, তাহাই পান করিয়াছিল। যখন তাঁহাকে উদ্ধার করা হইল, তখন তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। উদ্ধারকর্ত্তাদিগকে সে চিনিতে পারিয়াছিল ও তাঁহাদের নাম বলিয়াছিল। কিন্তু সে এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাত দিয়া মুখে খাবার তুলিবার শক্তি তাহার ছিল না। যত্নোচিত সেবা শুশ্রূষার পর সেই ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিয়াছিল যে, প্রথম দুই দিন সে ক্ষুধার জন্য বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার পর তাহার ক্ষুধা মোটেই ছিল না, কিন্তু পিপাসার যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়াছিল। ২৩ দিনের মধ্যে ১ বার মাত্র তাহার দাস্ত হইয়াছিল কিন্তু সে সহজ অবস্থার ন্যায় মূত্র ত্যাগ করিত।

চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক বাঁচে নাই। তাহার পেট এত ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং চামড়া এত পাতলা হইয়াছিল যে, পেটে হাত দিলেই তাহার পিরণীড়ার হাড়গুলি একে একে গণা যাইত। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের সময়ে এরূপ শোচনীয় দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আলেক্জাণ্ডার জ্যাক্ নামক এক ব্যক্তি ৫০ দিন উপবাস করিয়াছিল। টেলারের মেডিকেল্ জুরিস্প্রুডেন্স নামক পুস্তকে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই উপবাসের সময় তাহার দেহের ভার ১৭ সের কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তাহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ হইয়াছিল, তথাপি ধৈর্য্যে তাহার শরীর ১ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল। তাহার একটী গুঁড়া পেটেণ্ট ঔষধ ছিল। মধ্যে মধ্যে সে সেই ঔষধ খাইত ও জল পান করিত। ৫০ দিনে সে দুই ছটাক মাত্র ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিত যে, তাহার ঔষধের অপূর্ব্ব ক্ষমতায় সে উপবাস সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। পঞ্চাশ দিন উপবাসের পর ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪ টার সময়ে 'পারণা' করিয়াছিল। প্রথম দুই এক দিন অল্প আহার করিয়া পরে সে, পূর্ব্বে যেমন আহার করিত, সেইরূপ তাহার আহার করিয়া সুস্থ-শরীরে ছিল।

১৮৯০ সালে সাক্সি (Succi) নামক ইটালীবাসী

এক রাত্রি ৪০ দিন উপবাস করিয়া সুস্থশরীরে ছিল। সে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিত, এবং মধ্যে মধ্যে মাদকদ্রব্য সেবন করিত।

রোগ-উপশমের জন্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন অর্থে যে কেবল উপবাস, তাহা নহে। চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিবেশের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান আত্রেয় উত্তর করিলেন যে, যাহা কিছু লঘুত্বসম্পাদিকা, তাহাকেই লঙ্ঘন কহে। যথা—

তত্রাগ্নিবেশস্য বচো নিশম্য গুরুত্বতীব্র-
মন্দকিয়ারোগকরং নরেষু ভগবানুবাচ।

উপবাস লঙ্ঘনের অন্তর্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চক্ষুঃপ্রকাশা সংজ্ঞাহি পিপাসা মারুতাবহো।
পাচনান্যুপবাসশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্।

আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে জ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের উপশমের জন্য লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লঙ্ঘন সকল স্থলে একবালীন আহার-বিরহিত উপবাস অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; রোগে লঘু খাদ্য গ্রহণ করিলেও উহা লঙ্ঘন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জ্বর বিশেষে প্রথম ৭ দিবস লঙ্ঘন করিতে বলা হইয়াছে কিন্তু জ্বরের উপশম হইলেই শুরুত্ব-লঘু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নতুবা জ্বর বৃদ্ধি হইবার, এমন কি, অতিশয় ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। চরক বলিয়াছেন যে, রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারেরা দীর্ঘ উপবাসের ব্যবস্থা কোথাও করিয়া যান নাই। কোন কোন জ্বরে ৭ দিন লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও খাদ্য-গ্রহণ একেবারে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা অতিলঙ্ঘন দোষাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পর্ব্বভেদোঽরতির্দ্দাহঃ কাসঃ শোষো মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষুৎপ্রনাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।
মনসঃ ব্যগ্রতা হিক্কা মূর্চ্ছাভ্রমবো হৃদির্ব্যথা
দেহাগ্নিধাতুসাদশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ।

পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রোত্র ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, সর্ব্বদা উর্দ্ধবাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অগ্নির বলক্ষয়—এই সকল অতিলঙ্ঘনের ফল (চরক-সংহিতা—সূত্রস্থান)।

তাঁহাদের মতে লঙ্ঘনের উপকারিতা নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়:—

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলঘুতে।
সদ্গারোদ্গারকণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে।
ক্ষেলে জাতে রুচৌ চৈব ক্ষুৎপিপাসাসহেষ্বেরে।
ঔচিতং লঙ্ঘনমাহেঃ ভিষগ্বাধ্যবস্থানবিদি।

বাতমূত্র পুরীষের ত্যাগ হইলে, শরীরের লঘুতা হইলে, হৃদয়, উদ্গার, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি হইলে, তন্দ্রা ও ক্লম অপগত হইলে, ক্ষুধা হইলে, রুচি বোধ হইলে, ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য হইলে এবং অন্তরাত্মা সম্যক্ প্রকারে ব্যাধীন হইলে লঙ্ঘন সম্যক্ হইয়াছে বলা হয় (চরক-সংহিতা—সূত্রস্থান)।

চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে তাঁহাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোনও কোনও চিকিৎসকও এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সমর্থন করিয়াছেন। সিন্‌ক্লেয়ার্ সাহেব তাঁহার Fasting Cure নামক পুস্তকে, তাঁহার নিজ দেহের উপর যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য লোকের এ বিষয়ের পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন নানা রোগ ভোগ করিয়া কোনও চিকিৎসার দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া দীর্ঘ উপবাস গ্রহণ করিয়া একেবারে রোগমুক্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা বিলাত ও আমেরিকার নানাবিধ সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর অনেক রোগী তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার "Fasting Cure" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)